১ গবেষণা পত্র
২ ইতিহাস
৩ রাজনীতি
৪ চুক্তি ও ভূমি সমস্যা
৫ শান্তি সূত্র
৬ প্রতিবেদন গুচ্ছ
৭ অনুসন্ধান
৮ নির্বাচিত রচনাবলী
৯ তথ্য উপাদান
১০ রচনা সমগ্র

৫

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মরহুম আতিকুর রহমান লিখিত 'পার্বত্য তথ্যকোষ' ০১ সেট বই তাঁর ছেলে ফয়জুর রহমান ফয়েজ এর পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ।

প্রয়োজনে মোঃ ০১৬১২-২৮০৮০২

পার্বত্য তথ্য কোষ

খণ্ড-৫ ঃ তথ্য উপাদান

আতিকুর রহমান

নিবন্ধন পত্র

বই	ঃ	পার্বত্য তথ্য কোষ ১-১০
লেখক	ঃ	আতিকুর রহমান
প্রকাশক	ঃ	পর্বত প্রকাশনী ৪৮ সাধার পাড়া, উপশহর সিলেট
প্রকাশ কাল	ঃ	নভেম্বর ২০০৭ ইং
কম্পোজ	ঃ	বাবুল কম্পিউটার/ইমন কম্পিউটার ও সোলেমান খাঁ ২৬২/ক ২৬২ বাগিচা বাড়ী ফকিরাপুল ঢাকা-১০০০।
পেষ্টিং	ঃ	আবু তাহের ঐ
মুদ্রাকর	ঃ	বি.এস.প্রিন্টিং প্রেস ২ আর কে. মিশন রোড মতিঝিল
	ঃ	মোতালেব ম্যানসন ঢাকা-১২০৩।
প্রচ্ছদ	ঃ	শিল্পী আরিফুর রহমান ১৩১ ডিআইটি রোড ঢাকা।

পরিবেশক	ঃ	১ রাঙ্গামাটি প্রকাশনী রিজার্ভ বাজার রাঙ্গামাটি ২. মল্লিক বই বিতান ঐ

সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঃ বাংলাদেশ রিসার্চ ফোরাম
৫/১৮, নূরজাহান রোড
মোহাম্মদপুর ঢাকা।

মূল্য	ঃ	খণ্ড-১, ৩ ও ৯ টাকা ১৩০/- খণ্ড-১০ টাকা ৫০০/- অন্যান্য খণ্ড - টাকা ১০০/-
যোগাযোগে	ঃ	আতিকুর রহমান মোবাইল ঃ ০১১৯৬১২৭২৪৮

পার্বত্য তথ্য কোষ
খন্ড-৫ ঃ শান্তি সূত্র

সূচী পত্র ঃ

ভূমিকা

কোন জাতির অধিকারগত মূল ভিত্তি অক্ষুণ্ন রেখে তাকে কখনো কোথাও দমান যায়নি। বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক আমলের পরে আজকাল এমনটি সম্পূর্ণ অসম্ভব। মানবধিকার মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রের নামে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সর্বত্র সবার কাছে সমর্থিত। তবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও দৌরাত্ম্য এবং উচ্চাভিলাষের দ্বারা কোন অঞ্চল গ্রাস ও কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করার দ্বারা মানবিক ও রাষ্ট্রীয় শান্তিকে বিঘ্নিত করা আকাঙ্খিত নয়। আত্মরক্ষার এ পথটি এখনো অবারিত আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের বিপক্ষে বাংলাদেশ এখন অবরুদ্ধ। এ ব্যাপারে চুক্তি ও বিধিবিধান হয়েছে ঃ এতদাঞ্চল উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা, এখানে তাদের কিছু অগ্রাধিকার প্রাপ্য, কিছু উচ্চপদ তাদের জন্য সংরক্ষিত। বাঙ্গালীদের অবাধ ভূম্যাধিকার, ভোটাধিকার ও জনপ্রতিনিধিত্ব এখানে নিয়ন্ত্রিত।

এই স্বীকৃতি ও চুক্তি হলো আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের পথে মূল্যবান অগ্রগতি, যা বিশ্ব সমাজের কাছে অঙ্গিকার বিশেষ। সোজাসুজি এর ভিন্নতা করার উপায় নেই। বিশ্ব সমাজ কর্তৃক বাংলাদেশকে উপজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দানে বাধ্য করার পক্ষে এটি এক মাইলফলক। পার্বত্য চুক্তি ভঙ্গ করা হলে, বাংলাদেশকে শান্তি ভঙ্গ, অধিকার হরণ ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে।

উপজাতিদের নিত্যদিনের রাজনৈতিক কৌশল অভিনব। চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত মন্ত্রী, এমপি, রাজা, চেয়ারম্যান পদ উচ্চ বেতন ভাতা, গাড়ীবাড়ি বিলাসী সুবিধার কিছুই যথেষ্ট নয়। এগুলো এ পর্যন্ত তাদের সন্তুষ্ট করেনি। এ পথে উপজাতীয় পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা কামনা বাস্তব নয়। আসলে তারা উচ্চাভিলাষী বহিরাগত বংশোদ্ভূত লোক। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে তারা আগ্রহী নয়। এদের পালন পোষন ও সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দান বিড়ম্বনাকর। সর্বোপরি এরা বাংলাদেশের মূল নাগরিক বাঙ্গালীদের ও দেশের এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে এতদাঞ্চলে নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়।

স্থানীয় সরকারি প্রশাসন আর প্রতিরক্ষাকেও উপজাতীয় করণে তারা উদ্বুদ্ধ। এসবই ধৃষ্টতাপূর্ণ রাজনৈতিক উচ্ছাকাঙ্খা। এই বাড়াবাড়ি অসহনীয়। এতে তাদের সহ দেশ ও জাতির এক হয়ে থাকার কোন অবকাশ নেই। বৃটিশ আমলে এদের পূর্বপুরুষেরা এতদাঞ্চলে উদ্বাস্তু রূপে এসেছিলো। ঐ বৃটিশরাই তাদের হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েলভূক্ত অভিবাসন আইন ৫২ বলে বাংলাদেশবাসীর অনুমোদন ছাড়াই এতদাঞ্চলে স্থান দিয়েছে। এখনো তারা চরিত্রে মননে বিদেশী ও বিজাতীয় থেকে গেছে। তারা বাংলাদেশী ও বাঙ্গালী স্বজন হতে পারেনি। এদের মাঝে সর্বাধিক উগ্র অবাধ্য আর বৈরী সম্প্রদায় হলো চাকমারা। এরা দেশ দ্রোহে অন্যান্য সহযোগীদের প্ররোচনা দাতা গুরু।

আতিকুর রহমান
ডিএসবি কলোনী, রাঙ্গামাটি
লেখক, গবেষক ও কলামিষ্ট।

পার্বত্য তথ্য কোষ-

খণ্ড-৫ শান্তি সূত্র

১। শান্তি প্রয়াস

ঐতিহ্যের মৌলিক তথ্যগুলো উদ্ধার ও বোধগম্য করে লিপিবদ্ধ করা এবং এ সংক্রান্ত গবেষণাকর্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা জরুরী। রূপ কথা গল্প কাহিনী ও রাজা উজির ভিত্তিক বাহুল্য কথা বাদে ও মূল্যমান তথ্য উপাত্ত আর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড অনেক আছে যা ঐতিহ্য ইতিহাসের অতি মূল্যবান উপাদান। উপজাতীয়দের মূল্যায়নের পক্ষে সে সব সংগৃহীত হওয়া জরুরী। সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে নিযুক্ত উপজাতীয় পন্ডিতদের কাছে এরূপ গবেষণা ধর্মী সেবা কাজই কাম্য। গঠনমূলক কিছু করা ছাড়া কেবল বেতন ভাতা পাওয়ার মহড়া আর প্রচলিত নাচ গান চর্চাতেই বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি বন্দি হয়ে আছে। এটা যেন বেতন ভাতায় বাঁধা আর দশটা পেশার সমান, অন্যতম অর্থকরী পেশাও নিযুক্তি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক পন্ডিত মহল, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতি সংক্রান্ত কষ্টকর তথ্য সংগ্রহে যেমন উদাসীন, তেমনি উদাসীন স্থানীয় পন্ডিত মহলও। স্থানীয় পন্ডিতদের অনেককে উপজাতীয় সর্দারদের দীর্ঘ কুলিন রাজ রক্তধারী হওয়ার প্রমাণে অধিক আগ্রহী দেখা যায়। তজ্জন্য তথ্য প্রমাণের পরিবর্তে, রূপ কথাই যথেষ্ট বিবেচিত হচ্ছে। কিছুতে ও সত্যাসত্য যাচাই আর মূল্যায়ন নেই। উসাই-তে আগে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের একক নিয়ন্ত্রণ থাকলেও তা ছিলো অত্যন্ত শিথিল। এখন স্থানীয় নিয়ন্ত্রক হলো জেলা পরিষদ সুতরাং তাতে আরো পোয়া বারো। যথেচ্ছ লেখা ও বলাকে ঠেকায় কে? মহল নির্মাণ ও ভোগ বিলাসে বরাদ্দ বাড়ছে। গঠনমূলক কিছু করাটা উপেক্ষিত। পার্বত্য অঞ্চলের তথ্যবহুল ও নিরপেক্ষ কোন ইতিহাস নেই। এই অভাবটি অত্যন্ত প্রকট হলেও, তথ্য সংগ্রহ, বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস যাচাই-বাছাই গবেষণা, রচনা ও প্রকাশনায় কারো কোন গরজ নেই। জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, উন্নয়ন বোর্ড, সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, জেলা প্রশাসন এবং সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কোটি কোটি টাকার তহবিলের মালিক। কিন্তু এই জরুরী কাজটি সম্পাদনের উদ্যোগে ও বরাদ্দে কারো কোন আগ্রহ নেই। বর্ণিত কর্তৃপক্ষ মহলের সবারই অধিক আগ্রহ নির্মাণ কাজ, বেতন ভাতা ও ভোগ বিলাসে, কারণ তাতে কিছু উপরি মিলে। সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা ও নগদ লাভকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় কেবল উপজাতীয় লেখকদের কিছু নিম্নমানের বই প্রকাশিত হয়। হালে মিঃ টি, এইচ লুইনের দু তিনটি বই এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ক্রটি পূর্ণ অনুবাদ কাজে অনুবাদক নির্বাচন ও অনুবাদ যাচাই কাজটি পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট। ফলে এ কাজটি নিম্নমানের হয়েছে। বাঙ্গালী পন্ডিতদের প্রতি তাদের পরশ্রীকাতরতা অত্যন্ত প্রকট। আমি নিজেকে পন্ডিত মনে করি না। তবু পার্বত্য অঞ্চলের তথ্য উপাত্ত নিয়ে সর্বাধিক আলোচনা গবেষণা রচনা ও

প্রকাশনার রেকর্ড আমারই প্রাপ্য। আমি গবেষণা ও প্রকাশনার জন্য বর্ণিত কর্তৃপক্ষ সমূহের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা চেয়েও বিফল হয়েছি। আমার তথ্য বহুল পান্ডুলিপি, প্রাইমারী পড় য়া উজাতীয় পন্ডিত, আর নিম্নমান সহকারীদের দ্বারা যাচাই-বাছাই করে, তার মান নির্ণয় করা হয়। তাতে আমি প্রত্যাখ্যাত। অথচ আমার প্রদত্ত তথ্যাদি বহুজনের উক্টরেট ডিগ্রী লাভের সুত্র এবং এনসাইক্লোপেডিয়তেও গৃহীত। উপাজাতীয় গুণগানমুলক উদ্ভট কাহিনী, আমার লেখনীর উপজীব্য হলে নিশ্চয়ই আমি সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেতাম। সর্বাধিক দুঃখজনক ঘটনা হলো, জেলা প্রশাসক বাহাদুর ও অনুরূপ সাংস্কৃতিক ও পুথিগত উন্নয়নের ব্যাপারে উদাসীন। পাবলিকের কাছে থেকে সংগৃহীত চাঁদার দ্বারা একটি ডিষ্ট্রিক্ট ফান্ড গঠিত হয়ে জেলা প্রশাসকের ঐচ্ছিক তহবিল রূপে পরিচালিত হয়। উক্ত তহবিলের দ্বারা মেহমানদারী ত্রাণ কাজ দুস্থ দুর্গতদের সহায়তা দান ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ সমাধা করার ঐতিহ্য আছে। আমি একটি বই এর প্রকাশনা সহায়তায় উপরোক্ত কর্তৃপক্ষের সবার কাছ থেকে একে একে বিমুখ হয়ে শেষ অবলম্বন হিসাবে জেলা প্রশাসকের শরণাপন্ন হই। কিন্তু এখানেও আমি অস্পৃশ্য। তবে এটাই আমার সান্ত্বনা যে, আমি দয়ার পাত্র ও ঋণী হওয়া থেকে বেঁচে গেছি। বর্ণিত কর্তৃপক্ষদের সবাই জাতি ও দেশের পোষ্য করুণার পাত্র। তাদের কর্মকান্ড, টাকার নিরিখে মুল্যায়িত হয়। কেবল আমার মত অভাগারা বেগার খাটে। এই খাটুনী টাকার নিরিখে মূল্যায়িত হয় খুব কম। আগের জামানায় রাজা বাদশাদের প্রশস্তি গেয়ে এবং প্রকৃত সংস্কৃতি চর্চা করেও কবি ও লেখকেরা পুরস্কৃত হতেন। আজকাল ও মহল বিশেষের প্রশস্তি গাথায় লাভ হয়। তবে বেয়াড়া বস্তুনিষ্ঠ লেখকেরা দুর্ভাগা, যেমন আমি নিজে। পার্বত্য অঞ্চলের তথ্য ও ঘটনাবলীর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার সুত্রপাত আমি করে গেলাম। এজন্য আমি অনেকের কাছে অস্পৃশ্য। তবে সময় আসবে, যখন আমার এ অপ্রিয় আলোচনাগুলো অনেক উচ্চ দামে বিকুবে। পার্বত্য অঞ্চল ও তার অধিবাসীদের তথ্য নির্ভর পরিচয় জানতে এবং এই অঞ্চলে শান্তি রচনায়, আমার লেখা তথ্য ও সুপারিশগুলো আশা করি একদিন কাজে লাগবে। জাতি ও দেশের জন্য এটি হবে আমার বেগার খাটার উপহার। এর কোন প্রতিদান আমি আশা করি না। তবে কোন খাটুনীই বৃথা যায় না। মহৎ উদ্দেশ্যে কৃত প্রতিটি কাজ বীজের মত অঙ্কুরিত হয় ও ফল উৎপাদন করে।

আমার জানা মতে, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে কিছু স্থানীয় লোক কাহিনী ও গীতিকা সংগৃহীত আছে। সেগুলোর অনুবাদ সম্পাদনা ও মুদ্রণ কাজটি সমাধা করা গেলে, স্থানীয় ইতিহাস ঐতিহ্যের তালিকায় কিছু মূল্যবান তথ্য সংযোজিত হবে। ইনস্টিটিউটের সুচিত অনুবাদ কাজটিও নির্ভুল ও যথেষ্ট নয়। এই অঞ্চল ও উপজাতীয়দের নিয়ে মিঃ টি এইচ লুইন সহ বহু পাশ্চাত্য পন্ডিত মূল্যবান অনুসন্ধানী বিবরণ রেখে গেছেন। ঐ পথিকৃত পন্ডিত ব্যক্তিদের রচনাগুলো বাংলায় ভাষান্তরিত হওয়া দরকার। খন্ডিত ও ক্রটিপূর্ণ অনুবাদ নয়, এবং উপজাতীয় অনুবাদকই তজ্জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারেন না।

এই পার্বত্য অঞ্চলের উপাজাতীয়দের সংশ্রব ও শিকড় ভারত ও আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত।

এখানকার ইতিহাস ঐতিহ্যের সংশ্লিষ্টতা ঐ সব অঞ্চলেও প্রাপ্তব্য। ভারত ও আরাকানের ইতিহাস লোক ঐতিহ্য আর লোক গাথা সমুহে এই অঞ্চলের অনেক বিবরণই অন্তর্ভুক্ত আছে। সে সব সংগ্রহ করা দরকার। দেঙ্গা ওয়াদি আবেদ ফুং নামীয় লোক কাহিনীটি আরাকানী ভাষায় লিখিত পাওয়া যায়। ঐ কাহিনীটি চাকমাদের মাঝে প্রচলিত রাধা মোহন ধনপতি পালার আরাকানী সংস্করণ বলে ধারণা করা হয়। তফাৎ হলো ঐ কাহনীটির চাকমা নাম শব্দে রাধামোহন শব্দটি আগে বসেছে আর আরাকানী সংস্করণে পরে। দেখা দরকার ঃ ঐ কাহিনীতে কোন ভিন্নতা ও নতুনত্ব আছে কিনা। আরাকানের এই কাহিনীগুলোকে স্থানীয়ভাবে বলে রাজা ওং বা রাজা কাহিনী।

যেখানে ইতিহাসের পক্ষে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নেই, সে স্থলে লোক শ্রুতি ও কাহিনীর যুক্তি গ্রাহ্য অংশ গুলো ইতিহাস বলে গ্রহণীয়। পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পার্শ্ববর্তী দেশের ইতিহাস জনশ্রুতি, লোক, কাহিনী ও গীতি ভাষ্য থেকে সহায়তা নেয়া উপকারী হতে পারে। পার্শ্ববর্তী দেশের ইতিহাসে বর্ণিত ও সমর্থিত কথা কাহিনীর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণগুলো স্থানীয় ইতিহাস রূপে বিবেচ্য হতে পারে। উদাহরণরূপে বলা যায় ঃ চাকমা দেশান্তর কাহিনীতে এমন সব ভৌগোলিক স্থান ও নদীনালার বর্ণনা আছে, যা নেপাল সীমান্ত থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত। তাদের ভাষাটিও এই অঞ্চলের সাথে সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, চাকমাদের আদি বাসস্থান চম্পকনগর, অবশ্যই নগর নাম প্রবণ সাবেক ভারতীয় এলাকায় অবস্থিত ছিলো। ঠিক একইভাবে চাকমা আদি রাজা শের মস্তখাঁর বাসস্থান, রোসাং অঞ্চলে ছিলো বলে লোক গীতির ভাষ্যকে লোক সমর্থিত ইতিহাস বলেই জ্ঞান করা যায়। সাথে সাথে ভাবা যায় তার অনুগামী চাকমারাও ছিলো আরাকানবাসী।
(তাং বুধবার ২ ফাল্গুন ১৪০৭ বাংলা/১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০১ খ্রীঃ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

আরাকানী শরণার্থী আগমন ও তাদের স্বদেশ উদ্ধারের উৎপাত এদেশের বৃটিশ শাসনের শুরুকালকে তিক্ত করে তুলেছিলো। এ ঘটনাবলী আর তা নিয়ে বার্মা ও বৃটিশ সরকারের পারস্পরিক পত্র যোগাযোগ ও বাদানুবাদ ইত্যাদি এতদাঞ্চলের ইতিহাসের অংশ। ঐ কুটনৈতিক পত্রাবলী ও ঘটনাদির লিখিত রেকর্ড পত্র নষ্ট হয়ে না থাকলে তা চট্টগ্রামের কমিশনার কার্যালয়ের মোহাফেজখানা ও রেকর্ড রুমে পাওয়া যেতে পারে, যা এতদাঞ্চলীয় ইতিহাসের মূল্যবান দলিল অবশ্যই। এই পর্বতাঞ্চলের অধিকাংশ উপজাতির আগমন নির্গমনের কথা ঐ সুত্রে নিহিত আছে। প্রথম বৃটিশ আমলের উপজাতীয় অভিবাসন ঘটনাবলীর বিবরণ সম্বলিত দুটি বই (১) মিঃ মেক ফার্লেন লিখিত ইতিহাস ঃ বৃটিশ ইন্ডিয়া এবং (২) মিঃ উইল সন্স লিখিত ঃ নেরেটিভ ওফ দি বার্মিজ ওয়ার খুঁজে পাওয়া গেলে, অনেক অজানা তথ্য লাভ করা ও সম্ভব।

গেজেটিয়ারের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকান খন্ডগুলোতেও প্রচুর তথ্য সন্নিবেশিত আছে। গেজেটিয়ার সুত্রেই জানা যায়, রাঙ্গামাটিতে জেলা প্রশাসকের গ্রন্থাগার ও রেকর্ড রুমে বহু প্রাচীন তথ্য উপাত্ত সংরক্ষিত ছিলো। আমার সন্দেহ ঃ ঐ তথ্যাবলীর অনেকটা খোয়া গেছে। তবে নিম্নোক্ত রেকর্ড পত্রগুলো এখনো দুস্প্রাপ্য নয়, যথা ঃ

১। ডিটেইলড ডেসক্রিপশন ওফ চিটাগাং হিল ট্রাক্টস/মিঃ সিসিবি ষ্টিভেন্স লিখিত নোট ১৯২২ খ্রীঃ।

২। দি হিল ট্রাক্টস ওফ চিটাগাং এন্ড দি ডোয়েলার্স দেয়ার ইন/মিঃ টি এইচ লুইন ১৮৬৯ খ্রীঃ।

৩। এ ফ্লাই ওন দি হুইল/ঐ

৪। এ স্টেটিসটিকেল একাউন্ট ওফ বেঙ্গল খন্ড ৬/১৮৭৬ খ্রীঃ/মিঃ উইলিয়াম হান্টার।

৫। এ ষ্টেটিসটিকেল একাউন্ট ওফ চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ১৮৭১ খ্রীঃ/ঐ

৬। চিটাগাং হিল ট্রাক্টস গেজেটিয়ার ১৯৭৫ খ্রীঃ।

৭। ঐ ১৯০৯ খ্রীঃ/মিঃ হাচিন সন।

৮। এন একাউন্ট ওফ চিটাগাং হিল ট্রাক্টস/ঐ

৯। ফাইনেল রিপোর্ট ওন দি সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট ওফ চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ১৯২৬ খ্রীঃ। (এর একটি টাইপ করা অতিরিক্ত কপি ডাইরেক্টর ল্যান্ড রেকর্ড বাংলাদেশ-এর ঢাকাস্থ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে)।

১০। আরলি রেভিনিউ হিস্টোরী ওফ বেঙ্গল ১৮৭১ খ্রীঃ/এফ ডি এসকোলি।

১১। এ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট ওফ পাটিকারা ১৯০৬ খ্রীঃ/রমেশ চন্দ্র দত্ত।

১২। এক্ট নং ২২/১৮৬০ খ্রীঃ

১৩। এক্ট নং ৭/১৮৬৫ খ্রীঃ। এটি কলকাতা গেজেটে ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৭১ খ্রীঃ তারিখে মুদ্রিত।

১৪। রেগুলেন নং ১/১৯০০ খ্রীঃ ও সংশোধনী সহ পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন।

১৫। ফুর্ণফুলী হ্রদে নিমজ্জিত ১২৫টি মৌজার ক্ষতিপূরণ ও হুকুম দখল সংক্রান্ত সার্ভে রিপোর্ট।

১৬। কর্ণফুলী হ্রদের বাস্তুচ্যুতদের সাম্প্রদায়িক সংখ্যা, নিমজ্জিত খাস জমি, বন্দোবস্ত জমি, জুম জমি, বনভূমি ও পুনর্বাসনের জন্য বন মুক্ত জমির তথ্য উপাত্ত।

১৭। কানাডার ফরেষ্টল ফরেষ্ট্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারনেশনেল কর্তৃক সম্পাদিত পার্বত্য অঞ্চল সার্ভে রিপোর্ট ১৯৬৪ খ্রীঃ।

উপরোক্ত তথ্য সুত্রের বাহিরে রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও সংগ্রহ যোগ্য, যা বিভিন্ন জনের লিখিত স্মৃতিকথা বই পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রতিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ পন্ডিতদের যাচাই বাছাইকৃত গবেষণা ও রচনা সহ উপরোক্ত তথ্য ভান্ডার থেকেই গৃহীত উপাদান নিয়ে একটি যথার্থ ইতিহাস রচিত হতে পারে, এবং

তা প্রকাশের ব্যয় বহন করতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বা জেলা পরিষদ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২। শান্তি সম্ভব।

১।

(তাং সোমবার ৪ পৌষ ১৪০৭ বাং/১৮ ডিসেম্বর ২০০০/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি।)

(ক) ধর্মীয় দৃষ্টিকোণঃ

চিন্তা চেতনা মন ও মানসিকতাকে নিরপেক্ষ নিষ্কলুষ ও সার্বজনীন কল্যাণ কামনায় আগেভাগেই অভিষিক্ত করা দরকার। তাহলেই এমন এক ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে, যেখানে মৈত্রী পূর্ণ সহাবস্থান ও শান্তির সংস্থান সম্ভব। মহান বৌদ্ধ ধর্ম এরূপ পরিবেশ কামনায় ঘোষণা করেঃ সব্বে সত্তা সুখিতা ভবেন্তু- মানে জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। এটি একটি শুভেচ্ছা বার্তা। বৌদ্ধ ধর্ম এরূপ মহানুভবতা স্বীয় অনুসারীদের মধ্যে কামনা করে। এই শুভেচ্ছা বার্তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ঘোষিত হয়েছে এমন এক পঞ্চশীল নীতি আদর্শ, যা প্রত্যেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর পক্ষে অবশ্য পালণীয়। এ নীতি আদর্শগুলো এক পাক্ষিক নয়, সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা মন্ডিতও বটে। ইসলাম ধর্মেও এগুলো শীর্ষ ধর্ম নীতি। এই উভয় ধর্মেই এ নীতিগুলো পরলৌকিক কল্যাণের ভিত্তি। অন্যায় অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা, সকলের কল্যাণ করা, সবার প্রতি মৈত্রী পূর্ণ আচরণ, এবং করো ক্ষতি না করা, এই নীতি আদর্শই তো শান্তির ধর্ম। এ জন্যই বৌদ্ধ ধর্ম অহিংস ধর্ম নামে আখ্যায়িত, এবং ইসলাম ও শান্তির ধর্ম নামে অভিহিত। ইসলামের শাব্দিক অর্থ শান্তি। বৌদ্ধ ধর্ম নিজস্ব কোন নামে অভিহিত না হলেও, তার নৈতিক ঘোষণাই তাকে অহিংস শান্তির ধর্মে অভিষিক্ত করেছে।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল পঞ্চ নীতির প্রথমটি হলোঃ আমি প্রাণী হত্যা থেকে বিরতি শিক্ষা গ্রহণ করছি।

শান্তিরক্ষা ও স্থাপনের পক্ষে এটা একটি প্রধান মন্ত্র। এই নীতির প্রতি অঙ্গিকারাবদ্ধ করে, স্বীয় অনুসারীদের বৌদ্ধ ধর্ম এ ঘোষণাটি পাঠ করায়। এই হত্যা বারণ অঙ্গিকারটি সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেবল মানুষে মানুষে হিংসা ও হানাহানি রোধ করা এর লক্ষ্য নয়। এই অহিংস নীতিটি পশু পাখি মানুষ কীট পতঙ্গ এমনকি প্রকৃতিকেও রক্ষা করে প্রণীত।

ইসলাম সামান্য ভিন্ন আঙ্গিকে প্রাণী হত্যাকে নিষিদ্ধ মহাপাপ বলে ঘোষণা করেছে। কোরানে আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

(১) তোমরা এমন কারো প্রাণ বধ করো না, যাকে বধ করা নিষিদ্ধ বলে আল্লাহ আদেশ জারি করেছেন। (আল কোরান)

(২) মৃত্যুদন্ড ব্যাতীত কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, অথবা দেশে হানাহানির পরিবেশ না থাকা অবস্থায় হত্যাকান্ড চালায়, তাহলে সে যেন গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করলো। (আল কোরান)

(৩) কেউ যদি কোন প্রাণীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়, তা হলে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচালো।(আল কোরান)

সুতরাং হানাহানি ও রক্তপাতের প্রশ্নে বৌদ্ধ ধর্ম ও ইসলাম সামঞ্জস্য পূর্ণ নীতির অনুসারী। বাস্তবক্ষেত্রে মুসলমান ও বৌদ্ধদের এ নীতির ভিন্নতা করাকে অধঃপাত বলা যায়, যা মহা পাপ বা অপরাধ। এমন পাপী ব্যক্তির বৌদ্ধ মতে নির্বাণ লাভ হয় না, এবং ইসলামী মতে তার দোজখের শাস্তিভোগ অনিবার্য, যদি না সে দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থণা শেষে সাধুতা অবলম্বন করে।

বৌদ্ধ ধর্মের উপরে বর্ণিত শুভেচ্ছা বাণীর অনুরূপ শুভেচ্ছা বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকেও উচ্চারিত হয়; যথাঃ "সালামুন কাওলাম মির রাব্বির রাহিমঃ অর্থাৎ প্রভূ দায়াময়ের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বাণী হলোঃ সালাম বা শান্তি। সুতরাং প্রকৃত বৌদ্ধ আর মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব হলো শান্তি অবলম্বন।

মানসিকভাবে হিংসা বিদ্বেষ পরিহার কল্যাণ কামনা ও মৈত্রী ভাব ধারণ এবং ব্যবহারিক ভাবে তা বাস্তবায়নই প্রকৃত শান্তি। এটাই হত্যা ও রক্তপাত থেকে বিরতি গ্রহণের উপায়। সাধু সৎ ধর্মভীরু ব্যাক্তির নির্বাণ লাভ বা পরলৌকিক মুক্তির এটাই সোপান। হিংসা দ্বেষ ও প্রাণহানি পরিহার সম্ভব হলে, ধন লিপ্সা, নারী লিপ্সা, নেশাসক্তি ও মিথ্যাচার পরিহার সহজ হয়ে যাবে। এই পঞ্চ দোষ কর্মই সব অশান্তির মূল। সঠিক ভাবেই মহামতি বুদ্ধ অশান্তি ও পাপের এই মূল কারণগুলো নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছেন। এবং তা পরিহারে নিজ অনুসারীদের অঙ্গিকারাবদ্ধ করেছেন। বিস্ময়করভাবে এই পঞ্চ দোষ কর্মকে মহাপাপ বা কবিরা গোনাহ বলে ইসলামও নির্ণয় করেছে। পৃথিবীতে অশান্তির কারণ এই পঞ্চ কর্ম। বিপরীতে এগুলো পরিহারেই শান্তি। ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্মের এই নৈতিক সামঞ্জস্য, মুসলমান ও বৌদ্ধদের পারস্পরিক মৈত্রী, ও একাত্মতা রচনার পক্ষে এবং পরস্পরের প্রতি সহনশীল হওয়ার জন্য শক্তিশালী সূত্র অবশ্যই।

মানুষের নীতি শিক্ষার আদি ও প্রধান সূত্র হলো ধর্ম। ধর্মই মানুষদের সৎ সাধু স্নেহ পরায়ন পরোপকারী ও সহনশীল হতে শিক্ষা দেয়। এই গুণগুলো বর্ণিত পঞ্চ দোষ কর্মের বিপরীত আচরণ। এই দোষ আর গুণকে এক সাথে অবলম্বন করা মানে

মোনাফেকী বা শঠতা। এই শঠতা, মুক্তি ও শান্তির উপায় নয়। গুণী হতে হলে সৎ সাধু স্নেহ পরায়ণ পরোপকারী ও সহনশীল হতে হবে। পরিহার করতে হবে হত্যা ব্যভিচার, অপহরণ মিথ্যাচার ও মাদকাসক্তি। তদোতিরিক্ত সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য জানিয়ে গোটা সৃষ্টির সাথে আত্মিক যোগসূত্র রচনায় উদ্যোগী হতে হবে। কোন সাধু জনের পক্ষেই হিংস্রতা অবলম্বনীয় নয়। দুষ্টের দ্বারা পীড়ন আর লোভীর দ্বারা উৎপাত, সৎ সাধুকে ও সহ্য করতে হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শীতাতপের মত, আপদ-উৎপাত থেকেও আত্মরক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা ধ্বংসাত্মক ভাবে নয়, কেবল নিবারণ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে, এবং পোষ মানিয়ে। ভালমন্দ ন্যায় অন্যায়ের উপলব্ধিটাই বিবেক। এই বিবেক বোধ সম্পন্ন প্রাণী হলো কেবল মানুষ। এই গুণটাই তাকে অন্য প্রাণীদের তুলনায় অধিক মর্যাদাশালী করেছে। এ বিবেকের সাথে বিরল বুদ্ধি কৌশল যুক্ত বলে সে সৃষ্টির সেরা প্রাণী। কিন্তু হিংস্র পশুবৃত্তিতে এই শ্রেষ্ঠত্বের পদাবনতি ঘটে। মানুষ তখন অন্যান্য প্রাণী সদৃশ একটি পশু বৈ ভিন্ন কিছু থাকে না। মানুষকে পাশবিকতা মুক্ত থাকতে হবেই। তাতেই তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব রক্ষা পাবে।

ধর্ম মানুষকে মহৎ গুণাবলী অর্জন ও সৃষ্টিকর্তার সাথে ভক্তিপূর্ণ সম্পর্ক রচনার শিক্ষা দেয়। এটাই মুক্তি উন্নতি ও সুখ লাভের পথ। জীবে দয়া ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এমন মহৎ গুণ যাকে অবলম্বন করে, সুখ ও তৃপ্তি লাভ নিশ্চিত হয়। হানাহানি, উৎখাত, উৎপাত, সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানি, অপহরণ, ব্যভিচার, মাদকাসক্তি, মাতলামী, মিথ্যাচার, অপবাদ, নিন্দা, কুৎসা ইত্যাদি অবশ্যই কুকর্ম। মানবিক আইনেও এগুলো দন্ডনীয় অপরাধ। ধর্ম আর আইন, অপরাধ মুক্ত পরিবেশই কামনা করে। এ জন্যই দেশ জাতি সমাজ ও সংস্কৃতির বন্ধন যুক্ত সমৃদ্ধ সভ্যতার প্রয়োজন। যথেচ্ছাচার প্রতিরোধই এর লক্ষ্য। পারস্পরিক শৃঙ্খলাপূর্ণ মধুর সম্পর্ক রচনারই সুফল হলোঃ প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বৃদ্ধি। পরস্পর অসহিষ্ণু, মারমুখী ও আত্মকেন্দ্রিক হলে, সৃষ্টিশীলতা ও সুখ বাস্তবায়িত হয় না। অশান্ত সন্ত্রস্ত আর অতৃপ্ত থাকাই তার পরিণতি। ধর্মীয় নৈতিকতার লক্ষ্য মানুষের মাঝে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে তাদের ইহ ও পরলৌকিক স্বস্তি শান্তি ও সুখ রচনা এবং পরম প্রভুকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয়। ধর্মই সৎ উপলব্ধি সৎ কাজ ও আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ করে। সৌভাগ্যক্রমে বৈশ্বিক প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় গুলো যথা খৃষ্টান হিন্দু মুসলমান ও বৌদ্ধরা, নিজ নিজ ধর্মীয় নীতি আদর্শের কারণেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি অঙ্গিকারাবদ্ধ।

একজন বৌদ্ধ ভক্ত যখন ধর্মীয় মন্ত্র পাঠ ক্ষণে গুরু গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করেনঃ 'সব্বে সত্তা সুখিতা ভবেন্তু' তখন তার এই কল্যাণ কামনায় শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাকে একজন আত্ম নিবেদিত বিশ্ব প্রেমিক ও শান্তিবাদী লোক বলেই ভাবতে হয়। অনুরূপভাবে একজন মুসলমান মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে যখন উচ্চ স্বরে ধ্বণিত প্রতিধ্বনিত হয় 'হাই আলাল-ফালাহ' অর্থাৎ এসো কল্যাণের পথে। তখন মনে প্রাণে

এক স্বর্গীয় সুখ ছেয়ে যায়। নামাজ শেষের শেষ বাক্যটিও হলোঃ আস-সালামু - আলাইকুম ওয়ারা হমাতুল্লাহ অর্থাৎ আপনাদের সবার শান্তি হোক।
সুতরাং ধর্মতঃ মুসলমান ও বৌদ্ধজনেরা শান্তিকামী এবং মহৎ আদর্শের অনুসারী। তারা শান্তির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ।

(তাং- শনিবার ৮ পৌষ ১৪০৭ বাং/ ২৩ ডিসেম্বর ২০০০ খৃঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি।)
একজন লোকের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হতে কেবল পঞ্চ পবিত্র বাক্য মৌখিক পাঠ করাই যথেষ্ট নয়, তাকে ব্যবহারিক ভাবেও সে পঞ্চ নীতি আদর্শের অনুসারী হতে হবে। নিষ্ঠাবান বৌদ্ধরা খাদ্যের প্রয়োজনে ও বটে প্রাণী বধ ও শিকার করা থেকে বিরত থাকেন। তারা অভুক্ত প্রাণী ও কীট পতঙ্গের আহারের লক্ষ্যে যথাসাধ্য খাদ্য যোগান। অপারগ হলে নিজেদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য বস্তুগুলো তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এই পার্বত্য অঞ্চলে চলাচল পথে অনেকে পথিকদের বিশ্রামের জন্য, নিজ পরিশ্রম ও ব্যয়ে বিশ্রাম ঘর বেঁধে দিয়ে থাকেন। কেউ কেউ যাতায়াত পথের ধারে ছোট্ট মাচায় পথিকদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কলসীতে পানি রেখে থাকেন। এ হলো মহানুভবতা সম্পন্ন জীব সেবার উদাহরণ। এটা মহান বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রভাবের ফল। এভাবে সাধু সৎ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে অহিংস উদার ও সেবা কাজে উৎসর্গীত করে বলে বৌদ্ধ ধর্ম মহীয়ান। এর আত্ম নিবেদিত অনুগামীরা সহিংস অমানবিক আচরণকে নীতিগতভাবে কখনো প্রশ্রয় দিতে পারেন না। যারা বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সহিংস ও আগ্রাসী আচরণে অভ্যস্ত, তারা প্রকৃত বৌদ্ধ নন। একইভাবে একজন মুসলমানকেও ধর্মত অহিংস আর শান্তিবাদী হতে হয়।
অন্যায় অবিচার প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। বৌদ্ধ মতে তার পথ যুদ্ধ বিগ্রহ নয়। প্রতিপক্ষকে অহিংস উপায়ে বশে আনা ও দুষ্কর্মের প্রতি অনীহ করে তোলাই হলো সে প্রকৃষ্ট শান্তির পথ। একজন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ শত্রুর প্রতিও সদাশয় হোন, তিনি কখনো অবন্ধু সুলভ আচরণে লিপ্ত হোন না। তাই বলে এটি নিরীহ আর দুর্বলের ধর্ম নয়। অতীতে মহা পরাক্রমশালী কোন কোন সম্রাটকেও এই ধর্মের অহিংস শক্তি মত্তার কাছে হার মেনে তার মহত্বের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হতে হয়েছে। সম্রাট অশোক তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। মূলতঃ দয়া আর অহিংসাই শক্তি।

ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্মে তফাৎ অতি ক্ষীণ। বৌদ্ধ ধর্ম সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে নীরব এবং ইসলাম ধর্ম সরব। এই হলো তফাৎ। ইসলামের খোদায়ী নীতিও বৌদ্ধ ধর্মের পঞ্চ নীতি, এক ও অভিন্ন হওয়ার কারণে, এ সম্ভাবনা চিন্তনীয় যে, মহামতি গৌতম হয় তো কোন নবী বা রসুল ছিলেন। ইসলাম যেমন পৌত্তলিকতা বিরোধী তেমনি গৌতম বুদ্ধ নিজে হিন্দুর সন্তান হয়েও তাতে মুক্তির সন্ধান পান নি, ঘোষণা দেনঃ দেব দেবীর পূজায় নয়, মুক্তি বা নির্বান পঞ্চ নীতি পালনেই নিহিত। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম অংশীবাদ বিরোধী অপৌত্তলিক। এতদসত্ত্বেও বুদ্ধের মুর্তি স্থাপন ও পুজা,

পরবর্তী অতি ভক্তি জাত সংযোজনই ভাবা যায়। একজন লোক পবিত্র কলিমা পড়ে, আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমান রূপে অভিষিক্ত হওয়ার পর তাকে বিশ্বাস করতে হয়ঃ এক আল্লাহ সত্য, ফেরেশতারা সত্য, খোদা প্রেরিত ধর্মীয় পুস্তকাদি সত্য ধর্মদূত বা রাসুলেরা সত্য, শেষ বিচারের দিন সত্য, বিধিলিপি, যার ভাল মন্দ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, তা সত্য, এবং মৃত্যুর পর একদিন পুনরোত্থান ঘটবে ও বিচার হবে তাও সত্য।

পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেছেন ঃ লি-কুল্লি-কৌমিন হাদ অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির জন্য পথ প্রদর্শক এসেছেন। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর বাণী মতে পৃথিবীতে যুগে যুগে দেশে দেশে বহু সংখ্যক নবী রসুল আবির্ভূত হয়েছেন, যাদের সংখ্যা এক লাখ চব্বিশ হাজার বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার। অথচ কোরানে হাদিসে মাত্র ২৬ জনের নাম আছে। ইতিহাস বলে ঃ ভারত হলো অন্যতম প্রাচীন সুসভ্য দেশ। সুতরাং আল্লাহর বাণী মতই অনুমান করা যায়, ভারতেও নবী রাসুল আবির্ভূত হয়েছেন, যাদের নাম কোরান হাদিসে উল্লেখিত নেই, অথবা আরবী ভাষ্যে, ভারতীয় নাম দুর্বোধ্য হয়ে আছে। হিব্রু ও আরবী সহোদর ভাষা হলেও, আরবীতে ইয়াকুব হিব্রুতে জেকব। এমনি ইব্রাহিম হয়েছেন আব্রাহাম, জাকারিয়া হয়েছেন জেরহাম ইত্যাদি। কিন্তু ভারতীয় কোন ভাষাই আরবী ও হিব্রুর মত নৈকট্যযুক্ত নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই আরবী আব্দুল্লাহ নামের ভারতীয় বিকল্প হয় ঈশ্বরদাশ। এই ভাষা জনিত জটিলতায় ভারতীয় নবী রসুলদের আরবী বিকল্পনাম কোরান হাদিছে খোঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। তবে ভারতীয় ধর্মীয় মহা পুরুষদের প্রচারিত নীতি আদর্শ হলো একটি মাপকাঠি, যদ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব যে, কোন নীতি আদর্শ ইসলামের সাথে সঙ্গতিশীল, এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্ম প্রচারকই সম্ভবতঃ ইসলাম স্বীকৃত নবী বা রাসুল। এটা নির্ধারিত হওয়ার পর প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে তখন ফরজ হয়ে দাঁড়াবে ঐ মহাপুরুষকে নবী বা রাসুল হিসাবে বিশ্বাস করা। মহামান্য গৌতম বুদ্ধের নীতি আদর্শের পঞ্চতন্ত্র হুবহু ইসলামেরই নীতি আদর্শ। সুতরাং তাকে নবী বা রসুল হিসাবে বিশ্বাস করার পক্ষে যুক্তি আছে। বিষয়টি বিতর্কিত হলেও, মহামতি বুদ্ধ, মুসলমানদের নবী সদৃশ পরম শ্রদ্ধার পাত্র, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সূত্রে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও মুসলমানদের সমধর্মীয় চেতনার অংশীদার আপনজন। খৃষ্টানরা মিত্র ও ভ্রাতৃ সমাজ। যিশু হলেন মুসলমানদের ইসা নবী।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে বুদ্ধের জন্ম ও জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছে। সে যুগে শিক্ষা সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চা ছিলো অতি বিরল। সুতরাং তখনকার হুবহু বৃত্তান্ত ও বিবরণ সঠিক লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা এবং তার অদ্যাবধি টিকে থাকা এক অসম্ভব ব্যাপার। এই ঐতিহাসিক শূণ্যতার কারণেই ঐ যুগে প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্মের আসল রূপ সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা হলেও অজ্ঞ থাকা স্বাভাবিক। এ কারণে ত্রিপিটকের বাণী ও শিক্ষা এবং বৌদ্ধ চরিতাবলী ও বাণী সমূহের ব্যাপারে আমরা খানেকটা সন্দিগ্ধ হতে বাধ্য । তাতে কিছুটা হলেও সংযোজন, বিমোচন ও বিস্মরণ ঘটে

থাকবে। সম্ভবতঃ বুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন, এজন্যই তার আদর্শ ও নীতি একেশ্বরবাদী নীতি আদর্শের হুবহু প্রতিরূপ। ঐশ্বরিক পৌত্তলিকতা ও বহু দেবতা-বাদকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা ছিলো তার পৈতৃক ধর্ম। বহু ঈশ্বর ঐ দেবতার ঈশ্বরিক ক্ষমতাকে বিশ্বাস করে তাদের মুর্তি স্থাপন ও পূজা করাকে বলে অংশীদারিত্ব, যা ইসলামী পরিভাষায় শিরিক আখ্যায়িত। এর বিপরীত ধর্ম হলো ঐশ্বরিক একত্ব। এটি একত্ববাদ বা তৌহিদ। এটা স্পষ্ট যে বুদ্ধ নিজের পৈতৃক শিরিক ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন, যার বিপরীত নীতি হলো তৌহিদ। সুতরাং তৌহিদের অনুসারী রূপে গৌতম বুদ্ধকে নবী বা রসুলের মর্যাদায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও বিশ্বাস করা একজন মুসলমানের পক্ষে জরুরী। মূলতঃ পৌত্তলিক বা নাস্তিক ছিলেন না বলেই তিনি আস্তিক।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তার লিখিত বয়ানুল কোরানে মহামান্য গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন। ইসলামী পন্ডিতদের পক্ষে এ ব্যাপারে আরো গভীর চিন্তা ভাবনা গবেষণা ও আলোচনা উপস্থাপন করা দরকার। আলোচনা অনুকুল হলে স্বভাবতই বৌদ্ধরা মুসলমানদের ভ্রাতৃ সমাজে পরিণত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শান্তি অর্জনের পক্ষে এটা হবে আরেক অগ্রযাত্রা। মুসলমানদের মতে খৃষ্টানরা বিশুদ্ধ আস্তিক নন।
(তাঃ সোমবার ১১পৌষ ১৪০৭ বাং/ ২০ ডিসেম্বর ২০০০ খ্রীঃ/ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি।)

মাননীয় বন ভান্তে সাধনানন্দ মহাথেরো এ বছর কঠিন চীবর দান উৎসব উপলক্ষে স্বীয় আস্তানা রাঙ্গামাটি শহরের রাজবন বিহারে লক্ষ ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ ভক্ত অনুরাগীদের উপস্থিতিতে অতি মূল্যবান একটি দেশনা উপস্থাপন করেছেন। তাতে এক পর্যায়ে তিনি বলেছেন ঃ যে হত্যা হানাহানি ও হিংসায় নিয়োজিত সে সাধু নয়। যে ব্যাভিচার ও পরস্ত্রী গমনে অভ্যস্ত সে সাধু নয়। যে পর ধন হরণ ও দূর্নীতিতে আবদ্ধ সে সাধু নয়। নেশাসক্ত ব্যক্তিরা সাধু নয়। মিথ্যাচারে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা সাধু নয়। এদের কোন নির্বান নেই।
এই দেশনা সূত্রে স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু সংঘের পক্ষে তিনি শান্তিপূর্ণ অপরাধমূক্ত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাজকতা কেবল ধর্মীয় দেশনা যুক্ত ব্যাপার নয়, অপরাধমুক্ত সমাজ গঠন ও শান্তি চর্চার এক মহান আন্দোলনও বটে। এটিকে তীব্র আন্দোলনে উন্নীত করা গেলে, ক্ষুদ্র সন্ত্রাসী হিংসাবাদীরা কোণঠাসা হতে বাধ্য।

ইসলামী ধর্মগুরুদের অনুরূপভাবে শান্তি সংহতি ও অপরাধ মুক্তির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া হলো নৈতিক দায়িত্ব। এ কাজে অন্যান্য ধর্মগুরুদের সাথে তাদেরও একাত্ম হওয়া আবশ্যক। সমাজে শান্তি স্থাপন ও অপরাধ মুক্তি হলো নৈতিক দায়িত্ব যা বৌদ্ধ আর ইসলাম ধর্মের লক্ষ্য। পূণ্যবান মানুষ গড়ায় অবদান রাখতে পারাই

সৎ ধর্ম পালন। হিংসাশ্রয়ী ধর্মান্ধদের সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা থেকেও রোখতে হবে। এটা উত্তম মানব সেবা।

স্থানীয় বৌদ্ধ গুরু সংঘ আর ইসলামী আলিম সংঘের একটি সমন্বিত সামাজিক কর্মক্ষেত্র বা প্লেটফর্ম রচনা দরকার, যার কাজ হবে ধর্মীয় বিতর্ক অনুষ্ঠান নয়, নিজ নিজ ধর্মীয় অনুসারীদের অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বধর্মের আচার অনুষ্ঠান সাধুতা ন্যায় নীতি ও সৃষ্টিকর্তার আরাধনাসহ মানবিক গুণাবলী চর্চায় সংশ্লিষ্ট করা।

সাধু সৎ হিতাকাঙ্খী ধর্ম ভীরুরাই পুণ্যবান লোক। অসাধু দুর্নীতিবাজ, অহিতৈষী লোকেরা ধর্ম ও মানবতার শত্রু। মুর্তিমান শয়তান বা রীপু হলো এরা। এরা লোকজনকে কুকর্মে প্ররোচিত করে। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈনিক হলেনঃ সৎ সাধু পূণ্যবান লোকেরা, যাদের নেতৃ পুরুষ হলেন জ্ঞানী গুণী, আলিম ও গুরু সঙ্গের সদস্যবৃন্দ। রাষ্ট্রীয় পরিপোষণে এদের সংঘবদ্ধ করে, দুষ্ট দুর্মতিদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও সরব করা দরকার। এরা নৈতিকতার পক্ষে আত্মনিবেদিত স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি। নীতিগত ভাবে রাষ্ট্রের ও লক্ষ্য, অপরাধমুক্ত দেশ ও জাতি গঠন, এবং সুখী ও শান্ত পরিবেশ রচনা। সুতরাং এই দুই শক্তিকে এক প্লেট ফর্মে আনা মানে সদাচার ও কল্যাণের পক্ষে বৃহত্তর ঐক্য সমন্বয় ও সমাবেশ সাধন। ধর্ম কর্মের আচার অভ্যাস হলো সাধুতারই চর্চা। তবে সংস্কার ও ধর্মান্ধতা পরিহার আবশ্যক।

দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে ধর্মনীতি ও ধর্মীয় গুরুদের একই প্লেট ফর্মে তৎপর করা গেলে, পারস্পরিক সহনশীলতা ও মৈত্রী জোরদার হবে এবং শান্তি হবে আরো বাস্তব, এটা দৃঢ় আশাবাদের বিষয়। তপ্ত বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশে মানুষে মানুষে মৈত্রী ও ভালবাসা রচনা হলো মহৎ কাজ। ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ি ক্ষতিকর। এ জন্যই ধর্ম অনেকের নিকট মাদক তুল্য। কিন্তু আসলে ধর্ম নৈতিকতা, কল্যাণ ও সদ চিন্তার উৎস। অতি প্রগতিবাদীদের দ্বারা ধর্ম যতই সমালোচিত হোক, আসলে ধর্মই কল্যাণ ও সদচিন্তার উৎস। উন্নত মনন ও কল্যাণকর চিন্তা চেতনার সূচনা ধর্ম থেকেই ঘটেছে। আদিম মানব গোষ্ঠী উন্নত চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ ছিলো না। তাদের জ্ঞান ও চেতনা ছিলো সীমাবদ্ধ ও স্থুল। ধর্মই তাদের সে জ্ঞানগত দৈন্য ঘোচাতে ও যুগোপযোগী ধারণা দিতে এগিয়ে আসে। রুচিকর খাওয়া পরা, আবাসন, আত্মরক্ষা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন ও সৃষ্টিকর্তার উপাসনা, এবং উন্নত জীবনের কলা কৌশলের জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ প্রথমতঃ ধর্মই দান করেছে। তাই ধর্মই হলো ঐশ্বরিক জীবন বিধান। কালের প্রভাবে অপচর্চা, বিস্মৃতি, সংস্কার, সংযোজন ও অতি ভক্তিবাদ ইত্যাদি মূল ধর্ম সংস্কৃতিতে আবর্জনা, বিচ্যুতি ও পরগাছা যুক্ত করে, ধর্মান্ধতার জন্মদান করেছে। প্রাগৈতিহাসিক কালের প্রাচীন ধর্মাদি তাই আদি অক্ষত রূপে সংরক্ষিত থাকতে পারেনি।এ কারণে প্রাচীন ধর্মীয় অনেক আচার আচরণ ও অনুষ্ঠানকে এখন আর যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না, এবং সেগুলোর অনেকটা

বিজ্ঞানসম্মতও নয়। আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মী ও যুক্তিবাদী অনেকের কাছে পৈতৃক প্রাচীন ধর্ম হুবহু মান্য হয় না। তাদের কাছে স্বধর্মীয় অনেক কিছুই প্রশ্ন সাপেক্ষ। এতদসত্ত্বেও ধর্ম বৃহৎ সংখ্যক জনগোষ্ঠীর কাছে পূণ্য কর্ম রূপে পালনীয়। ধর্মীয় আবর্জনাকে বর্জন করে, কেবল সদাচার গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে, সবার পক্ষে নৈকততা চর্চায় মোনযোগী হওয়া দরকার।

৪ (তাং বুধবার ২০ পৌষ ১৪০৭ বাংলা/ ৩ জানুয়ারী ২০০১ / দৈনিক গিরিপদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

(৩) প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মৈত্রীঃ

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আসলে অভিন্ন এক ভৌগোলিক অঞ্চল। এটি ত্রিপুরা, মিজোরাম ও আরাকানের উচুঁ ও দুর্গম পর্বত শ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত পাহাড় ময় দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী ঢাল ও সমতল যা বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর যোগাযোগ প্রকৃতি নিম্নমুখী। এই আধুনিককালে ও ত্রিপুরা মিজোরাম ও আরাকানের সাথে এতদাঞ্চলের ভৌমিক যোগাযোগ সহজ নয়, কষ্টসাধ্য। বিপরীতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পরস্পরের সাথে জড়িত ভূখণ্ড । এই পর্বতাঞ্চলের পলি, পানি খনিজ বস্তু ও বনজ পণ্যের দ্বারা নিম্নাঞ্চলের মাটি উর্বর ও মানুষেরা উপকৃত। নিম্নাঞ্চল হলো উপরের পাহাড় প্রকৃতির পাদ ও প্রান্তর।

খোঁজ নিয়ে দেখা যায়ঃ চট্টগ্রামের অধিকাংশ বাঙ্গালী বড় য়ারা মগ পূর্ব পুরষদের সাথে সম্পর্কিত। চাকমা অভিজাতেরা বৃহদাংশে মুসলিম ঐতিহ্যধারী। তাদের অনেকে হিন্দু বাঙ্গালী সংকর ও বটে। এভাবে প্রাচীনকাল থেকে সংশ্রিণের ধারায় স্থানীয় পাহাড়ী বাঙ্গালীদের বংশ বিস্তার ঘটেছে। আচার ব্যবহার, ভাষা সংস্কৃতি ও বাসস্থানের ভিন্নতার কারণে তাদের শ্রেণীগত ভিন্ন পরিচিতি গঠিত হলেও, নৃতাত্বিক সম্পর্কে স্থানীয় বাঙ্গালী ও পাহাড়ীরা পরস্পরের স্বজন।

চট্টগ্রামী বাঙ্গালীদের মঘী ঐতিহ্য হলো তাদের মেয়েদের অনেকে মঘী অঙ্গভরন ও অলংকার পরে থাকেন। অনেকে চুরুট পানে ও অভ্যস্ত, যা বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলে দৃশ্য মান। অনেকে তঞ্চঙ্গ্যা ও ত্রিপুরী ধরণের খাদি-জাত দুই খন্ড আবরণী ব্যবহারে অভ্যস্ত। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা, চট্টগ্রামী বাংলার যমজ ভাষা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি ক্ষীণ। উচ্চারণ পার্থক্যের গুণে খোদ চট্টগ্রামী ভাষা, উত্তর মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে তিন রকম। তেমনি চাক্মা ও চঞ্চঙ্গ্যা উভয়ের উচ্চারণ ভঙ্গি ভিন্ন। চট্টগ্রামীদের সাথে তাদের অনুরূপ স্বতন্ত্র উচ্চারণ ধারাই পার্থক্য সুচিত করে। আসলে চট্টগ্রামী তঞ্চঙ্গ্যা ও চাক্মারা একই ভাষা ঐতিহ্যে সম্পৃক্ত লোক। চাক্মা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা চট্টগ্রামী মুসলিম ভাষার সাথে একাত্ম ও, গভীরভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার উদাহরণ দ্রষ্টব্যঃ

"ও খোদা! ও খোদা বান্দা। মে তুই খালাস গর। মুই তোরে সাজ্জি গরোঙ্গোরঃ (লেখক কর্তৃক শ্রুত জনৈকা চাকমা প্রসূতির উক্তি)

বাংলা ঃ ও খোদা। ও খোদা ওন্দা। আমাকে তুমি খালাস করো। আমি তোমাকে সিজদা করছি।

এটি কোন বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়। এমনি অজস্র ধারায় স্থানীয় মুসলিম সামাজিক ভাষা চাক্‌মা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের মাঝে প্রচলিত যা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। যথাঃ দজখ (দোজখ) হুগুম (হুকুম) হেমান, ঈমান ইত্যাদি। এটা ধর্মীয় সামাজিক সংমিশ্রণ ছাড়া কখনো সম্ভব হবার নয়। মনে হয়, অতীতে উভয় সমাজ অতি ঘনিষ্ঠ মিত্ররূপে পাশাপাশি অবস্থান করতো। সম্ভবতঃ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও ধর্মীয় সম্পৃক্ততাও ঘটেছে যথাঃ দশজন মুসলিম নাম পদবিধারী চাকমা রাজা ও তাদের ব্যবহৃত নয়টি আরবী লেখা সমৃদ্ধ সীলমোহর। দ্রষ্টব্যঃ আমার লিখিতঃ গবেষণাকর্মঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম।

এই উদাহরণগুলো এখনকার বৈরীতা পূর্ণ সম্পর্কের বিপরীত চিত্র। ঐ সমৃদ্ধ অতীত ঐতিহ্য, পুনরায় সুসম্পর্ক রচনার পথ প্রদর্শক হতে পারে, এবং সে ইতিহাসও ঐতিহ্য অনস্বীকার্য। বর্তমান তিক্ততাকে অতীত মাধুর্য্যের ধারায় ফিরিয়ে নেওয়া কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তা যত দুরুহই হোক।

একাত্মতার আরেক উদাহরণ হলো অভিজাত সাজ পোষাক। রাজা ত্রিদিব রায় পর্যন্ত চাকমা রাজাদের দরবারী পোষাক হলো মোগলাই, তথা শেরোয়ানী, পাজামা, পাগড়ি ও নাগরা জুতা এবং সাধারণ চাকমা ভদ্রজনের পরনীয় হলো ধুতি ও ফতুয়া। নিম্নবিত্ত চাকমারাও খাটো ধুতি বা গামছা পরতে অভ্যস্ত। এটা বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান চরিত্রের অংশ। এটা সাধারণ জোরালো লক্ষণ যে, অতীতে চাকমারা হিন্দু ও মুসলিম বাঙ্গালীদের সামাজিকভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ধর্মের কথা বাদ দিলেও মানবিক মৈত্রী ও সামাজিক যোগাযোগ ছিলো। তাতেই ভাষা আচার আচরণ পোষাক ও নাম করণে প্রভাব পড়েছে বলে ভাবা যায়। পার্বত্য উপজাতীয়দের মাঝে কেবল চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা লোকজনই প্রাচীন ভারতীয় ভাষা পোষাক ইত্যাদি লোক সংস্কৃতির অনুসারী। বাদ বাকিরা অভারতীয় সংস্কৃতিতে আবদ্ধ। এ বিচারেও বলা যায়, বর্ণিত লোকেরা রক্ত মাংসেই বাঙ্গালীদের আপনজন। তাদের স্বকীয়তা আছে, তবে বাঙ্গালী ঘেঁষা আন্ত সাম্প্রদায়িক আত্মীয়তার সম্পর্কটাও অনস্বীকার্য।

যদি চাকমারা বাঙ্গালী সম্পর্কহীন স্বতন্ত্র জাতি সত্তাভুক্ত লোক হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে তাদের স্বতন্ত্র আদি ভাষা সংস্কৃতিটা কী? এবং ঐ স্বকীয়তা ত্যাগ করে বাঙ্গালী ভাষা সাংস্কৃতিতে তাদের অভ্যস্ত হওয়া কী করে সম্ভব? এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। এতেও প্রমাণিত হয়, বাঙ্গালী চাক্‌মা ও তঞ্চঙ্গ্যারা এমন এক মিশ্র জনশক্তি, যারা পরস্পর একাত্ম অথচ স্বতন্ত্র। তাত্বিক বিচারে বাঙ্গালী হিন্দুরা বহু সমাজ ও বর্ণে বিভক্ত। মুসলমানেরাও শিয়া সুন্নী ওহাবী ইত্যাদি বহু উপদলে দলবদ্ধ। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের মাঝে অনুরূপ বিভক্তি প্রচুর। তবু সবাই একটি

সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক সমষ্টি। জুম সংস্কৃতি উপজাতীয় লোকদের একক সাংস্কৃতিক সমষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং বাঙ্গালীদের করেছে পৃথক।

বাঙ্গালী মুসলমানদের সাথে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের সামাজিক নৈকট্যের আরেক নজির হলো ঃ সাধারণ মহিলা বিশেষণ বি তথা বিবি। এই মহিলা বিশেষণটি ভাষাগতভাবে তুর্কী হলেও বাঙ্গালী মুসলিম মহিলা আর চাক্‌মা ও তঞ্চঙ্গ্যা মহিলাদের নামের ভুষণরপে এটি অবাধে গৃহীত। বি হলো বিবি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। চাকমা রাজবধুরা বিবি বিশেষণে সম্বোধিত হতেন এবং রাজাদের রাজকীয় খেতাব ছিলো খান। ঐ বিবি বি আকারে সাধারণ মেয়েদের মাঝে ছড়িয়ে আছে। খান খেতাব তার আভিজাত্য রক্ষা করে, কেবল অভিজাত শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ ছিলো। তবে বিজাতীয়তার গুণে তা শেষমেশ বিলুপ্তই হয়ে গেছে। চাকমা রাজা হরিশচন্দ্র স্বীয় পিতা গোপিনাথের নামানুসারে অমুসলিম নামধারী ছিলেন। তার সাথে যুক্ত হয় ইংরেজ প্রদত্ত উপাধি রায়। তাই ১৮৭৩ সাল থেকে চাকমা রাজ পরিবার খান খেতাবের পরিবর্তে রায় খেতাবে পরিচিত। তবে এটিও বাঙ্গালী হিন্দু উপাধি। সুতরাং বলা যায়, চাকমাও তঞ্চঙ্গ্যারা স্বতন্ত্র হলেও বাঙ্গালী পরিচয় ও সংস্কৃতির সাথে আষ্ঠে পৃষ্ঠে বাধা। এই একাত্মতা অপরিত্যাজ্য।
(তাং বৃহস্পতিবার ২১ পৌষ ১৪০৭ বাংলা/ জানুয়ারী ২০০১ ইং/ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি।)

উপজাতিরা মূলতঃ জুম জীবি সম্প্রদায়। জীবিকার প্রয়োজনেই তারা বনাঞ্চল ও পাহাড়কে আশ্রয় করে জীবন যাপন করে। লাঙ্গল কৃষির মত জুম কৃষি একই জমিতে অবিরাম করা যায় না। এটি হলো স্থানান্তর মান কৃষি। এবার এ পাহাড়ে তো পরের বার অন্য পাহাড়ে। নতুন জুম ভূমিটি, অনাবাদী গভীর-বনময় না হলে ফসল ভাল হয় না। অনেক সময় ধারে কাছে এরূপ সুবিধাজনক জমি পাওয়া যায় না। তাই জুমিয়াদের দূরবর্তী দূর্গম অঞ্চলে স্থানান্তর হয়ে যেতে হয়। এই স্থানান্তর প্রক্রিয়ার কারণে তাদের অধিকাংশের স্থায়ী বাড়ি ঘর থাকে না, এবং তাই আসবাব আয়োজন জৌলুস, আড়ম্বর ইত্যাদি বাহুল্যে ও তারা অভ্যস্ত হয় না। কয়েকটি হাড়ি, পাতিল, ঘটি, বাটি, কলসি, দুলনা, ঝুড়ি, কাঁথা বালিশ ও মোটা কাপড়ই তাদের সম্বল, যা এক যাত্রায় স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ে সহ একত্রে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আস্তানায় অস্থায়ীভাবে নির্মিত বাঁশ বেতের ঝুপড়ি মূল্যবান কিছু হয় না, এবং আঙ্গিনাটিও ফল ফলারীর বাগানহীন থাকে বলে সহজেই ফেলে যাওয়া যায়। তাদের কোন সঞ্চয় ও সংগ্রহ থাকে না। তাই জীবনটি পিছুটানহীন হাল্কা। এই ভাসমান জুমিয়া জীবনে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতা চর্চার কোন সুযোগ নেই। এটা মানবেতর অনুন্নত জীবন। অথচ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় উন্নত জীবনের সোপান হলো স্থায়ী পাড়া জীবন, হাল কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা, যা জুমিয়া জীবনে অনুপস্থিত। এই মানবেতর অবস্থা থেকে বাঙ্গালীরাই পাহাড়ীদের টেনে তুলেছে এবং তুলছে। ঘর বাঁধা, জমি চাষ করা, ফসল উৎপাদন উদ্বৃত্ত ফসল গোদাম ও বাজারজাতকরণ, অসবাবপত্র তৈরী ও ব্যবহার,

বাগান পদ্ধতিতে ফলমূল তরি তরকারী ও কাঠের উৎপাদন ইত্যাদি কৌশল বাঙ্গালীরাই পাহাড়ীদের শিখিয়েছে। ব্যবসা পেশা এখনো তাদের পরিপূর্ণ আয়ত্তে আসেনি। কারণ তারা সঞ্চয়ী ও অধ্যবসায়ী নয়। অতি অল্প সংখ্যক পাহাড়ী যারা ব্যবসা পেশায় নিয়োজিত ও সফল, তাদের সাথে বাঙ্গালী সম্পৃক্ততাই কার্যকর।

জুমিয়া ও পাহাড়ীদের উদ্বৃত্ত ফল ফসল ও বাগান পণ্যের একচেটিয়া খরিদ্দার ও ভোক্তা হলো বাঙ্গালীরা। নদী ও সড়ক পথে চলমান বাঙ্গালী বেপারীরা, দুর্গম পাহাড়ী পাড়া পরিবেশে সেই আদিকাল থেকে বিভিন্ন ভোগ্য পণ্য ও হাল্কা সৌখিন দ্রব্য অবাধে পৌছে দিচ্ছে। দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাজার হাটে বিভিন্ন ভোগ্য পণ্যের দোকান সাজিয়ে বাঙ্গালীরা, পাহাড়ী জনগণের নিত্যদিনের চাহিদা মিটাচ্ছে। এটা বাঙ্গালীদের বিরাট রকমের ব্যবসায়িক সেবা কাজ। এতে জোচ্চুরির ও ফটকাবাজির দু একটি ঘটনা থাকা অসম্ভব নয়, যা বৃহত্তর কল্যাণের তুলনায় তুচ্ছ।

আদিকাল থেকে বাঙ্গালী কৃষক শ্রমিক বেপারী দোকানী কর্মকর্তা কর্মচারী ও ব্যবসায়ী মহল উশৃঙ্খল ও বৈরী পাহাড়ীদের দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে। কিন্তু তথাপিও তা বাঙ্গালীদের মাঝে ব্যাপক হিংসা বিদ্বেষ ও জাতিগত প্রতিহিংসার জন্ম দেয়নি। এগুলোকে সব সময়ই অবাঞ্ছিত বিচ্ছিন্ন ঘটনা রূপে ভাবা হয়েছে। কখনো তজ্জন্য চট্টগ্রামের শহর বন্দর হাট-বাজার ও পাড়ায় আগত পাহাড়ীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি। ১৮৬০ সালের আগে পরে পাহাড়াঞ্চলে অবস্থিত বাজার হাট ও কৃষি ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা লোটপাট হত্যা অপহরণ ও অগ্নি সংযোগের শিকার হয়ে, বার বার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাতে এই ভেবে প্রশাসন পীড়িত হতেন যে, সমতলে আগত পাহাড়ীদের হয়তো তজ্জন্য প্রতিহিংসার শিকার হতে হবে। কিন্তু কখনো তেমন কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। এসব ঘটনা বাঙ্গালীদের চরম সহিষ্ণুতার পরিচায়ক। বিপরীতে অসহিষ্ণুতার উদাহরণ হলো পর্বতঞ্চলে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে শুরু দীর্ঘ আড়াই দশকের আরাজকতা ও খুন খারাবারীর ব্যাপক ও নৃশংস ঘটনাবলী যা বাংলাদেশে উপজাতীয় বিদ্বেষের জন্ম দিতে পারেনি। পাহাড়ী বাঙ্গালী আভ্যন্তরীন প্রতিহিংসা হলো ভূক্তভোগীদের পাল্টা পাল্টি সৃষ্ট তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ফল। এতে স্থানীয় রাজনীতিও জড়িত। এটা স্থায়ী সাম্প্রদায়িক রূপ চরিত্র নয়।

আজকাল অধিকাংশ পাহাড়ী আর জুম নির্ভর নয়। তারা এখন স্থায়ী ঘর গৃহস্থালী, হাল কৃষি, ফলমূল তরি তরকারী উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও পশু পাখি পালন, কাঠ উৎপাদন আর চাকুরী পেশায় নিয়োজিত। এই উন্নতি যথেষ্ট নয়। শেখার আরো আছে। পাহাড়ীরা এখনো অনেক ব্যাপারে অজ্ঞ। তাদের জন্য বাঙ্গালীদের ওস্তাদী এখনো অনেক বিষয়ে প্রয়োজনীয়। শূণ্য থেকে পূর্ণ হওয়ার ব্যবসায়িক কৌশলে এখনো উপজাতীয়রা পিছিয়ে আছে। তারা ভোক্তা হয়ে আছে, পুঁজি সংগঠক নয়। সফল বিনিয়োগ, লাভ, অর্জন, সঞ্চয়ের অভ্যাস ও অধ্যবসায় এখনো তাদের

আয়ত্তাধীন হয়নি। অনেক ছোট খাটো পেশায়ও তারা অনভ্যস্ত। শ্রমঘন নির্মাণ কাজ তাদের দ্বারা হয় না। তাই এতদাঞ্চলীয় নির্মাণ শ্রমিক প্রায় একচেটিয়া বাঙ্গালী। কামার, কুমার, সুতার, আরাকসী, স্বর্ণকার, নরসুন্দর, মাঝি, মাল্লা, সুকানী, খালাসী, সারেং, জেলে, মালি ইত্যাদি নিম্ন বৃত্তের পেশাজীবি লোক তাদের মাঝে বিরল। ইতর পেশা ও কায়িক মজুরী, উপজাতীয়দের মাঝে অবহেলিত। সুতরাং এতদাঞ্চলে উচ্চবৃত্তি আর নিম্নবৃত্তির বিপুল শূণ্যতা বাঙ্গালীরাই পূরণ করছে। এ ভাবার অবকাশ নেই যে, ক্ষমতা পেলেই সব কিছু পূরণ হয়ে যাবে। রাজনীতি কিছু উচ্চাকাঙখী লোককে প্রতিষ্ঠিত করে অবশ্যই। তবে আপামর জনসাধারণের দারিদ্র্য মোচন বা ভাগ্যোন্নয়ন বাস্তবে অনেক কঠিন। কেবল উপজাতীয় মেধা পুঁজি ও পর্বতাঞ্চলীয় সম্পদ, এ কাজের জন্য যথেষ্ট নয়। ৫/৭ লাখ সংখ্যক উপজাতীয় লোকের যোগানকৃত পুঁজি ও রাজস্ব বিরাট কিছু হবে না। আভ্যন্তরীন প্রাকৃতিক সম্পদ ও দিন দিন লুটপাটের দ্বারা হ্রাস পাচ্ছে। বলতে গেলে প্রধান সম্পদ বন প্রায় উজাড় হবার পথে। অশ্রেণীভূক্ত বন বিরান হয়ে পড়ে আছে। সংরক্ষিত বন প্রায় অর্ধেকে এসে ঠেকেছে। বাকি আছে অনাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদ। তা ও বিপুল পরিমাণে পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই? অবাধ ব্যয় ও লুটপাট রাজ ভান্ডারে ও কুলায় না। পার্বত্য অঞ্চলকে তলাহীন ঝুড়িতে পরিণত করাই বাকি। তখন কি ভর্তুকিতে চলবে? কে যোগাবে ভর্তুকি এবং কেন যোগাবে?

একক উপজাতীয় মেধা, পুঁজি আর হ্রাস প্রাপ্ত পার্বত্য প্রাকৃতিক সম্পদ স্থানীয় উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। বহিরাঞ্চলীয় মেধা পুঁজি ও সম্পদ, পার্বত্য উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। আগে উপজাতি অধ্যুষিত অনাবাদী পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিলো উৎপাদন ও নগদ ঐশ্বর্যে অনুন্নত। কিছু ভোগ্য কাঁচা পণ্য চাহিদার চেয়েও কম উৎপাদিত হতো। আকালে বন্য আলু, মূলা, কচু, বাঁশ-করুল, ফলমূল লতা পাতায় অনেককে ক্ষুধা নিবারণ করতে হতো। মোটা কাপড় মোটা ভাত আর মানান সই একটি ঘরের নিশ্চিত সংস্থান অনেকের ছিলো না। এর প্রমাণ ঃ স্থানীয়দের হাতে কোন পুঁজি সংগঠিত না হওয়া, তাদের দ্বারা কোন শিল্প কারখানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পাকা আলিশান বাড়িঘর, শিক্ষা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কোথাও গড়ে না উঠা। যা হয়েছে তার সবই বাঙ্গালীদের দ্বারা গঠিত ও সরকারী অবদান। ক্ষেত কৃষিতে কারো কারো সচ্ছলতা ঘটলেও তজ্জন্য বাঙ্গালী শ্রমিক কৃষকদের অবদানই মূখ্য। জমি আবাদ ও চাষ করা ফসল উৎপাদন ও তা ভাড়ারে তোলা পর্যন্ত তারা সক্রিয় ছিলো। পাহাড়ীদের গুটি কতক মহাজন পুঁজিপতি একমাত্র লগ্নি ব্যবসাতে অভ্যস্ত ছিলেন। এখন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ও লগ্নি ঘটছে। বিপরীতে বাঙ্গালীদের উপস্থিতি হামেশাই গঠনমূলক। তারা স্থানীয় জমি ও খাইতে ভাগিদার হলেও নিরলস উৎপাদনমুখী শক্তি। আবাসন গড়ার ফলে এখন ব্যবসা সহ তারা নিজস্ব জমিতে তরি তরকারী ফলমূল ও ধান উৎপাদন কারীও বটে। স্থানীয়ভাবে তরমুজ তরি-তরকারী ও কলার বিপুল ফলন তাদের হাতেই ঘটেছে। এসব পাহাড়ীদের পক্ষে

শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত।

(তাং-মঙ্গলবার ২৬ পৌষ ১৪০৭ বাং/ ৯ জানুয়ারী ২০০১ খৃষ্টাব্দ / (দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি।)

জুম্ম জাতি অভিধা মানব জাতিগত নয়, পেশাগত পরিচিতি। এর ইমেজ আছে, তবে তা রাজনীতি প্রসুত। বিভিন্ন ভাষী বহু ক্ষুদ্র পার্বত্য জাতিসত্তা তাদের মূল জাতিগত ধারণার আড়ালে ঐক্যবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলেছে। ভিন্ন শক্তি ও সত্তার সাথে সাময়িক তাদের ঐক্য রচিত হলেও তা স্থায়ী একিভূত শক্তি ও সত্তাময় কিছু নয়। একদা মূল স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন দেখা দিবে। তবে অঞ্চলে অঞ্চলে যেমন হয়, তেমনি প্রতিবেশী জাতি গোষ্ঠি মিলে সংযুক্ত দেশ ও রাষ্ট্র এবং সংযুক্ত জাতি বা জাতিসজ্ঘ গঠন হলো বৃহৎ শক্তি ও সত্তা গঠনের উপায়। এর বিপরীতে ক্ষুদ্র জুম্মু স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হলো নিজেকে হীনবল করা।
বিভাজন বা বিয়োজন শক্তির সূত্র নয়। সংযোগ ও একিভূত হওয়ার ভিতরই শক্তিমত্তা নিহিত। নিকটে ঘনিষ্টে যোগ ও একাত্মতা বৃদ্ধি ছাড়া বৃহতে পরিণত হওয়া যায় না। এ ধারায় জুম্ম জাতি ও বাঙ্গালীদের ঐক্য নিয়ে ভাবতে হবে।

এতদাঞ্চলের বাঙ্গালী ও পাহাড়ীরা স্বতন্ত্র জাতিসত্তাভুক্ত লোক অবশ্যই। তবু তারা উভয়ই এই বাংলা মাটির সন্তান, অভিন্ন দেশবাসী, ঘনিষ্ট প্রতিবেশী, বহুক্ষেত্রে অভিন্ন রক্ত মাংস আর বংশ ধারার ও অংশীদার। ভিন্নতা আছে, তবে অধিকহারে অভিন্নতাও পাশাপাশি বিদ্যমান। এটাই শক্তি সঞ্চয়ের উপায়।

চট্টগ্রাম নাম শব্দটি দু'অঞ্চলের পক্ষে যেমন যোগসূত্র, তেমনি পাহাড় ও সমতলের সাগরমূখী একত্রিত ঢালূ অবস্থান হলো নিবিড়তার প্রাকৃতিক সূত্র। স্থানীয় চাট গেঁয়ে বাংলা ভাষাটি হলো, বিভিন্ন ভাষী স্থানীয় অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম। স্থানীয় বাঙ্গালী গঠনে আর্য দ্রাবিড় চরিত্রের চেয়ে মঙ্গোলীয় দ্রাবিড় চরিত্রই প্রধান। দ্রাবিড় চরিত্রের মলিন রং এবং মঙ্গোলীয় চরিত্রের চাপা গঠন ও হরিদাভা, বাঙ্গালী ও পাহাড়ীদের বৃহদাংশকে দৃশ্যতঃ দুই ভিন্ন শ্রেণীর মানুষে বিভক্ত করে রেখেছে। তবে এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমান্বয়ে অপসৃয়মান। তীক্ষ্ণ গঠন ও মালিন্য আজকাল পাহাড়ী সমাজে ও দ্রুত সংক্রমণশীল, এবং স্থানীয় বাঙ্গালীরা ও হরিৎ বোচা অবয়ব ধারণের দিকে অগ্রসরমান। এ হলো বৈবাহিক বা যৌন সংমিশ্রণ জাত ফল। আমরা যতই বিশুদ্ধ জাতীয়তার অহমিকা করি না কেন, তলে তলে পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় এক নতুন মহাজাতি গঠনের পথে এগুচ্ছি। ঘোড়া আর গাধার মিলনে জন্ম নেয় খচ্চর। কিন্তু খচ্চর ও ঘোড়ার মিলনে গাধা জন্মে না। এই সৃষ্টি রহস্য মানুষের মাঝেও ক্রিয়াশীল। আমাদের মাঝে আত্মীয়তা ও একাত্মতার সূত্র অনেকেই আছে। এই সূত্র ধরে পরস্পর হৃদ্যতা ও নৈকট্যে আবদ্ধ হতে পারি। আপন ভাবাটাই মধুর সম্পর্ক রচনার উপায়। পর ও শত্রু ভাবা থেকেই আপন জন শত্রু হয়। সহোদর ভাই বোন ও মাতা পিতাই মানুষের সর্বাধিক আপনজন। কিন্তু

স্বার্থ চিন্তা ও সুবিধা লাভের বাড়াবাড়ি এই সম্পর্কটাকে ও কলুষিত করে। সুতরাং সহিষ্ণুতা ত্যাগ ও একাত্মতা পরিহার অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বাংলাদেশ হলো একটি অপর্যাপ্ত আয়তন বিশিষ্ট রাষ্ট্র। এটি ঘনবসতিপূর্ণ তবে প্রাকৃতিক সম্পদে দরিদ্র। এর অধিবাসীরা সম্পদ সামর্থ্য আর যোগ্যতায় ও পিছিয়ে পড়া জাতি। এই জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় নিম্নমান, এদেশের সর্বত্র সবার প্রতি প্রযোজ্য। এর মাঝেও তারতম্য বিবেচ্য যেমন হাতের পাঁচ আঙ্গুল। এই স্বাভাবিক তারতম্যের গুণে এবং মেধাগত পার্থক্য হেতু, কেউ বা কোন অঞ্চল পিছিয়ে পড়া, আর কেউ বা কোন অঞ্চল অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নত। এটাকে বৈষম্য নয় ঈর্ষনীয় সূত্র জ্ঞানে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করাই উচিত। আগে আপন পর ভেদাভেদের অনুভূতি কাটাতে হবে। এবং ভাবতে হবে অগ্রবর্তীর সহযোগিতা পেতে হবে, তাকে পিছে টানা নয়। নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতা বাড়ানো দরকার। শত্রুতা ধ্বংস ডেকে আনে, এবং মৈত্রী শক্তি বাড়ায়। চিন্তার পরিসরকে দেশ ও জাতি ভিত্তিক প্রসারিত করা হলেই উদার চিন্তা চেতনার উদ্ভব হবে। শক্তি সামর্থ্য সম্পদ ও মেধাকে জাতীয় উন্নয়নে নিয়োজিত করা না গেলে, অঞ্চল ও গোষ্ঠিগত উপকার সাধিত হবে না। ক্ষুদ্রগন্ডিতে আবদ্ধ হলে ক্ষুদ্রই থাকতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এক দশমাংশ। এর বিপুল বিস্মৃতি ও বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যা স্বল্পতা উপজাতিদের পক্ষে উল্লাস ও গর্ব করার মত হলেও, এটি কেবল উপজাতীয় অঞ্চল, এ ভাবনাটি যথার্থ নয়। এটি জাতীয় সম্পত্তি , একা উপজাতীয় নয়। উপজাতীয়রা অনুপাতে জত(১,২)% মাত্র। তারা বাংলাদেশী জাতির এক ক্ষুদ্রাংশ, পৃথক কোন রাজনৈতিক জাতিসত্তা নয়, তেমনি এই পার্বত্য অঞ্চল চট্টগ্রামের আদি ভৌগোলিক এলাকা এবং বাংলাদেশের চিরকালীন অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। এই অখন্ডতার ভিত্তিতে বাঙ্গালী পাহাড়ী এক জাতি, এবং চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ একদেশ। এর ভিন্ন চিন্তা ও চেতনা হলো বিচ্ছিন্নতাবাদ। স্বাভাবিক ভাবেই তা সহজ মান্য নয়।

এই পর্বতাঞ্চল দখলকৃত, বা ভৌগোলিকভাবে অসংলগ্ন কোন দূরবর্তী অঞ্চল বা দ্বীপ রাজ্য নয়। সাম্প্রদায়িক জনসংখ্যার হিসাবে এখন পার্বত্য বাঙ্গালীরা প্রধান স্থানীয় সম্প্রদায়। তাদের এই অবস্থান কোন আন্দোলন হানাহানি বা ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। পাশাপাশি বাংলাদেশে বহু কোটি বাঙ্গালীর অবস্থান, যা পার্বত্য বাঙ্গালীদের শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবাঙ্গালী জাতিসত্তা সমূহের সাথে বাঙ্গালীদের জাতিগত নৈকট্যই উভয়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অপরিহার্য করে তুলেছে। জাতিগত বিদ্বেষ এখানে অবাঞ্ছিত। উপজাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা প্রয়োজনীয়। তবে তার সমাধান বিভেদ, হানাহানি ও বিচ্ছিন্নতা নয়। প্রতিবেশীদের মনে সদিচ্ছা সদ্ভাব ও সম্প্রীতির আবেদন সৃষ্টির মাধ্যমেই পৃথিবী ব্যাপ্ত সংখ্যালঘুরা টিকে আছে

এবং থাকবে। এটাই টিকে থাকার অহিংস উত্তম কৌশল। সংখ্যালঘুদের প্রতি সহানভূতিশীল বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালী, বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবি মহল, ক্ষুদ্র জাতি সত্তা সমূহের নির্মূল কখনো কামনা করেন না। তারা অনুকুল জনমত গঠনে সর্বদা সক্রিয়। এটা হলো সংখ্যালঘু উজাতিদের টিকে থাকার পুঁজি। হিংসার দ্বারা এই শক্তিকে বিরক্ত ও ব্যর্থ করে দেয়া বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়।
আত্মীয়তা, নৈকট্য , রক্তগত সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক অভিন্নতা, স্বাদেশিকতা ইত্যাদিকে সহমর্মিতা ও একাত্মতার সূত্র করে সমুদয় ভিন্নতা ও ভেদাভেদের বিপরীত স্রোত প্রবাহ করা সম্ভব। ধর্মীয় নৈতিকতাও এ কাজের সহায়ক। মানবতাকে গুরুত্ব দিলে, অন্যায় অনাচার দমন পীড়ন এবং পরশ্রীকাতরতার অবসান হতে বাধ্য।

দেশ ও জাতিকে অখণ্ড রেখে এবং সমুদয় শক্তি সামর্থ ও সম্পদকে পুঞ্জিভূত করে, দারিদ্র্য দুরীকরণ ও উন্নয়নে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। খন্ডিত শক্তি ও সামর্থ কোনক্রমেই সার্বিক উন্নয়ন সাধনের উপায় নয়।

গৃহযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হলে, তার বর্তমান শীর্ষ স্থানীয় মর্যাদা লাভ কখনো সম্ভব হতো না। ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর, তার বিভিন্ন ভাষী জাতি সত্তাদের একত্রিত করে রাষ্ট্র গঠনে ব্যর্থ হলে, তা এখনো অনুন্নত জেলে বন্দর হয়েই থাকতো।
বৃহৎ জনগোষ্ঠী বাঙ্গালীদের সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী ও উপজাতি সমূহ মিলে বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশী জাতি শক্তি গঠিত। আয়তনে বাংলাদেশ ছোট হলেও এর বহু কোটি সংখ্যক জনশক্তি এক বিশাল সম্পদ। এই জনশক্তিকে সক্রিয় ও উন্নত মেধায় পরিণত করা গেলে, উন্নত ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবী। তাই অত্যাবশ্যক হলো ঐক্য কর্মক্ষমতা ও মেধা উন্নয়নের রাজনীতি। মেধাই জন্ম দিবে সম্পদের এবং মেধাই বয়ে আনবে উন্নয়নের কৌশল। সর্বোপরি ঐক্যই গড়ে তুলবে শক্তি।
(তাং-বুধবার ২৭ পৌষ ১৪০৭ বাংলা/ ১০ জানুয়ারী ২০০১ খৃষ্টাব্দ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি।)

নৃতাত্ত্বিক বিচারে পাহাড় ও সমতলবাসী বৃহৎ চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীরা আদি মিশ্র ও বহিরাগত এই তিন ভাগে বিভক্ত। নিজেদের বিচারে ও চট্টগ্রামীরা হরাল্যা, পরাল্যা ও সন্দিপ্যা এই তিন শ্রেণী লোকের সমষ্টি। আদি চট্টগ্রামীরা বৃহদাংশে প্রাচীন দ্রাবিড় জনগোষ্টির বংশধর। তাদের মাথার খুলি গোল, নাক মুখাবয়ব সরু, রং ময়লা বা শ্যামল। চট্টগ্রামী হরাল্যা জনগোষ্ঠী এ দলের অন্তর্ভূক্ত।

মিশ্র জনগোষ্ঠিভূক্ত চট্টগ্রামীরা স্থানীয়ভাবে জেরবাদী নামে খ্যাত। পরাল্যারা বহিরাগত দলের অন্তর্ভুক্ত। চট্টগ্রাম শহরের এনায়েত বাজারের বস্তিতে এ জাতীয় কিছু লোকের বসবাস ছিলো, যাদের ভাষা আধা হিন্দী ও চট্টগ্রামী। কর্ণফুলী নদী মোহনার বাওটা লাকড়ি পাড়ায় এ জাতীয় লোকের অপর একটি আবাস ক্ষেত্র

আছে। তবে আজকাল তাদের সে ভাষা ঐতিহ্য বিলীয়মান। খাঁটি চট্টগ্রামী চরিত্রের ভিতর তাদের স্বকীয়তা প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে।

রোহিঙ্গ্যা খ্যাত জনগোষ্ঠী জেববাদীদের অন্তর্ভূক্ত। রোসাং বোয়াং ম্রোহং হলো উত্তর আরাকানের নাম। এই নাম সূত্রে ঐ অঞ্চলের অধিবাসী মাত্রই চট্টগ্রামী বিশেষণে রোয়াঙ্গ্যা বা রোহিঙ্গ্যা । আজকাল এ বিশেষণটি সীমাবদ্ধ হয়ে কেবল ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের বিপরীতেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আসল অর্থে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ঐ অঞ্চলের অধিবাসী মাত্রই রোহিঙ্গ্যা বা রোয়াঙ্গ্যা। চট্টগ্রামী বিশেষণে ঐ অঞ্চলের প্রবাসী বাঙ্গালী আর অস্থানীয়দের স্থানীয় স্ত্রী জাত বংশধররা হলো জেরবাদী বা পর প্রজন্মের লোক। এই রোহিঙ্গ্যা বা জেরবাদীরা সংখ্যায় প্রচুর এবং রক্তগতভাবে বিশেষতঃ চট্টগ্রামী বাঙ্গালী ও বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কিত। এই রক্তগত আত্মীয়তা ও একাত্মতার টানে, স্থানীয়ভাবে নির্যাতিত হয়ে আরাকানবাসী ঐ রোহিঙ্গ্যারা যুগে যুগে বাংলাদেশে আশ্রয় ও স্থানান্তর গ্রহণে অভ্যস্ত। স্থানীয় আরাকানী অভিবাসীদের বৃহদাংশ উপজাতীয় লোক ও বটে, যারা বর্ণিত জেরদাবী লোকদের রক্তগত ও দেশজাত সপক্ষ। এরা বৌদ্ধ ও ইসলাম এই উভয় ধর্ম সম্পর্কে পৃথক সমাজ হলেও রক্ত সম্পর্কে আত্মীয়। এই মিশ্র সামাজিকতার অপরাধেই এরা মৌলবাদী আরাকানী বা শুদ্ধাচারী মগদের দ্বারা নির্যাতিত ও বিতাড়িত হয়। রাজনৈতিক কারণে বৃটিশ আমলে বিতাড়িত আরাকানবাসী উপজাতিরা সংখ্যায় বিপুল। এই উভয় শ্রেণীর আরাকানীরা, এতদাঞ্চলে নিজেদের দৃঢ় অবস্থান গড়ে তুলেছে। বাঙ্গালী যোগ জেরবাদীদের মোকাবেলায় বৌদ্ধ রারাকানীরা সংখ্যালঘু হলেও নিজেদের আবাসস্থল পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যান্য উপজাতি সহ সম্মিলিতভাবে সংখ্যাগুরু। তাই আজকাল রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষেও উদ্বুদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে বাঙ্গালী যোগ জেরবাদী গোষ্ঠী, তাদের প্রতিপক্ষ। তবু উপজাতীয় রাজনৈতিক ঐক্য কোন জাতিগত মৌলিক একাত্মতা জাত কিছু নয়। এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী ভিত্তি বাঙ্গালী মুসলিম যোগ জেরবাদী-উপজাতি মধ্যকার রক্তগত সম্পর্কে নিহিত। এখন প্রয়োজন হলো ঐ একাত্মতাকে বিস্মৃতির আড়ালমুক্ত করে পুনরায় উজ্জীবিত করা।

চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা হলো চাকদের সাথে সম্পর্কিত। চাকমারা হলো মূলত ঃ আরাকানী সাক বা সেক জনগোষ্ঠী। ঐ সেক নামটি হলো শেখের আরাকানী বিকৃতি বা তরল উচ্চারণ। মনে হয় এরা আরবী ইরানী বণিক ও ধর্ম প্রচারকদের স্থানীয় আত্মীয় কুটুম ও বংশধরদের দ্বারা গঠিত একটি মিশ্র সমাজ। এই সূত্রেই সম্ভবতঃ চাকমা অভিজাত ও সর্দার বংশে, আরবী ফার্সি বর্ণ ভাষা নাম ও পদবির সংক্রমণ ঘটেছে। এই চাকমারা যে, এদেশে আরাকান ত্যাগী লোক, তার স্বীকৃতি তাদের বিভিন্ন লোকগীতি ও চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসেই নিহিত আছে।

বৃহত্তর চট্টগ্রামের পাহাড়ী বাঙ্গালী লোক ঐতিহ্য, এক মিশ্র সম্পর্ককে ভিত্তি করেই রচিত। ষোড়শ শতাব্দীর ম্রোহং বা রোসাং রাজ কবি আলাউল, স্বীয় পদ্মাবতী

কাব্যে, সে রাজ্য বাসী নাগরিকদের পরিচয় এভাবে দিয়েছেনঃ

নানাদেশী নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসন্ত নৃপ ছায়া তলে,
আরবী মিশরী শামী তুর্কী হাবশী রুমী
খোরাসানি উজবেকি সকলে,
লাহোরী মূলতানী সিন্ধী কাশ্মীরি দক্ষিনী হিন্দী
কামরুপী আর বঙ্গদেশী,
অহপাই খোটানচারী কর্ণালি মালয়া বারি,
আচিকুচি কর্নাটকবাসী,
বহু শেখ সৈয়দ জাদা মোগল পাঠান যোদ্ধা,
রাজপুত্র হিন্দু লামা জাতি
আভাই বার্মা শ্যাম ত্রিপুরা কুকির নাম,
কতেক কহিমু ভাতি ভাতি।

কবি আলউল ঐ ষোড়স শতকের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। তিনি নিজেও ছিলেন রোসাং রাজধানী প্রবাসী রাজ সভাসদ। সুতরাং এটা একটা অকাট্য দলিল যে, সে সময়ের রোসাং রাজ্য ভুক্ত চট্টগ্রামও ছিলো মিশ্র জন অধ্যুষিত অঞ্চল। রাজ অনুমতিতেই তখন মিশ্র বিবাহ বন্ধন প্রচলিত হয় এবং মিশ্র প্রজন্মের বংশধরেরা সামাজিক স্বীকৃতিও লাভ করেন। ঐ প্রাচীন লোক সমাজের বংশধরদের এ যুগে বিশুদ্ধ জাতি ঐতিহ্যের অহমিকা ও দেমাগ দেখানো যথার্থ নয়।

মেনে নেয়া যায় ঃ রোসাং রাজ্যভূক্ত অঞ্চলে যথেষ্ট সামাজিক উদারবতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিলো। মাতৃ পিতৃ ধর্মীয় বিশ্বাস পৃথকভাবে অনুসরণে কোন বাধা ছিলো না। একই গৃহে কেউ পালন করেছে পিতৃ ধর্ম ইসলাম, কেউ মাতৃধর্ম বৌদ্ধ। ইসলামী শরিয়ৎ আস্তিক্যবাদী বিভিন্ন ধর্মীয় লোকদের স্ব স্ব ধর্ম বিশ্বাস বজায় রেখে পরস্পরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অনুমতি দেয়। সেই অতীতে হয়তো বৌদ্ধদের আস্তিক্যবাদী জ্ঞান করা হতো। আসলেও তারা পৌত্তলিক নয়। মুর্তিকে উপলক্ষ করে মহামতি গৌতম বুদ্ধকে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মাত্র। বৌদ্ধ শ্রদ্ধা সূত্রটি নিজেই প্রমাণঃ তিনি, তার প্রবর্তিত ধর্ম, এবং শিষ্য সজ্ঞ একই সাথে ও একই ভাষ্যে বন্দিত হোন, যথাঃ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সজ্ঞং শরণং গচ্ছামি।
অথ্যাৎঃ আমি বুদ্ধের শরণে গমন করছি,
আমি ধর্মের শরণে গমন করছি,
আমি সজ্ঞের শরণে গমন করছি।

এই শপথ বাক্য অধর্মাচার ও শিরিক নয়। শিরিক হলো আল্লোহর বহুত্বে বিশ্বাস করা এবং ঈশ্বরের প্রতিভূ বহু দেবতার পূজা অর্চনায় নিবেদিত হওয়া। বৌদ্ধ ধর্মে এই বিধান নেই, এবং দেব দেবীসহ ঈশ্বরের পূজাও তাতে অনুপস্থিত। ইসলামের সাথে তার মাত্র একটি ক্ষেত্রে পার্থক্য আর তা হলো ইসলাম এক আল্লাহর বিশ্বাস ও তার আরাধনাকে নৈতিকতার পাশাপাশি পালনীয় করেছে। হয়তো আদি বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম ঈশ্বর বিশ্বাসী ও তার আরাধনা অনুসারী ছিলো, যা কালের বিষ্মৃতির গ্রাসে পতিত হয়েছে। নৈতিকতায় ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্ম এক ও অভিন্ন হওয়ায় ভাবা যায়ঃ ঐশ্বরিক ভিন্নমত সম্ভবতঃ কালের বিয়োজন প্রসূত। ইসলাম ইতিহাস সম্মত আধুনিক ধর্ম, তাই বিস্মৃতি বিয়োজন থেকে মুক্ত ও হুবহু রক্ষিত। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম প্রাগৈতিহাসিক। তাতে বিস্মৃতি বিয়োজন ও সংস্কার আরোপ সম্ভব।
যা-ই হোক নৈতিকতা ও রক্ত সম্পর্কের গুণে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের লোকেরা পরস্পরের নিকটজন যা বাংলাদেশ ও বাংলাদেশী মৌলিকতায় সমৃদ্ধ।
(তাং-বুধবার ৪ পৌষ ১৪০৭ বাংলা/ ১৭ জানুয়ারী ২০০১ খৃীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

আদিকাল থেকে বৃহত্তর চট্টগ্রাম পূর্বের পর্বতাঞ্চল ও উপকুলের দ্বীপাঞ্চল সহ একটি একক ও স্বতন্ত্র ভৌগোলিক এলাকা। ত্রিপুরা মিজোরাম ও আরাকানের সাথে মিলে এটি কখনো অভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল নয়। এই ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা, বর্তমানেও বিদ্যমান। সাথে সাথে এটি বাংলা অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত ভূখন্ড। এটি পার্শবর্তী ত্রিপুরা, মিজোরাম ও আরাকান থেকে স্বতন্ত্র ভৌগোলিক পরিচিতি ধারণ করে দীর্ঘ অতীত থেকে নিজস্ব পৃথক অবস্থান বজায় রেখেছে, কখনো একিভূত ও মিশ্র ভৌগোলিক রূপ ধারণ করেনি। এর পার্শ্ববর্তী উপসাগরটি বাংলার উপকূলবর্তী সাগর বলে বঙ্গোপসাগর, যা আন্তর্জাতিকভাবে 'বে অফ বেঙ্গলম্ব নামে আখ্যায়িত। এটিও ঘোষণা করছে নাফ নদী সীমা তথা দক্ষিণ পূর্বের আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত চট্টগ্রাম ভূভাগ, বাংলাদেশেরই ভৌগোলিক এলাকা।

তিব্বতী ও দক্ষিণ পূর্ব এশীয় ভাষাভাষী এলাকা বাংলা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তে এসে শেষ হয়েছে। ঐ দুই ভাষাভাষী লোক এতদাঞ্চলে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু। বাংলা ও তার উপভাষাই এতদাঞ্চলীয় প্রধান ভাষা। এই ভাষা ঐতিহ্যের অনুসারী বাঙ্গালী চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের লোকেরাই এখানকার সংখ্যাগুরু জনসমষ্টি। তাই সঙ্গতভাবেই এতদাঞ্চল বাংলা অঞ্চল। বাংলা ভাষা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক লোকদেরই বাসস্থান বাংলাদেশ। অতীতে এতদাঞ্চল ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীভূক্ত ত্রিপুরী ও আরাকানীদের দ্বারা দখলিভুত হয়ে শাসিত হলেও তার ভৌগোলিক বাংলা পরিচিতি অক্ষুণ্নই ছিলো। আরাকানের রাজা সুলত ইঙ্গচন্দ্র ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চল দখল করে, কুমিরা এলাকার কাউনিয়াছড়া নামক স্তানে বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করে তাতে 'চিৎ-তৌৎ-গোং' অর্থাৎ চিটাগাং নাম উৎকীর্ণ করে, এতদঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি

দিয়েছিলেন। এটি হলো চিটাগাং নামের মৌলিকতার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর। চট্টগ্রাম, চাটিগাঁ, চাটগাম ইত্যাদি নামগুলো পরবর্তীকালে আরোপিত।

চিটাগাং নামটি খাটি দেশী ও সর্বাধিক প্রাচীন। এটি ইউরোপীয় বণিকদের আরোপিত বলে প্রচারিত ধারণা সঠিক নয়। বাংলায় গুড়ের তরল বর্জ্যকে বলে চিটা এবং নদীকে বলে গাং। হয়তো অতীতে কর্ণফুলী ইত্যাদি নদী তীরবর্তী অঞ্চলে গুড় শিল্পের ব্যাপকতা ছিলো, যার বর্জ্য চিটা নদীতে ফেলে দেয়া হতো, এবং তা-ইগোটা অঞ্চলের পরিচিতির সূত্র হয়ে দাঁড়ায়। পরে নদীটি ভিন্ন নাম ধারণ করে হয় কর্ণফুলী ।

এটাও সম্ভব যে, এ নামটি সীতাগাং এর অপভ্রংশ। সীতা পাহাড় ও সীতাকুন্ড নামের প্রচলন এতদাঞ্চলে থাকায় সীতা পাহাড় ভেদকারী কর্ণফুলী নদীটি এককালে সীতাগাং নামে অভিহিত হয়ে থাকতেও পারে। ঐ নামেরই দ্বিতীয় বিবর্তিত রূপ চিটাগাং হওয়া সম্ভব।

এই অঞ্চলের প্রধান নদী ও পাহাড়গুলো এবং আভ্যন্তরীন প্রধান অঞ্চলসমূহ প্রধানতঃ বাংলা নামে পরিচিত। এটা আরেক প্রধান প্রমাণ সূত্র যে, এই চট্টগ্রাম নামীয় ভৌগোলিক অঞ্চলটি, কখনো বিজাতীয় বিভূই ছিলো না।

ছোট ছোট ছড়া নদী পাহাড় ও পাড়া পরিবেশের কিছু কিছু এলাকা বিজাতীয় নামে অভিহিত, যথাঃ মাচালং নদী, রাইংক্ষ্যং নদী কেওক্রাডাং পাহাড়, রোসাংগিরি ইত্যাদি। সম্ভবত এগুলো বিজাতীয় আধিপত্য ও দখল দারিত্বের স্মারক, আদি দেশীয় নাম নয়।
বলা হয়ে থাকেঃ কর্ণফুলী নদীর নাম ছিলো কাঞ্চাক্ষ্যং বা কাঞ্চা খাল। কিন্তু এটা ভুল। কাঁচালং নদীরই ভাষান্তরিত নাম কাঞ্চাক্ষ্যং। আরাকানী ভাষায় নদীকে বলে ক্ষ্যং এবং কুকি ভাষায় বলে লং। কাঁচা ও কাঞ্চা হলো একই শব্দের ভিন্ন প্রকাশ। কর্ণফুলী নামটি বিজাতীয় বা অর্বাচীন নয়।
সাইচল বা শাহীচল হলো মিজোরাম সীমান্তে অবস্থিত একটি দীর্ঘ ও প্রধান পাহাড় এবং আলীকদম হলো আরাকান সীমান্তবর্তী একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র। শঙ্খ ও মাতামুহুরী নদী দক্ষিণ পূর্বের সীমান্ত পাহাড় থেকে উৎসারিত এবং নাফ নদী হলো তাই, যা বাংলা বার্মা সীমান্তরেখা। স্থানীয় পরিচিতির এই প্রাকৃতিক সূত্রগুলোর একটিও বিজাতীয় ভাষা সম্বলিত নয়। এগুলো বাংলা চরিত্রের মৌলিকতা সমৃদ্ধ আদি নাম। সুতরাং বাংলার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংশ্লিষ্টতা অপ্রাচীন বা কৃত্রিম নয়। এই সম্পর্ক নাড়ির বন্ধনের মত শক্ত আর অবিচ্ছেদ্য।

পার্বত্য অঞ্চল সহ চট্টগ্রাম হলো বাংলার আদি ভৌগোলিক এলাকা।,এর সীমান্তবর্তী কোন কর্তৃপক্ষ কপাদিও এর কোন ক্ষুদ্রাংশ পর্যন্ত নিজের বলে দাবী করেননি। কোন সীমান্তবর্তী আদিবাসী কোনকালে ও এ দাবী করেননি যে, এটা বা এর কোন ক্ষুদ্রাংশ

তাদের আদি বাসস্থান। সুতরাং এতদাঞ্চল বা তার কোন ক্ষুদ্রাংশ ভিন্ন দেশ রাষ্ট্র বা জাতি কর্তৃক দাবীকৃত বিতর্কিত অঞ্চল নয়। এটি দাবী দাওয়া ও বিতর্ক মুক্ত খাটি চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ অঞ্চল। এ হিসাবে এটি বাঙ্গালীর স্বদেশ ভূমি এবং বাংলাদেশী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমূহেরও বাসস্থান।

স্থানীয় সংখ্যালঘু জাতিসত্তা সমূহ জন্ম ও হালের বসবাস সূত্রে বাংলাদেশী। বাঙ্গালীরা তাদের স্বদেশী ভ্রাতৃ সম্প্রদায়। চট্টগ্রাম যেমন জাতীয় বন্দর, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন বিশেষ জাতিসত্তাভুক্ত লোকের একক বাসস্থান ও সম্পত্তি নয়। এ নিয়ে কারো আঞ্চলিকতা ও আঞ্চলিক অধিকারের ধারণা করা অগ্রহণীয়।

ভৌগোলিক বাস্তবতাকে মেনে চলা ছাড়া উপায় নেই। এ কারণে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম দীর্ঘদিন আরাকানী দখলাধীন থাকলেও, তা সে দেশের অংশে পরিণত হয়নি। ১৬৬৬ খ্রীঃ সালে আরাকানী দখল মোগলদের হাতে উৎখাত হওয়ার পর, এখানে তার পুন প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়নি। স্বদেশ না হওয়ার কারণে এখানকার আরাকানী বংশোদ্ভুত লোকজনকেও সংখ্যালঘুর ভাগ্য বরণ করে নিতে হয়েছে। একইভাবে এতদাঞ্চল থেকে ত্রিপুরার দখলদারিত্ব আর ত্রিপুরী জাতিগোষ্ঠীর আধিপত্যের অবসান ও ঘটেছে। এই দুই অঞ্চলের সাথে ভৌগোলিক একাত্মতা ও সংশ্লিষ্টতা না থাকা এবং তথাকার জনসাধারণের পক্ষে এতদাঞ্চল স্বদেশ ভূমি না হাওয়ার কারণেই ভিন্নতা সূচিত হয়েছে। পূর্ব সীমান্তের মুক্তাঞ্চলবাসী কুকি ও অন্যান্য উপজাতীয়রা এতদাঞ্চলে অধিপত্য কায়েমে চেষ্টিত হলেও ভৌগোলিক ও বসবাস জনিত প্রতিকূলতা তাদেরকে সফল হতে দেয়নি। ঠিক এই প্রতিকূলতাই দ্বীপাঞ্চল থেকে হার্মাদও মগদের উৎখাতে সহায়ক হয়েছে।

হার্মাদখ্যাত পর্তূগীজরা, সন্দিপ হাতিয়াসহ উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছিলো। তাদের কেউ কেউ মুসলিম নাম ধারণ, বাঙ্গালী স্ত্রী গ্রহণ ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করেও পৃথক স্বাধীন দ্বীপ রাজ্য সন্দিপকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়নি। আরাকানী জলদস্যুরা পুর্তূগীজদের সহায়তায় দ্বীপাঞ্চলে ঘাটি ও উপকূলের অংশবিশেষে আধিপত্য স্থাপন করেও টিকে থাকতে পারে নি।

দ্বীপাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে পর্তূগীজ ও মগরা ব্যাপকভাবে বংশ বিস্তার করেছে। তাদের কাছে স্থানীয় বাঙ্গালীরা ছিলো অসহায়ও জিম্মি। কিন্তু তাতেও মিশ্র প্রজন্মের ঐ লোকেরা মগ বা পূর্তুগীজে পরিণত হয়নি। বাংলার মাটি ও মাতৃ পরিচয়কে ধারণ করে, তারা হয়েছে বাঙ্গালী। মাটিকেও তারা বাংলা করে রেখেছে। চট্রামের মাদাম বিবির হাট, ইউরোপীয় রং ও গঠনের স্থানীয় ও দ্বীপাঞ্চলবাসী লোকেরা, এবং বোচা কালো অবয়বের অসংখ্য চট্টগ্রামী লোক, সেই মিশ্র রক্ত সম্পর্কেরই সাক্ষী।

এতদাঞ্চলীয় ভুগোল ও প্রকৃতি, বাংলা ভাষাভাষীদের অনুকুল। এর বিরোধিতা অবাস্তব।

(তাং-বৃহস্পতিবার ৫ মাঘ ১৪০৭ বাংলা/ ১৮ জানুয়ারী ২০০১ খ্রী/ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি।)

আরাকানের রাজা নর মিখলা, ১৪০৬ খৃষ্টাব্দ সালে স্বরাজ্য থেকে উৎখাত হয়ে প্রতিবেশী রাজ্য বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের আশ্রয় গ্রহণ করে ছিলেন। তখন সুলতানী রাজ্য বাংলার সীমান্ত আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো একথা নিঃসন্দেহে ভাবা যায়।

এই সূত্রে উল্লেখ্য যে, বাংলার মুসলিম সুলাতানাতের ইতিহাসে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজিকে প্রথম মুসলিম সুলতানের মর্যাদা দেয়া হয়, যিনি মাত্র ১৭ জন যোদ্ধাসহ হিন্দু রাজা লক্ষণসেনকে অতর্কিতে আক্রমণ ও বিতাড়িত করে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলায় মুসলিম সুরতানাতের সূচনা ঘটান। কিন্তু তার অন্তত তিনশত বছর আগে চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি মুসলিম সুলতানাত স্থাপিত হয়ে গিয়েছিলো, যার উল্লেখ একমাত্র আরকানের ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ আছে।

আরাকান রাজ সুলত ইঙ্গ চন্দ্র জনৈক সুলতানকে বিতাড়ন করে ৯৫৩ খৃষ্টাব্দ সালে, চট্টগ্রামমুখী অভিযান পরিচালনা করেন, এবং তার বিজিত চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুমিরার নিকটবর্তী কাউনিয়াছড়া এলাকায় একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করে তাতে চিৎ-তৌৎ-গোং শব্দটি উৎকীর্ণ করেন। আমার ধারণাঃ বর্ণিত সুরতান শব্দটি আরবী সুলতান পদবিরই মঘী বিকৃতি, যার অর্থ রাজা এবং চিৎ-তৌৎ- গোং হলো চট্টগ্রাম নামের মঘী প্রকাশ।

আরাকানী ইতিহাসে উল্লেখিত দ্বিতীয় ঘটনা হলোঃ ঐ একই দশম শতাব্দীকালে একটি আরবী বণিক নৌ বহর আরাকান উপকূলে ঝড়ে বিধ্বস্ত হয় এবং ঐ দলের অনেক লোক উপকূল অঞ্চলে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে রাজ দরবারে নীত হোন। ঐ দুর্গতরা রাজ সহানুভূতিতে সে দেশে আশ্রয় ও পূনর্বাসন লাভ করেন।

এই ঘটনাগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, চট্টগ্রাম ও আরাকানে মুসলিম বসবাস ও সভ্যতার সূচনাকাল, অবশিষ্ট বাংলা অঞ্চলের চেয়ে কয়েকশ বছর প্রাচীন। ঐ বিস্মৃত বা অজানা ইতিহাস উদ্ধারে গভীর গবেষণার প্রয়োজন আছে। দক্ষিণের আলীকদম অঞ্চলের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে সে কালের নিদর্শনাদি পাওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি। দক্ষিণ চট্টগ্রামে প্রাচীন আরবী ইরানী বংশধরদের থাকাও সম্ভব এবং তাদের সুত্রে লিখিত প্রাচীন বিবরণাদি থাকাও অসম্ভব নয়।

রাজা নর মিখলার আশ্রয় গ্রহণের শত শত বছর আগেও যে এই অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীন ছিলো, তার বিচ্ছিন্ন বিবরণ এভাবে আরাকানী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। তবে ঐ শাসনকাল অবিচ্ছিন্ন ছিলো না। মাঝে মধ্যে ত্রিপুরী ও আরাকানী দখল ও শাসনে বিঘ্নিত হয়েছে। সম্ভবত: ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ সালে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

পূর্ব পর্যন্ত ত্রিপুরী, আরাকানী ও স্থানীয় সুলতানী দখল ও শাসনের আবর্তন বিবর্তন ঘটেছে।

প্রাচীন স্থানীয় সুলতানী শাসন কোথায় কতদিন টিকেছিলো তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সে ইতিহাস এখনো গবেষণা সাপেক্ষ। তবে এখানে বাংলার সুলতানী শাসনের মান্য প্রথম সুচনাকাল হলো ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দ সাল, যেটি সুলতান ফখরোদ্দিন মোবারক শাহের আমল। রাজা নর মিখলার আশ্রয় গ্রহণ পর্যন্ত, এই সুলতানী শাসন অবিচ্ছিন্ন ও সার্বিক ছিলো কি না তা নিশ্চিত করে বলার মত ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ নেই। তবে একথা বলা সম্ভব যে, এতদাঞ্চলে মুসলিম বসবাস ও সামন্ত আধিপত্য অবশ্যই কায়েম ছিলো। উপস্থিত রাজকীয় বা সুলতানী আধিপত্য ত্রিপুরী ও আরাকানী দখলের পর আনুগত্যের মাধ্যমে টিকে থাকার কৌশল গৃহীত হতো বলেই, মনে হয়। এতদাঞ্চলের মুসলিম শাসনাধীন হওয়ার রহস্য এখানেই নিহিত বলে অনুমান করা যায়। আরাকানের ইতিহাসও এ দাবীর পুষ্টি যোগায়। সে রাজ্যের মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্য, আমলা সভাসদ ইত্যাদি পদে বাঙ্গালী ও মুসলমানরা অবাধে বরিত হয়েছেন। ইতোপূর্বে বর্ণিত কবি আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের উদৃতি মূলে ও তা প্রমাণিত হয়। উত্তর আরাকান থেকে বাংলামূখী জনপদগুলোর মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ার এটাই রহস্য।

রাজা নর মিখলা, দীর্ঘ ২৬ বছর বাংলায় আশ্রিয় থাকার পর ১৪৩২ খৃষ্টাব্দ সালে সুলতান জালালউদ্দিনের সহায়তায় স্বরাজ্য আরাকান পুনরদখল করেন। সে থেকে শুরু হয় আরাকানে মুসলিম সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সম্পৃক্ততার এক দীর্ঘ অধ্যায়। আরাকানে ও বাংলায় সে থেকে পারস্পরিকভাবে রাষ্ট্রীয় সৌহার্দ্য সহযোগিতা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের পারস্পরিক সামাজিক সম্পৃক্ততা ও সংমিশ্রণ ব্যাপক আকার ধারণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ উপজাতীয় লোক সেই আরাকানী মূল থেকে উদ্ভুত ও হালে বিচ্ছিন্ন বলে তারা সেই অতীত সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও একাত্মতার অংশীদার। বাংলা ভাষা চর্চা, বাঙ্গালী পোষাক ও আচার অভ্যাসের সম্পৃক্ততা, নাম পদবীতে মুসলিম ও বাঙ্গালী অনুকরণ, আরবী বর্ণমালার ব্যবহার, মুসলিম সামাজিক ঘরুয়া ভাষার অভ্যাস, মুসলিম আভিজাত্য ভিত্তিক আড়ম্বর প্রীতি ইত্যাদি মোটেও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এ হলো গভীর ও দীর্ঘ সম্পৃক্ততার নিদর্শনরূপী স্থানীয় পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের মিশ্র সভ্যতা। ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এই স্থানীয় সভ্যতা বৃহৎ বাংলার সাথে কিছুটা অসঙ্গতিশীল অবশ্যই। তবে এটিকে বাংলা সভ্যতার বৈচিত্র রূপে গণ্য করাই যথার্থ। এটি দীর্ঘ সহাবস্থানের বাস্তব সত্যরূপ।

স্থানীয় ইতিহাসের টুকরো উপাদানগুলোর আরেকটি হলো ঃ পর্তুগীজ গন্ডিত জোয়াও দে বারোজের ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ সালে অঙ্কিত, বাংলা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের একটি প্রাচীন মানচিত্র। তাতে দক্ষিণ চট্টগ্রামে কোদা ভোস কাম বা খোদা বখশ

খান শাসিত অঞ্চল আলীকদম প্রদর্শিত হয়েছে। এই সর্ব প্রথম ঐতিহাসিক তথ্যে চাকমা অধ্যুষিত একটি অঞ্চল ও চিহ্নিত হয়েছে, যার অবস্থান ক্ষেত্র হলো আলীকদমের পূর্ব উত্তর, ত্রিপুরার দক্ষিণ পূর্ব, আর আরাকানের উত্তর পূর্বাংশ, যেখানে ব্রেমা লিমা বা বার্মা নামক দেশ অবস্থিত। দেখা যায় ঐ চাকোমা নামে উল্লেখিত অঞ্চলটির পশ্চিমাংশ থেকে দুটি উপনদী উৎপন্ন হয়ে বাস্তবে উত্তর পশ্চিম মুখী বৃত্তে ঘুরে কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের মানচিত্র অধ্যয়নে, অবগত হওয়া যায় যে, সে নদী দুটি রাইংক্ষ্যং ও সুভলং বাংলাদেশ মিজোরাম ও আরাকান সীমান্তের ত্রিভুজ বর্তী পর্বতাঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর পশ্চিম মুখে বৃত্তাকারে ঘুরে কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে।

চাকমা লোক কাহিনীতে উল্লেখিত আছে ঃ উত্তর আরাকানে এককালে মইসা গিরি নামক একটি চাকমা রাজ্য ছিলো। চাকমা রাজপরিবারের ইতিহাসে প্রয়াত চাকমা রাজা শ্রদ্ধেয় ভুবন মোহন রায় উল্লেখ করেছেন, এককালে বার্মায় একটি চাকমা রাজ্য ছিলো। বার্মার থেক বা সেক সম্প্রদায় হলো চাকমাদের জ্ঞাতি। আরাকানীরা বাংলাভাষীদের বলে কালা। এই অর্থে উত্তর আরাকানের কালাদন নদী উপত্যকা হলো বাংলা ভাষী এলাকা। তার উত্তরে অদুরে ঠেকা বা থেকা নদীর উৎস অঞ্চল। বলা যায়, এই নামটিও থেক থেকে গৃহীত বিশেষণ। সুতরাং থেকদের জ্ঞাতি বাংলা ভাষী চাকমাদের ইতিপূর্বেকার বাসস্থান, ঠেকা নদী ও কালাদন নদীর উৎস অঞ্চলটি আরাকান ও বার্মাভূক্ত চীন পাহাড়ের এলাকা বলে চিহ্নিত করা যায়। জোয়াওদে বারোজের মানচিত্রটিও তার সমর্থক।

এখন প্রশ্ন হলো ঃ চাকমারা বার্মা ও আরাকানবাসী হলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অনুসারী হয় কী করে? এর উত্তর সম্ভবতঃ এটাই যে, চাকমারা মূলত প্রাচীন ভারতীয় লোকোদ্ভুত জনগোষ্ঠী। প্রাচীনকালে দক্ষিণ পর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ ও সভ্যতার বিস্তারকালে তারা ও স্থানান্তর গ্রহণ করে থাকবে। তারা প্রাচীন ভারতীয় হলেও বাংলার কাছাকাছি অঞ্চলেরই লোক হওয়া সম্ভব। এই সূত্রেই তারা বাংলা উপ ভাষা ও সংস্কৃতির অনুসারী।

(তাং-১১ মাঘ বুধবার ১৪০৭ বাং/ ২৪ জানুয়ারী ২০০১ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি।)
ইতিহাসই প্রমাণ ঃ বাঙ্গালীরা চিরকাল সংখ্যালঘু উপজাতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল। খোদ উপজাতিরাও এই সহানুভূতির প্রতি আস্থাশীল বলে তারা দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের ওপারে বার বার উৎপীড়িত হয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছে এ পারে।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে আরাকানের রাজা নর মিখলা; নিজ অনুসারীদের সহ স্বরাজ্য থেকে উৎখাত হয়ে প্রতিবেশী অন্য কোথাও না গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাংলায়,

এবং বাংলারই সহায়তায় স্বরাজ্যে পূনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বাঙ্গালী জনশক্তি তাকে রাজ্য শাসন ও প্রতিরক্ষায় মদদ যুগিয়েছিলো। ঐ ম্রাকু রাজবংশের ৩৫২ বছর ব্যাপ্ত রাজত্বের আমলটি ছিলো বাঙ্গালী আরাকানী সৌভ্রাতৃত্বে সমৃদ্ধ। ঐ সময়কালে পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের উৎপাতে উপকুলবর্তী বাঙ্গালীরা চরমভাবে নিগৃহীত হলেও, আরাকানী বাঙ্গালী পরস্পরের মাঝে কোন জাতি বিদ্বেষের জন্ম হয়নি। বিশেষতঃ উপদ্রুত বাঙ্গালীরা জাতিগতভাবে ধৈর্যের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছে। ১৭৮৪/৮৫ খৃষ্টাব্দ সালে বার্মার আভারাজ্য কর্তৃক আরাকান দখলিভূত হলে, সে দেশ থেকে বাংলার দিকে উদ্বাস্তুদের ঢল নামে। ইতিপূর্বেও আভ্যন্তরীন গোলযোগ হেতু, বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা স্বদেশ ত্যাগ করে নাফ সীমান্তের এপারে পাহাড়াঞ্চলে এসে ভীড় জমিয়েছে। এখনকার পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতিদের প্রায় সবাই ঐ উদ্বাস্তু অভিবাসী আরাকানীদের বংশধর। একমাত্র ত্রিপুরা ও কুকি জনগোষ্ঠী বাদে অন্য সবাই, দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত পারের লোক। ঐ উপদ্রুত লোকেরা ছিলো, এপারে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তাদের আশ্রয় ও বসবাসে এদেশে কোনরূপ অসন্তোষ বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অবতারণা হয়নি। এই অনুকূল পরিস্থিতির কারণে সরকারকেও শরণার্থীদের এ দেশে স্থায়ী অভিবাসন দানে বিব্রত হতে হয়নি।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ সালে নাফ তীরে অবস্থিত শেষ আরাকানী অবস্থানটিও মোঘলদের দখলাধীন হলে, শেষ আরাকানী শাসক কংহ্রা প্রু স্বদেশে পাড়ি দেন। কিন্তু স্বদেশে তিরস্কারে অতিষ্ঠ হয়ে পুনরায় ১৭৭৪ সালে তিনি কিছু অনুসারী সহ রামুর ঈদ ঘরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন এদেশে বৃটিশ শাসন আমল শুরু হয়ে গেছে। এই দুই ঘটনার তিক্ততায় প্রবাসী আরাকানীদের অনেকে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও উচ্চাভিলাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশ উদ্ধারে সামরিক তৎপরতা ও শুরু করেন। তখন আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে শরণার্থী আগমন আরো বৃদ্ধি পায়, এবং তাতে দু'অঞ্চলের সরকার দুটিও তিক্ততার ভিতর পতিত হোন। নাফ সীমান্ত অঞ্চল লাখ লাখ উদ্বাস্তু আরাকানীদের দ্বারা ভরে যায়। এই তিক্ততা ও উদ্বাস্তু সমস্যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো ঃ প্রথম বৃটিশ বার্মা যুদ্ধ। তাতে ১৮২৪ সালে আরাকান বৃটিশের দখলিভূক্ত হয় এবং তা অন্যতম প্রদেশরূপে বৃটিশ ভারতের সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু তাতেও আরাকানী উদ্বাস্তুদের এক বিরাট অংশ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেনি। বরং তারা মাং বোমাং ও চাকমা এই তিন সর্দারের অধীনে এদেশে অভিবাসন গ্রহণ করে। সর্দারী সংগঠন থেকে মুক্ত অন্য উদ্বাস্তুরা ও বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করতে থাকে, যাদের অনেকে পটুয়াখালী উঞ্চলেও পাড়ি জমায়। সে কালের মগ ও এখনকার মারমা নাম ধেয় জনগোষ্ঠী বৃহদাংশে, মাং ও বোমাং এই দুই সর্দারের অনুগত হলেও, সর্দারী মুক্ত আরাকানীরা হলো খিয়াং, খুমি, রাখাইন সেন্দু, চাক ও মুরুং। এরা সর্দারমুক্ত স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু। এরাও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করে এদেশে থেকে যায়। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের বিষয়টি একটু বিতর্কিত। তারা মূল

ভারতীয় জনগোষ্ঠীভূক্ত লোক বলে তাদের ভাষা ও লোক সংস্কৃতি প্রায় এদেশীয়। তবে তারা ইতোপূর্বে দীর্ঘকাল আরাকানবাসী ছিলো এবং ওখান থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলা অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাদের একাংশ আদি চাকমা রাজা শেরমস্ত খার অধীনে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ সালে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ায় এসে আস্তানা পাতে। ১৭৮৪ সালে আরো কিছু চাকমা আভা আক্রমণে বিতাড়িত আরাকারীদের সহযাত্রী হয়ে দক্ষিণাঞ্চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। চাকমা লোক কাহিনী সূত্রে জানা যায় ঃ মগদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু চাকমা সম্ভবত ঃ সুলতানী আমলে আরাকানের মইসা গিরি অঞ্চল ত্যাগ করে, দক্ষিণ চট্টগ্রামের আলীকদম ভুক্ত তৈনছড়ি এলাকায় এসে নতুন বাসস্থান গড়ে। তবে বিষ্ময়কর হলো ঃ বৃটিশ আমল পর্যন্ত সে কালের রেকর্ডভুক্ত চাক্মা রাজারা মুসলিম নাম খেতাব ও ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন। চাকমা সমাজটিও ভাষা নাম খেতাব ও আচার অভ্যাসে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলিমদের সাথে এ যাবৎ প্রায় একাত্ম। এই বসবাস ও একাত্মায় তারা এদেশীয় লোব কলে ভ্রম সৃষ্টি করে।

তাই এই বহিরাগত উপজাতিদের এদেশকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করাকে বাঙ্গালীরা কখনো আপত্তিজনক মনে করেনি, এবং বিজাতি রূপে এদের প্রতি বিদ্বেষ ঘৃণা বা অবজ্ঞাও দেখায়নি। তবে দুঃখজনক ঘটনা হলো ঃ বাঙ্গালীরা ঐ বাহিরাগত বংশধরদের দ্বারা অধুনা ঘৃণা বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার শিকার। এতেও বাঙ্গালীরা সংক্ষুব্ধ ও প্রতিহিংসা পরায়ন নয়। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই অবাঙ্গালী সংখ্যালঘুদের নিজেদের কল্যাণেই সাম্প্রদায়িক মৈত্রী সৌহার্দ্য ও সহনশীলতায় ব্রতী হওয়া জরুরী ছিলো। বাঙ্গালীদের বর্ণিত ঐতিহাসিক উদারতা হতো এ কাজের সহায়ক।

এ ভাবা সঠিক যে, একমাত্র বৃটিশ শক্তির সহায়তাই উপজাতিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে আধিপত্য বিস্তারে মদদ যুগিয়েছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালীরা ছিলো শান্তিপ্রিয় অনুগত প্রজা। বৃটিশ শাসন প্রশাসনে তাদের প্রকট কোন বিরোধীতা ছিলো না। ঐ বৃটিশ প্রদত্ত অভিবাসন ব্যবস্থাটি অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানে বাঙ্গালীরা ছিলো সম্পুর্ণ অসম্পৃক্ত। তাই এতদাঞ্চলে উজাতিদের বসবাস ও আধিপত্য বিস্তারে বাঙ্গালীদের সমর্থন বা অনুমোদন কোনটাই ব্যক্ত হয়নি। এ কথা বিবেচ্য যে, যাদের না ছিলো ভূম্যাধিকার, না ছিলো প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গতি। রাজা ও কর্তা ব্যক্তিদের সেবায় যাদের বেগার খাটতে হতো। ভূমি মালিকানাহীন জুম চাষের প্রতিদান রূপে তাদের কর দিতে হতো, যে কর ভাগ করে ভোগ করতেন রাজা মাতবর ও সরকার। তদ্বারা জনকল্যাণে কোন উন্নয়ন সাধিত হতো না। সড়ক, শিক্ষায়তন, মন্দির, হাসপাতাল ইত্যাদি একটি প্রতিষ্ঠান ও কোন রাজা ও মাতবরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। করের ক্ষুদ্রাংশের মালিক সরকার প্রতিদান রূপে যা দিতো তাও ছিলো অতি নগণ্য। রাজা আর কর্তা বাবুদের পিঠে বয়ে খাল আর পাহাড় পার করতে হতো। গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশু পালন, পোষণ আর চরাতে ও প্রজাদের সরকারী বন পাহাড় ও মাঠ ব্যবহারের বিপরীতে চরানী কর দিতে হতো। এসব ছিলো

অধিকারহীনতা অধীনতা ও মানবিক তাচ্ছিল্যের জঘন্য নিদর্শন। এখন দেশ স্বাধীন। পুরাতন শাসন প্রশাসন আইন ও বিধি ব্যবস্থার অবসান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম পরাধীন আমলের আইনাধীনই থেকে গেছে। যতদিন রাজ প্রথা, মাতবরী ব্যবস্থা ও হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের শাসন অব্যাহত থাকবে, ততদিন এতদাঞ্চল পরাধীন হয়েই থাকবে। স্বাধীন সাংবিধানিক শাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই অর্থে প্রয়োজন। প্রচলিত স্থানীয় আইন হলো ঔপনিবেসিক মাথাভারী ব্যবস্থা। তার সাতে যুক্ত হয়েছে নতুনভাবে জারিকৃত আরো কিছু কালো আইন। এগুলো স্বাধীনতা ও সংবিধান সম্মত নয়।

(তাং-বৃহস্পতিবার ১২ মাঘ ১৪০৭/২৫ জানুয়ারী ২০০১ খ্রীঃ/ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি।)
অধিকাংশ উপজাতীর ভাষা লেবাস, সংস্কার সংস্কৃতি হলো অভারতীয়, বিশেষতঃ বর্মী আরাকানী ও তিব্বতী। এগুলো তাদের বহির ভারতীয় হওয়ার মৌলিক উপকরণ। তবে চাকমা জনগোষ্ঠী হলো একমাত্র ব্যতিক্রম, যাদের ভাষা, নাম পদবি, সাজ পোষাক, আড়ম্বর, সংস্কার, সংস্কৃতি সম্পূর্ণ সাবেক ভারতীয়। এটা তাদের মূলতঃ ভারতীয় জনসমষ্টিভূক্ত লোক হওয়ার প্রমাণ। তবে তাদের রাজনৈতিক নাগরিকত্ব বিতর্কিত খৃষ্ট শতাব্দীর প্রাথমিক কাল থেকে ভারতীয় সভ্যতা ও উপনিবেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে ছিলো সম্প্রসারণশীল। তখন ঐ সব দেশে ও দ্বীপাঞ্চলে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় ভাগ্যান্বেষীদের স্থানান্তর ঘটে। তাতেই ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কার সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা, নাম উপাধিও ভারতীয় সংকর জনগোষ্ঠীতে ঐ অঞ্চলগুলো ছেয়ে যায়। চাকমারাও সে প্রাচীন ভারতীয় জনগোষ্ঠীর একটি হিসাবে বার্মা ও আরাকানে স্থানান্তর গ্রহণ করেছিলো বলে তাদের প্রাচীন কথা কাহিনীতে বিবৃত হয়। ঐ স্থানান্তর গ্রহণকে তাদের পুরা কাহিনীতে রাজ্য জয় বলে ইতিহাস ও অবহিত করা হয়েছে। যেমন রাধা মহন ধনপতি কাহিনীতে কাব্যিক ভাষায় বর্ণিত হয়েছেঃ

"তৌনে রানি নি ভাত খেলাক
সমুন্দর সাগর নি লাগ পেলাক।
লৈনেই সমারে সৈন্যগণ
বোয়াং কূলে লূঙ্গে গৈ রাধা মোম্বন।
বাংলা ঃ তরকারী রেধেঁ নিয়ে ভাত খেলে
সমুদ্র সাগর শেষে লাগ পেলে
সঙ্গে নিয়ে সৈন্য সামন্ত জন
রোয়াং কূলে পৌছে গেল রাধা মোম্বন।

কাহিনী হলো ঃ চাকমা রাজ্য চম্পক নগরের যুবরাজ বিজয়গিরি দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে

রাধা মোহনের সেনাপতিত্বে ২৬ হাজার সৈন্য সহ, রোয়াং দেশের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। পথে তেওয়া (সম্ভবত ঃ করতোয়া নদী) ঘাগট, মেঘনা দজ্যা (মেঘনা নদী) খৈগাঙ (খোয়াই নদী) ত্রিপুরা ও চাটিগাং (চিটাগাং) অঞ্চল পাড়ি দিয়ে তারা মগ রাজ্য রোয়াং দেশে পৌছেন ও তা জয় করেন। এই অভিযানে দীর্ঘ ১২ বছর অতিক্রান্ত হয়। সেনাপতি রাধামহোন নব পরিণীতা স্ত্রী ধনপতি (ধনবতী) কে দেশে রেখে এসেছিলেন তাই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে যুবরাজ বিজয় গিরির অনুমতি প্রার্থী হোন। যুবরাজ নিজেও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আগ্রহী হোন। তাই বিজিত রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা করে সেনাপতি সহ স্বদেশ চম্পক নগর মুখে রওয়ানা দেন। এমতাবস্থায় পথিমধ্যে খবর পৌছে যে, বৃদ্ধ পিতা রাজা সমরগিরি মারা গেছেন এবং কনিষ্ঠ রাজকুমার উদয়গিরি সিংহাসন দখল করে নিয়েছেন। এই দুঃসংবাদে যুবরাজ বিজয়গিরি হতাশ হয়ে মন্তব্য করেন ঃ

"পর্বুয়া পন্দিত নেই যে দেজত
যেতুং নয় সৈন্যগণ সেই দেজত।ঃ
বাংলা ঃ পড় য়া পন্ডিত নেই যে দেশে
যাব না সৈন্যগণ সেই দেশে।

অতঃপর তিনি বিজিত রাজ্যে পত্যাবর্তন করেন, এবং এক আরি মেয়েকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে, সৈন্যদের স্থানীয় মেয়েদের নিয়ে সংসারী হতে বলেন। পরে তিনি নিঃসন্তান মারা যান। এই স্থানীয় স্ত্রীদের গর্ভে চাকমাদের বংশ বৃদ্ধি ঘটে। তাদের পরবর্তী রাজা হোন জনৈক সৈনিক।

তবে মগ বা মারমা সহ মুরুং, খুমি, সেন্দুরা, তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য ভাষা সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার সূত্রেই মিজরাম বার্মা ও আরাকান মূলের লোক। ত্রিপুরী ও মগ সমষ্টির কিছু লোক অতীতের দখলাধিকার সূত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে দীর্ঘ অতীত কাল থেকেই সম্পর্কিত। কুকি খ্যাত লোকেরাও পূর্বাঞ্চলবাসী উৎপাতকারী প্রাচীন জনগোষ্ঠী। চাকমা সমষ্টিভূক্ত লোকেরা বৃটিশ আমলের আগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এতদাঞ্চলে ছিলো না তা -সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। ১৭৭৬-৮৫ খ্রীঃ আমলে বৃটিশদের বিরুদ্ধে এতদাঞ্চলে একটি বিদ্রোহ ঘটে, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চাকমা সর্দার শের দৌলৎ খান, তদীয় পুত্র ও স্থলাভিষিক্ত সর্দার জান বখশ খান, এবং তার নিকটাত্মীয় রনু খান। ঐ বিদ্রোহে চাকমাদের সাথে স্থানীয় কুকি সম্প্রদায় এবং জনৈক মুন গাজির নেতৃত্বে একদল স্থানীয় বাঙ্গালী ও সহযোদ্ধা রূপে লড়েছে। ঐ বিদ্রোহ সূত্রেই চাকমা সম্প্রদায় ও তাদের সর্দারদের এতদাঞ্চলীয় অস্তিত্ব ও দাপটের কথা প্রথম ব্যাপক প্রচার লাভ করে। তবে সে পর্যন্ত তাদের জনবল সীমিতই ছিলো। পরবর্তী একশত বছরের মাথায়, ১৮৭২ খ্রীঃ সালের আদম শুমারীতে তাদের জনসংখ্যা ২৫১১০ বলে নির্ণীত হয়। ঐ বিদ্রোহ জনিত শক্তিশালী ঘটনায়

স্থানীয় ভাবে তাদের অবস্থান ও রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। স্থানীয় কুকি ও বাঙ্গালী জনগণের সাথে তাদের সহাবস্থান ও মৈত্রী তাদেরকে বহিরাগত অভিবাসী জনগোষ্ঠীর অবহেলা ও অবজ্ঞা থেকেও বাঁচিয়ে দেয়। নামে ও খেতাবে চাকমা প্রধানেরা ছিলেন মুসলিম অভিজাত বলে অনুভূত। চাকমা সর্দার বংশ আর তার অভিজাতদের আভিজাত্য পূর্ণ আচরণ নাম ও খেতাব সে সময় এ ধারণারই জন্ম দেয় যে, তাদের সাথে এ দেশীয় প্রধান জনগোষ্ঠী মুসলমানদের রাজনৈতিক ধর্মীয় ও সামাজিক একাত্মতা ও মৈত্রী বন্ধন আছে। সমকালিন এবং দেশভিত্তিক বলে এতদাঞ্চলীয় ঐ বিদ্রোহটি ভারত ব্যাপ্ত বৃটিশ উৎখাত সংগ্রামেরই অংশ বলে ভাবা যায়। ঐ স্থানীয় বিদ্রোহটি তা থেকে বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী কিছু হলে তখন অবশ্যই আঞ্চলিক স্বাধীনতা ঘোষিত হতো। কিন্তু ঐ বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা জান বখশ খান নিজেকে জমিদার ঘোষণা করে সীলমোহর ব্যবহার করেছেন, যা সার্বভৌমত্বের প্রতীক নয়।

বর্ণিত সীলমোহরটি সহ চাকমা সর্দারদের মোট দশটি সীলমোহর যা বর্তমানে বিদ্যমান আছে, তার কোন একটিতেও তাদের স্বাধীন রাজত্ব দাবীর স্বীকৃতি নেই। বর্ণিত ঐ প্রতিটি সীলমোহর, আরবী বর্ণে খোদাইকৃত, ও মুসলিম নাম খেতাবে সমৃদ্ধ, যা ঐ সময়কার স্থানীয় মুসলিম আভিজাত্যের স্মারক। ঐ সীলমোহরগুলো ১৭৪০ খ্রীঃ সাল থেকে বৃটিশ আমল পর্যন্ত সময়কালের এবং তাতে মঘী পঞ্জিকা ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলোর বিষদ বিবরণ আমার সদ্য প্রকাশিত পুস্তকঃ গবেষণা কর্ম পার্বত্য চট্টগ্রাম-এ দ্রষ্টব্য।

১৮৭৩ সাল থেকে চাকমা সর্দারদের মুসলিম নাম খেতাব পরিত্যক্ত। তবু তাদের অভিষেককালীন আনুষ্ঠানিক লেবাস ও দরবারী কায়দা কানুন এখনো মোগলাই হয়ে আছে, এবং মহিলারাও খেতাবে বিবির অপভ্রংশ বি-তে ভূষিত হোন। তাদের ভাষাটি ও মুসলিম সামাজিক চরিত্র সম্পন্ন, যথাঃ খোদা, ঈমান, হেমান ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ।

দলিল প্রমাণ ছাড়া কোন অতীত কাহিনী ইতিহাসে পরিণত হয় না। ধ্যান ধারণা গল্প গুজব ইতিহাস নয়। এমনি অনেকে গল্প ও রূপকথার দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতিদের বিচার করে থাকেন। যারা গল্প ও রূপকথাকে ইতিহাস বলে চালাতে চান, তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ যে, এতদাঞ্চলের অতীত কাহিনী, কিছু অকাট্য দলিল প্রমাণের দ্বারা সমৃদ্ধ। সবই গল্প ও রূপকথা নয়। আমি এখানে ভ্রান্ত কথা কাহিনীর বিপক্ষে কিছু ঐতিহাসিক অকাট্য দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করবো, যা স্থানীয় ইতিহাস বিবেচনায় এ যাবৎ ব্যবহৃত হয়নি। তথ্যানুসন্ধানী ও রাজনীতিকদের পক্ষে এগুলো জানা উপকারী। এগুলো স্থানীয় ইতিহাসের স্তম্ভ ও বটে। এ দলিল প্রমাণগুলো নবাবিষ্কৃত বা অভিনব নয়। বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন জনের দ্বারা তা উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে। তবু এগুলো রহস্যাবৃতই থেকে গেছে, যথার্থভাবে মূল্যায়িত হয়নি। বিস্ময়করভাবে এগুলো স্থানীয় অতীতকে স্বরূপে উদ্ভাসিত করে। সুতরাং

আমি এখানে সে দলিল পত্র গুলোর নব মূল্যায়নে ব্রতী হবো, যা অভিনব হলেও যথার্থ।

১। চাকমা চীফদের অতীত নিদর্শন রূপী দশটি সীলমোহর আছে। এগুলো মূল্যবান ঐতিহাসিক স্মারক। তাতে উৎকীর্ণ ভাষা, বর্ণ, সংখ্যা, নাম ও পদবী, অকাট্য ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ। এগুলোর প্রকৃত পাঠ ও রহস্য এ যাবৎ উদ্ধার করা হয়নি। যা হয়েছে, তা অস্পষ্ট ও অনুমান ভিত্তিক। অনেকে এগুলোকে মুদ্রা জ্ঞানে এ বলে গর্বিত হোন যে, এই তো চাকমা স্বাধীন রাজ্যের প্রমাণ। কিন্তু আসলে এগুলো যে মুদ্রা নয় সীলমোহর, এ সত্য কথাটি আবেগ তাড়িত ঐ লোকদেরকাছে অজ্ঞাত।

সীলমোহর একাধিক সংখ্যক হয় না, কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ হয় সংখ্যায় অনেক। আলোচ্য সীলমোহর বা মুদ্রাগুলো সংখ্যায় একাধিক নয়। মুদ্রা হলে এগুলো একাধিক সংখ্যায় পাওয়া যেতো। খোদ চাকমা চীফের সংগ্রহে সেগুলোর কোন একটিও একাধিক সংখ্যক নেই এবং তা একদিকে খোদাইকৃত। অতীতে আংটি সদৃশ বা মুদ্রাকার সীলমোহর ব্যবহৃত হতো। এদেশীয় বিভিন্ন মোহাফেজ খানায় তার বিস্তর নির্দশন আছে। সুতরাং এগুলো মুদ্রা নয়। এই সীল মোহর গুলো প্রমাণ করে তার ধারক ব্যক্তিরা কিছু সামন্ততান্ত্রিক বা গোত্রীয় সর্দারী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তারাও তাদের অধীনস্থ প্রজারা ছিলেন বিভিন্ন গোত্র ধর্ম ও সমাজের সাথে সম্পৃক্ত লোক। ঐ সর্দার ও অভিজাতরা ছিলেন মুসলিম সমাজ ও ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত। তাই তাদের নাম পদবি একচেটিয়া মুসলিম সামাজিক এবং তাদের লেখাপড়া ও শিক্ষাভ্যাস ইসলামী আরবী ও ফার্সির অনুসারী। পাশাপাশি সাধারণ লোক ও যাজক মহলের একাংশে খেমার জাতের হরফ, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম চর্চিত হয়েছে। তবু সন্দিগ্ধ অনেকের ধারণাঃ বর্ণিত ইসলামী ও মুসলমানী ঐতিহ্য চর্চা মোগল প্রভাবের ফল। অথচ চট্টগ্রামে মোগল শাসনের ব্যাপ্তিকাল হলো মাত্র ৯০ বছর, যা স্থানীয় ভিন্ন সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এটা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এহেতু আরো দীর্ঘ সামাজিক মিশ্রণকে তজ্জন্যে দায়ী করা যায়।

(মঙ্গলবার ১৭ মাঘ ১৪০৭ বাংলা ৩০ জানুয়ারী ২০০১ খ্রীঃ/ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি।)

চাকমা প্রধানদের সীলমোহরগুলোর ছাপ চিত্র উপস্থাপন পাঠ ও তার মূল্যায়ন, আমি ইতোপূর্বে প্রকাশিত আমার গবেষণা কর্ম ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম নামক পুস্তকে সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। সেগুলোর প্রবর্তক ব্যক্তিরা আরবী বর্ণে ও অংকে নিজ নিজ নাম, খেতাব, কার্যকাল ও কিছু কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস ও আবাসস্থলের কথা তাতে উল্লেখ করেছেন। সময়কাল হিসাবে তাতে মঘী পঞ্জিকা ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এ সীলমোহরগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপিত হলো।

সীলমোহরগুলোর ক্রমিক তালিকা ও ভাষ্যঃ

১. সোনা-বি ১১০২ (মঘী/ মোতাবেক ১৭৪০ খ্রীঃ)
২. শের জব্বার খান ১১১১ (মঘী/মোতাবেক ১৭৪৯ খ্রীঃ) রোসাং আরাকান আল্লাহ্ রাব্বি
৩. শুকদের রায় বাহাদুর ১১১৫ (মঘী/১৭৫৩খ্রীঃ)
৪. নুরুল্লা খান পিসরে শের জব্বার খান জমিদার ১১২৭ (মঘী/১৭৬৫ খ্রীঃ)।
৫. ফতেহ খান ১১৩৩ (মঘী/১৭৭১ খ্রীঃ)
৬. শের দৌলৎ খান ১১৩৫ (মঘী/ ১৭৭৩ খ্রীঃ)
৭. জান বখশ খান মহারাজ ১১৪৫ (মঘী/১৭৮৩ খ্রীঃ)
৮. জব্বার খান ১১৬৩ (মঘী / ১৮০১ খ্রীঃ) শ্রী শ্রী জয় কালি জয় নারায়ণ তারা
৯. ধরম বখশ খান জয় কালিসহায়।

এই সীল মোহরীয় বর্ণনা থেকে অকাট্যভাবে জানা যাচ্ছে যে, এদের সবাই নাম খেতাব ও আরবী বর্ণের ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের মুসলিম ঐতিহ্যানুসারী বলে প্রমাণ করছেন। শের জব্বার খান নিজেকে একনিষ্ঠ ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। জাব্বার খান ও তদীয় পুত্র ধরম বখশ খান, মুসলিম ঐতিহ্যের ধারক হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু ধর্মের প্রতি অনুরাগ দেখাচ্ছেন। মোট নয় জনের মধ্যে কেবল শুকদেব রায় জমিদার নামে ও খেতাবে অমুসলিম। তবে তিনিও আরবী বর্ণে অভ্যস্ত। এদের সবার কার্যকাল হলো ১৭৪০- ১৮৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত ৯২ বছর কাল ব্যাপ্ত। ধরম বখম খানের সীলমোহরে কোন সময় কাল ব্যবহৃত হয়নি। তবে সরকারী তথ্যে তার জীবনকাল হলো ১৮১২-৩২ খ্রীঃ।

১৭৫৭ খ্রীঃ সালে নবাব সিরাজুদ্দৌল্লার পতন ঘটে। নবাব মীর কাসিম আলী খান ১৭৬০ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে হস্তান্তর করেন। ১৭৬৫ খ্রী ঃ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী ও নেজামত লাভ করে, এতদাঞ্চলের পরিপূর্ণ শাসক হয়ে দাঁড়ায়। এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন কালে চাকমা প্রধান শের জব্বার খান, নিজেকে সীলমোহর সূত্রে আরাকানের রোসাংবাসী বলে জানাচ্ছেন। এই সূত্রে তার কার্যকাল হলো ১৭৪৯-৬৫ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। সুতরাং এটাই যথার্থ ইতিহাস যে বৃটিশ আমলের শুরু কালেও চাকমাদের রাজা ও জন সাধারণের প্রধান অংশের অবস্থান, আরাকানের রোসাং অঞ্চলে বহাল ছিলো। সেখানে মগ জনসাধারণও রাজশক্তির সাথে বিরোধ বাঁধার কারণেই হয়তো তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয় লাভে বাংলার দিকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। এটা প্রমাণ করে বাংলার মানুষ ও তার কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের ছিলো প্রগাঢ় আস্থা ও সদ্ভাব। বাস্তবেও তারা এতদাঞ্চলে বিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করেননি। এদেশ তাদের অকাতরে আশ্রয় ও খাবার যুগিয়েছে। এটাই বাস্তব বিষয় যে, মানুষ শত্রু দেশ ওজাতির কাছে আশ্রয় ও অভ্যর্থনা লাভ করে না। বিপদ ও দুর্যোগকালে দুর্গত লোকজন বন্ধুদেশ ও ভ্রাতৃ

জাতির শরণাপন্ন হয়। আলোচ্য বিষয়টিও এ থেকে ব্যতিক্রম নয়। এই উপজাতীয় শরণার্থী গ্রহণ বাঙ্গালী মহানুভবতার দৃষ্টান্ত। অথচ মগদের সম্বন্ধে চাকমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলোঃ

"ঘরত গেলে মগে পায়/ ঝারত গেলে বাঘে খায়।
বাঘে ন খেলে মঘে পায়/ মঘে ন পেলে বাঘে খায়।ঃ

এটা অতীত কাহিনী ভিত্তিক একটি গানের অংশ। (সূত্রঃ চাকমা লোকগীতি) আরেক চাকমা লোককাহিনী ভিত্তিক গানে ব্যক্ত হয় ঃ আদি চাকমা রাজার মর্যাদা প্রাপ্ত জনৈক শের মস্ত খাঁর মূল বাড়ী ছিলো আরাকানে ও তার অধীন একদল চাকমার শেষ মোগল আমলে চট্টগ্রামে আগমন ঘটে। ঐ আদি রাজা ও আদি চাকমাদের বসবাসকাল অন্য কোন প্রমাণ সূত্রের দ্বারা নিশ্চিত নয়।

প্রফেসার আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন, স্বীয় রাজাজ ওফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস নামক প্রবন্ধে আদি রাজার সময়কাল ১৭৩৭ খ্রীঃ সাল বলে নির্ণয় করেছেন, যার সূত্র হলো মোগল আমলের স্থানীয় কানুনগো রিপোর্ট। তিনি এ-ও উল্লেখ করেছেন যে, দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ার মাওদা অঞ্চলে ঐ শেরমস্ত খাঁকে চট্টগ্রামের নাজিম জুল কদর খাঁ একখন্ড পাহাড়ী জমি বন্দোবস্তি দিয়েছিলেন, যে জমিতে তার সঙ্গী সাথী চাকমারা চাষাবাদে লিপ্ত হয়।

বর্ণিত উভয় তথ্যকে সঠিক ধরে নিয়ে বলা যায়, মোগল আমলের শেষের দিকে প্রথম একদল আরাকান ত্যাগী চাকমা শের মস্ত খানের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আদমন করে, এবং তাদের বৃহদাংশ মূল সর্দার নেতৃত্বাধীন, আরাকানেই নিজেদের অবস্থান বজায় রাখে। চাকমাদের বাংলাদেশে আগত খন্ডিতাংশের প্রথম রাজা শেরমস্ত খান, এবং এটা তাদের লোকগীতিতেও স্বীকৃত যথাঃ

"আদি রাজা শেরমস্ত খাঁ রোয়াং ছিলো বাড়ি,
তারপর শুকদেব রায় বান্ধে জমিদারী।ঃ

কিংবদন্তি সূত্রে চাকমারা অনেক দীর্ঘ রাজ তালিকার অধিকারী, এবং তাদের রাজ্য রাজত্বের ব্যাপ্তিকাল ও শত শত বছর দীর্ঘ, যা বিশ্বাস্য প্রমাণ সূত্রের দ্বারা সমর্থিত নয়।

তবে এ কথা সত্য যে, তারা একটি কুলিন সম্প্রদায়, এবং কয়েক শত বছর যাবৎ ভারত বাংলা ও আরাকানে বসবাসের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। ভাগ্যের পরিহাসে তারা দেশে দেশে বিচরণশীল ও বিভক্ত। আরাকান, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণালচল জুড়ে তাদের বসবাস বিস্তৃত। এই তিন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম এলাকায় তাদের বিভক্ত বিচ্ছিন্ন অবস্থান কখনো জোড় খাবে এবং তারা রাজ্যাধিকারী হবে সে আশা বৃথা। তবে বাংলা অঞ্চলে তাদের প্রধান অবস্থান সর্বাধিক সংহত হয়ে আছে, এবং বাঙ্গালীদের সাথেও তাদের নিকটতম নৃতাত্বিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

বিদ্যমান। এই আনুকুল্যকে অবলম্বন করে আরো ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য রচনা করা গেলে, এতদাঞ্চল হতে পারে তাদের স্থায়ী সুখ নিবাস। বাঙ্গালী উদারতা যেমন অতীতে তাদের সহযোগী থেকেছে, তেমনি তা ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিত করার উপায় হলোঃ উভয়ের অহিংস শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়া। চাকমাদের দ্বারা এতদাঞ্চলে বাঙ্গালীদের রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার নীতি উভয়ের মাঝে তিক্ততার জন্ম দিচ্ছে, যার ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ হবে চাকমাসহ উপজাতীয়রাই। এই অঞ্চলে উপজাতীয়দের স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীন ক্ষমতা লাভের বাড়াবাড়িকে বাঙ্গালীদের বৃহৎ জনসংখ্যা আর বাংলাদেশের নিবিড় অখন্ডতাই সফল হতে দেবে না। তবে আপোষ সমঝোতার ধারায় প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সম্প্রদায়ের সম অধিকারের ভিত্তিতে স্থানীয় শাসন ক্ষমতা বা সীমিত স্বায়ত্তশাসন লাভ সম্ভব। জাতীয় অসন্তোষ সন্দেহ আর অবিশ্বাস, উপজাতীয় রাজনৈতিক বাড়াবাড়িকে অবলম্বন করে, ইতোমধ্যে রচিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের জন্মকালিন নাজুক শৈশবকালে সূচিত দীর্ঘ বিব্রতকর উপজাতীয় বিদ্রোহটি পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার উপর এক গভীর চীড় ধরিয়ে দিয়েছে। একে সারাতে দরকার এমন এক গভীর উদার সম্পর্ক রচনা যাতে উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক একাত্মতা বাস্তব হয়ে ওঠে। সম্প্রতি সম্পাদিত তথা কথিত শান্তি চুক্তিতে বৈষম্য ও ভিন্নতা সূচিত হয়েছে। মনে করা হয় এটি বিদ্রোহের জারজ সমঝোতা। এর দ্বারা সম্পর্কের উন্নয়ন হবে বলা যায় না। এটি বিদ্রোহের ঐ তিক্ততাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিবে যে, তাতে হাজার হাজার পাহাড়ী বাঙ্গালী পরস্পরের সাথে হানাহানিতে লিপ্ত আর হতাহত হয়েছে, পরস্পরকে শত্রু ভাবতে শিখেছে, এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে আনয়ন করেছে বৈষম্য। এটি বৈষম্যপূর্ণ এমন এক রোয়েদাদ, যদ্বারা পাহাড়ীরা বিশেষ সুযোগ সুবিধাভোগী বরপুত্র এবং বাঙ্গালীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত।

চাকমা ইতিহাসের দ্বিতীয় উপাদান হলোঃ রাধা মোহন ধন পতি মহাকাব্য। চাটিগাং ছাড়া বা ছড়া কাব্যটিও তার অংশ। এ মহা কাব্যটির কোন লিখিত রূপ নেই। তবে তার কিছু খন্ডিতাংশ পুস্তিকা আকারে হালে প্রকাশিত হয়েছে। মৌখিক পালাগানের মত একদল চারণ গায়ক এটির চর্চা করে থাকেন, যাদের বলা হয়ে থাকে গেংকুলি গায়ক। গেংকুলি নামটি জ্ঞানকলির বিকৃত রূপ বলেই মনে হয়। চাকমা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বর্ণনায় এ গানটি ভরপুর। ইতিহাস গবেষণার এক সমৃদ্ধ উপাদান রূপে এটি সংগ্রহ যোগ্য।

চাকমা সমাজের অতীত গৌরবের খুটিনাটি বিষয়দি এ গানটিতে সন্নিবেসিত আছে। এ গানের আসরে সাধারণ চাকমা সমাজ বিপুলভাবে উল্লসিত হয় এবং গৌরবময় অতীত কাহিনী শুনে উচ্ছাস প্রকাশ করে। আজকাল চর্চার অভাবে এই গেংকুলি গায়কদের সংখ্যা ও আদর হ্রাস পাচ্ছে, এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ গানটির চর্চাও ধরে রাখা যাচ্ছে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রধান গেংকুলি গায়ক বা ওস্তাদ গেংকুলি যিনি একজন তঞ্চঙ্গ্যা অন্ধ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি, জীবিকা নির্বাহে ব্যর্থ হয়ে, কারো

প্রলোভনে কলকাতায় পাড়ি জমিয়েছেন।

সাগরিদরাও অনাদর অবহেলায় প্রত্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলের কোন কোন তঞ্চঙ্গ্যা পাড়ায়, অন্য পেশা অবলম্বন করে কোনমতে কালাতিপাত করছেন। এখন আর তাদের সুরেলা দোতারা বাজে না, এবং কণ্ঠেও ঝংকৃত হয় না অতীত গৌরবময় চাকমা ইতিহাস। কেউ তৎপ্রতি আগ্রহী ও নন। ইতিহাস ও সংস্কৃতির সংরক্ষক কর্তৃপক্ষ এগুলো হারিয়ে যাওয়ার আগে সংগ্রহে উদ্যোগী হলে প্রভূত উপকার হতো। খৃষ্টান মিশনারীদের কেউ কেউ এগুলো টেপ করে রেখেছেন। রাঙ্গামাটির কেথলিক গীর্জায় এগুলো টেপে বাজতে আমি শুনেছি। তবে সে অনেক আগের কথা। আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এই মহৎ উদ্যোগটি নিতে পারে।

আরাকানের ম্রাকু রাজবংশ তাদের কার্যকালের ৩৫২ বছর যাবৎ মুসলিম নাম পদবী ধারণ ও আরবী ফার্সী ভাষা ও বর্ণের চর্চায় ব্রতী ছিলেন, যার প্রমাণ তাদের জারিকৃত মুদ্রা ও প্রচারিত দলিল পত্রে বিদ্যমান। সে সময়কার আরাকানবাসী হিসাবে চাকমাদের উপরও তার প্রভাব পড়ে থাকবে। তবে ব্যতিক্রম হলো ম্রাকু রাজবংশীয় আর সে দেশীয় অভিজাতরা মঘী নাম পদবি বর্ণ ও ভাষার বিকল্পরূপে মুসলিম নাম খেতাব ও আরবী ফার্সী বর্ণ ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হলেও মুসলিম সামাজিক ও ধর্মীয় ভাষা থেকে তারা মুক্ত ছিলেন। কিন্তু চাকমা সমাজ হলো এর ব্যতিক্রম। তারা বাঙ্গালী মুসলিম সামাজিক ও ধর্মীয় ভাষায় পুরোপুরি অভ্যস্ত। মুসলিম নাম খেতাবের সাথে এই ভাষাগত একাত্মতা বিস্ময়কর। অথচ স্থানীয় হিন্দু বাঙ্গালীরা মুসলিম বাঙ্গালীদের অধিকাংশের দীর্ঘদিনের রক্তগত আত্মীয়। তবু উভয়ের মাঝে ভাষা নাম ও পদবিতে গভীর পার্থক্য প্রবহমান। চাকমা ও মুসলিম বাঙ্গালীদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত গভীর একাত্মতা উভয়ের দীর্ঘ অতীত ঘনিষ্ঠতার স্মারক। গভীর মিশ্রণ ও ঘনিষ্ঠতার দীর্ঘ প্রেকটিস ছাড়া খোদা, দোজখ, ওক্ত, সালাম, ইত্যাদির মত ইসলামী ভাষাগত একাত্মতা রচিত হতে পারে না। এই একাত্মতার উদাহরণকে পাশ কেটে বর্তমানে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের চরম বৈরী, এটা সর্বাধিক বিস্ময়কর। তবে এটাকে ভ্রাতৃ কলহই বলা যায়।

কেউ কেউ বলেন ঃ এই বিস্ময়কর বৈরীতার প্রধান হেতু, কর্ণফুলী হ্রদের দ্বারা বিরাট উপজাতীয় অঞ্চলকে ডুবিয়ে দেয়া, বাঙ্গালীদের বসতি বিস্তার, যৌনঅনাচার ও শোষন ইত্যাদি। হ্যাঁ উপজাতীয় অসন্তোষ বিস্তারে এ কারণ গুলোর খানেক প্রভাব অবশ্যই অনস্বীকার্য। তবে স্থানীয় রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষই প্রধান কারণ, যেটি উপরোক্ত কারণগুলোকে অবলম্বন করে শক্তি সঞ্চয় করেছে। উপজাতীয় বিদ্রোহই ডেকে এনেছে বাঙ্গালীদের। নতুবা এতদিনে এতদাঞ্চলের বাংলাদেশ হয়ে থাকাই ছিলো সন্দেহজনক। উপজাতীয় রাজনীতির মূল বিষয় সূত্র তাদের পরিপোষিত ভ্রান্ত ঐতিহাসিক ধারণায়ই নিহিত, আর সে হলো ঃ এতদাঞ্চল আদি উপজাতীয় এলাকা,

এবং এটি সাবেক স্বাধীন মুক্তাঞ্চল, যেখানে চাকমাদের একটি স্বাধীন রাজ্য ছিলো। অথচ এটি সঠিক ধারণা নয়। জনসংহতি সমিতি এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতেই স্বীয় দাবীতে স্বাধীন চাকমা রাজা কর্তৃক মোগলদের সাথে তুলনা চুক্তি সম্পদানের কথা বলেছে।

সীলমোহর অনুযায়ী চাকমা রাজা ফতেহ খাঁ হলেন বৃটিশ আমলের লোক। তার কার্যকাল ১৭৭১ সাল থেকে শুরু। কথিত জালাল খান ও চাকমা নৃপতি নন। তিনি হলেন পৃথক উপজাতীয় সর্দার গোষ্ঠী তৈন খাঁন বা চন্দন খান বংশের শেষ ব্যক্তি, যাকে ১৭২৪ সালে অবাধ্যতার কারণে, দোহাজারীতে নিযুক্ত মোগল ফৌজদার কৃষণ চাঁদ কর্তৃক উৎখাত করা হয়। এই বংশের কার্যকাল ১৭১১-১৭২৪ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৩ বছর কাল ব্যাপ্ত। তাও তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছিলো আরাকান সীমান্ত সংলগ্ন দুর্গম ক্ষুদ্র এক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

ঐ ফতেহ খাঁ বা জালাল খানের পক্ষে দিল্লীর বাদশাহ ফররুখ শিয়ার বা মোহাম্মদ শাহের সাথে তুচ্ছ ১১ মন তুলার বিনিময়ে সরাসরি সাক্ষাতে চুক্তি সম্পাদন করা অসম্ভব, যার কোন প্রমাণ নেই। এ সব কল্পবাহিনী অবিশ্বাস্য। তবে যা বিশ্বাস্য তা হলোঃ চাকমা ও বাঙ্গালীরা দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃ প্রতিবেশী। বর্তমানে তাদের মধ্যকার সংঘাত ও বিরোধ হলো আঞ্চলিক আধিপত্য ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ জাত দ্বন্দ্ব।

এতদাঞ্চলে উপজাতীয় সংখ্যা প্রাধান্য রক্ষার কোন উপায় নেই। বাঙ্গালীরা ইতোমধ্যে তাদের প্রাধান্য বিস্তার করে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংঘাত যতই ঘটুক, এবং বিতাড়নমূলক ব্যবস্থা ও আইনের সংস্থান যতই হোক, পরিবেশ পরিস্থিতি হলো বাঙ্গালীদের পক্ষে। আর এটাই নির্মম বাস্তবতা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি কোন দ্বীপাঞ্চল বা ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এলাকা নয়। এটি বাংলাদেশের সাথে অবিচ্ছিন্ন অঞ্চল। আইনী নিষেধাজ্ঞা বা দূর্ভেদ্য দেওয়াল নির্মাণের দ্বারা ও এতদাঞ্চলে বাঙ্গালী আগমন ঠেকান অসম্ভব। অনুরূপ চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছু নয়। যদি এতাদঞ্চল স্বায়ত্ত শাসিত বা স্বাধীন ও হয়, তবু পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে বাঙ্গালী ও বাংলাদেশ নির্ভর করে রাখবে। ভুটান সিঙ্গাপুর ইত্যাদি ক্ষুদ্র দেশ সমূহের মত টিকে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। সর্বাবস্থায় তাকে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের সহ টিকে থাকতে হবে। কেবল স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা বা স্বাধীনতা লাভই শেষ ও সব পাওয়া নয়। ভিন্নভাবে শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন প্রয়োজনীয়। নাগরিক বিসম্বাদ ও সংঘাত প্রতিনিয়ত তাকে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করে রাখলে, শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন হবে সুদুর পরাহত। সর্বাবস্থায় নাগরিক সুস্থিতি শান্তি ও সৌহার্দ্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র চর্চনীয়। সম্প্রদায় বিশেষকে অগ্রাধিকার দান এবং অন্যদের কোণঠাসা করে রাখা আন্দোলন সংঘাত ও

অশান্তির কারণ হয়। বাংলাদেশ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ও সরকারী ক্ষমতা কাঠামোতে যেমন সংখ্যালঘুদের অংশীদারিত্ব অপরিহার্য, তেমনি সম্ভাব্য স্বাধীন উপাজাতীয় রাষ্ট্র বা রাজ্য সরকারকেও বাঙ্গালীমুক্ত রাখার চিন্তা অবাস্তব। এই অতি উৎসাহী চিন্তা চেতনা সুস্থ মস্তিষ্ক জাত বলে ভাবা যায় না। তেমন অবস্থায় বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী প্রতিবেশীরা আক্রমনাত্মক ভূমিকাই নিতে বাধ্য হবে। এই প্ররোচনামূলক রাজনীতি সংগঠিত করার লক্ষ্য হলো বসনিয়া বা পূর্ব তিমুরের মত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা, যাতে সংখ্যালঘু ও মানবিক অধিকার রক্ষার নামে মুরুব্বী রাষ্ট্রদের হস্তক্ষেপ সম্ভবপর করে তোলা যায়, এবং আরো উদ্দেশ্য হলো বাঙ্গালী ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারে বাধ্যকরা, এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে জাতিসংঘের মাধ্যমে কেবল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে গণভোট অনুষ্ঠান। এই ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক লক্ষ্যের সাফল্যের পক্ষে, এতদাঞ্চলের সীমান্ত সংলগ্নতা, বিজাতীয় সহযোগিতা ও মদদের আশ্বাসকে পূজি রূপে ভাবা হয়, যার প্রতিকারের বিষয়টা হলো দেশপ্রেম, অখন্ডতা ও প্রতিরক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট। সে চূড়ান্ত পরিস্থিতিকে ঠেকানো হলো রাষ্ট্রীয় কূটনীতি। এর তিক্ত ও নির্মম বিকল্প হলো ঃ পার্বত্য অঞ্চলে নিশ্চিতভাবে বাঙ্গালী জনবিস্ফোরণ ঘটান। এটি এক অমোঘ অস্ত্র, যা থেকে উপজাতিদের আপোষে আত্মরক্ষাই উত্তম। অতীতে তা-ই হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ কৌশল কার্যকর। হিংসা ও সংঘাত নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সমানাধিকার এবং সামাজিক সৌভ্রাতৃত্বেই সমস্যার হেতু দূরীভূত হতে পারে। রাজনৈতিক সাফল্যের সূত্র হলো গণতন্ত্রিক সুস্থ প্রতিযোগিতা। ভাবতে হবেঃ রাজা উজির হবার উচ্চাভিলাষী চিন্তা, এবং প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করার কুমতলব, সর্বাবস্থায় সুখকর হয় না।

যেখানে একদল উচ্চাশা প্রবণ রাজনীতিক, ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তার বশবর্তী হয়ে দেশ ও জাতিকে খন্ডিত করার প্রয়াস পান, সেখানে দেশ প্রেমিক দুরদর্শী রাষ্ট্রনীতিবিদেরা ফেডারেশন কন-ফেডারেশন বা স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থায় দেশ ও জাতিকে অখন্ড রাখায় প্রয়াস পেতে পারেন। রাজনৈতিক অখন্ডতা রক্ষায় ফেডারেল পদ্ধতিটাই শেষ অস্ত্র। সর্বাবস্থায় সার্বজনীন শাসন ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র। এই তন্ত্রে পক্ষপাতিত্ব বিশেষাধিকার বর্নাশ্রম ও উত্তরাধিকার বলতে কিছু প্রযোজ্য নয়। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে একদা কৃষ্ণকায়রা বর্নাশ্রম ও ইতরাধিকারে আবদ্ধ ছিলো। এখন ওখানে বৈষম্য অপসারিত । আগামীতে সে দেশে কোন কৃষ্ণকায়ের রাষ্ট্র প্রধান হওয়াটা ও অসম্ভব কিছু নয়। মানবতা ও গণতন্ত্রের এটাই চাহিদা।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অখণ্ড ভূমি সম্বলিত একটি একক দেশ। এদেশবাসী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বর্ন ও সম্প্রদায় সম্বলিত নাগরিকদের সম্মিলিত রাজনৈতিক সত্তা হলো ঃ এরা বাংলাদেশী জাতি। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ক্ষেত্রে এই ঐক্যবদ্ধ পরিচয় হলো শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস। একে খন্ডিত করার প্রয়াস অবশ্যই প্রত্যাখ্যান যোগ্য। তবে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও অঞ্চলের প্রতি শোষণ ও অবিচার আরোপটাও অন্যায়। এ কারণেই দেশ বিভক্ত হয় ও জাতি খন্ডিত হয়। অখণ্ড

ভারতে আঞ্চলিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তার উদাহরণ। বিভিন্ন ধর্ম সংস্কৃতি, অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর সমমর্যাদা ও সম্পদের ন্যায্য অংশীদারিত্ব অবশ্যই প্রাপ্য। তা না হলে বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। এসব পরিহার করা হলো যোগ্য রাজনীতি ও রাষ্ট্র নীতি সুলভ কাজ। এ রূপ রাজনৈতিক বিজ্ঞ পদক্ষেপ সৌভাগ্যের বিষয়। এই সৌভাগ্য লাভ কচিৎ কদাচিত ঘটে। বাংলাদেশে আজ তারই অভাব প্রকট।

(তাং-বুধবার ২৫ মাঘ ১৪০৭ বাং/ ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০১ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি।)

উপজাতীয় লোকগীতি ভিত্তিক অতীত কথা কাহিনীর কিছু কিছু তথ্য স্থানীয় ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। বিশেষতঃ তাদের আগমন, আক্রমণ, বীরত্ব, বিজয়, প্রেম, বিরহ ইত্যাদি, কাব্যিক বর্ণনা সূত্রে ব্যক্ত অতীত ঘটনাবলী ও প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিগোষ্ঠী গুলোর পরিচয়, প্রচলিত ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য। চাকমা সমাজে অনুরূপ অনেক লোক গীতি প্রচলিত আছে। তাদের ভাষাটি আঞ্চলিক বাংলাই বটে এবং প্রায় সহজ বোধ্য। বাঙ্গালী সমাজের পক্ষে ঐ গান গুলোর মর্মোদ্ধার কঠিন কিছু নয়। তবে অন্যান্য উপজাতীয় ভাষাগুলো কঠিন দুর্বোধ্য হওয়ায়, তাদের অতীত কথা কাহিনী ভিত্তিক গল্পকথা ও গীতিকাব্যের মর্মকথা রহস্যাবৃত। অনুমান করা যায়ঃ তাতেও অতীত ইতিহাসের সূত্র নিহিত আছে। সে সব কাহিনী উদ্ধার করে ভাষান্তরিত করা হলে, স্থানীয় ইতিহাসের গোপন অনেক কিছু পাওয়া সম্ভব। খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষা চর্চায় লিপ্ত, অথচ আমরা ইতিহাসের স্বার্থে ও তৎপ্রতি যত্নবান নই, যার কুফল হলো ঃ স্থানীয় ইতিহাস ও উপজাতীয় পরিচয় সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা। এ ব্যাপারে পথিকৃতের ভূমিকা নিবার যোগ্য কিছু বাঙ্গালী আছেন, যারা পেশাগত কারণে দুর্গম গভীর বন, পাহাড় ও সীমান্তে, দুর্বোধ্য ভাষা ভাষী উপজাতিদের সাথে কাজ কারবারে লিপ্ত, এবং তাদের ভাষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় তাদের মাধ্যমে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারেন। এখানে গভীর জাতীয় স্বার্থ নিহিত আছে।

প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, অনুসন্ধান ও ভ্রমণ উপলক্ষে এতদাঞ্চল ও তার মানুষদের ব্যাপারে অনেক তথ্যাদি উদ্ধার করে কিছু ইউরোপীয় পন্ডিত, অনেক মূল্যবান বক্তব্য ও বিবরণ রেখে গেছেন, যে সব বিবরণের কিছু কিছু বিব্রতকর হলেও, অধিকাংশ অতি মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ। সেগুলো স্থানীয় ইতিহাসের অংশ রূপে এখন গণ্য ।

প্রয়াত চাকমা রাণী কালিন্দি বিবি, চাকমা রাজবংশীয় কৌলিন্য আর বুদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে রাজা নগরের পরিত্যক্ত রাজ বাড়ীতে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত মন্দির গাত্রে, সর্বপ্রথম স্মৃতি কথামূলক কিছু বক্তব্য খোদাই করে রেখে গেছেন। তার স্বাক্ষরিত দু একটি রাজ ফরমান ও পাওয়া গেছে, যা সে আমলের ভাষা রাজ আচরণ প্রভাব প্রতিপত্তি ধর্মাচার ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর ধারণা দান করে। প্রয়াত রাজা ভুবন মোহন রায়

লিখিত চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যবান পুস্তিকা। তাতে আদ্যপান্ত চাকমা ইতিহাসই বিবৃত হয়েছে যদিও তাতে রাজ পরিবারের প্রাচীনত্ব ও কৌলিন্যের অতি রঞ্জিত ব্যাপার, আর দুস্প্রাপ্য সত্য কথন উভয়ই আছে। ঐ রাজ তালিকাটি রহস্য পূর্ণ বলে মনে হয় এবং কারো কারো কর্মকান্ড ও সময়কাল নিয়েও প্রশ্ন জাগে। এতদসত্বেও তাতে অনেক অবিতর্কিত আর মৌলিক তথ্য আছে, যা ইতিহাসের মানে উত্তীর্ণ। তিন উপজাতীয় প্রধানের রক্ষিত প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ উপকরণ নিদর্শন ইত্যাদিও তথ্যের সূত্র। ওগুলো যাচাই বাছাই করে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সম্ভব। চাকমা ভাষায় প্রচলিত ও রচিত স্মৃতি কথা, গান, কবিতা, শ্রুতি কথা, শব্দকোষ এবং তাতে বাংলা বর্ণ ও ভাষা ব্যবহারের প্রাচীন নিদর্শন স্থপন করেছেন যা সমূহ, অবশ্যই মূল্যবান তথ্য। ওগুলো ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পদ। স্থানীয় রাজনৈতিক বৈরীতার বিপক্ষে এগুলো অনেকটা রক্ষাকবচ।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্যঃ ১৭৪০ খ্রীঃ সাল থেকে ১৮৩২ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত সময়কালে সীলমোহরের মাধ্যমে চাকমা রাজ পরিবার আরবী ফার্সি বর্ণ ভাষা চর্চা মুসলিম নাম ও পদবি ব্যবহারের নিদর্শন অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। রাণী কালিন্দি বিবি মুন্সিয়ানা বাংলা ব্যবহারের নজির স্থাপন করেছেন। তার মন্দির গাত্রের লেখা ও প্রজাদের প্রদত্ত পাট্টা এখনো রক্ষিত থেকে প্রমাণ করছে, সে সময় চাকমা সমাজে দাপ্তরিকভাবে বাংলা চর্চাই হতো।

চাকমা সমাজে বাংলা চর্চার আরো প্রাচীন নমুনা হলো ঃ শিবচরণ ফকির রচিত গোজেনোর লামা নামক মরমী কবিতা গুচ্ছ এবং বিভিন্ন পালাগান।

আরবী ফার্সি ও বাংলার পাশাপাশি প্রাচীন কালে খেমার জাতীয় তথাকথিত চাকমা বর্ণমালার ব্যাপক প্রচলন ছিলো বলে মনে হয় না। তার বর্ণবিন্যাস ও নামকরণে বাংলারই অনুসরণ করা হয়েছে, বিজাতীয় খেমার পদ্ধতি নয়। প্রচীন নিদর্শন রূপে বৈদ্যদের চিকিৎসা ও তন্ত্র মন্ত্র ভিত্তিক অতি স্বল্প কিছু হাতে লেখা পুস্তিকাতেই মাত্র, খেমাব বর্ণের চাকমা লেখা লক্ষ্য করা যায়, এবং বুদ্ধ রঞ্জিকা নামক একটি ছোট ধর্ম পুস্তকই মাত্র তাতে রচিত পাওয়া গেছে। এটা চাকমাদের মাঝে খেমারবর্ণের সীমিত ব্যবহারের নমুনা, এবং তাও সামাজিক ও রাজকীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত নয়।

স্থানীয় ইতিহাসের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়াও দে বারোজ অঙ্কিত ১৫৫০ খ্রীঃ সালের মানচিত্রটি, যাতে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বাংলা আরাকান ও বার্মার অবস্থান এবং এ সব দেশের রাজ্যাদির আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আমি এ মানচিত্রটি আলোচনা করেছি। দ্রষ্টব্য গবেষণা কর্মঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম। এ প্রসঙ্গে আমি এ ও বলেছি যে চট্টগ্রামের দক্ষিণ পুর্বাঞ্চলে স্বাধীন সুলতান শাসিত একটি প্রাচীন মুসলিম রাজ্য ছিলো। পরে বাংলার সুলতানদের অধীন এ অঞ্চলটি দখলিভূত ও শাসিত হয়েছে। আলীকদম এরূপ একটি মুসলিম

প্রশাসনিক এলাকা ছিলো, যেটি গৌড় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৫১২ খ্রীঃ সালে দখল করেন ও জনৈক খোদা বখশ খানকে তার শাসক নিযুক্ত করেন। জোয়াও দে বারোজ ১৫৫০ খ্রী ঃ সালে স্বীয় মানচিত্রটি অঙ্কনকালে ও তাতে খোদা বখশ খান বংশীয়দের শাসক রূপে প্রদর্শন করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি তখনো আলিকদমে অথবা জীবিত ছিলেন, তার বংশীয় শাসন সেখানে কায়েম ছিলো। আলীকদম অঞ্চলে এখনো কিছু লুপ্ত প্রায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে বলে শোনা যায়। প্রত্নতাত্বিক ভাবে সে প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু এখনো উদ্ধার পেতে পারে। আমি স্থানীয় সাংবাদিকদের সহযোগিতায় কয়েক খন্ড অভিনব প্রাচীন ইট খন্ড উদ্ধার করে স্থানীয় প্রেসক্লাবে রেখে এসেছি, এবং সম্ভাব্য কায়েকটি প্রত্ন নিদর্শনপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করেছি। সেখানে খোদাই ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া সম্ভব। দুর্ভাগ্য বশতঃ আরবী লেখা সম্বলিত একটি পাথর উদ্ধার করা আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি, যেটি অল্পকাল আগেও অনাদর অবহেলায়, কখনো নদী পারের বন বিটের সামনে, আর কখনো বাজার মসজিদের আঙ্গিনায় পড়ে থাকতো। তা কিছুদিন হলো হারিয়ে গেছে। এই হারিয়ে যাওয়াটি স্থানীয় লোকদের মনে স্মরণীয় আর প্রশ্ন সাপেক্ষ এ জন্য যে, পাথরটি ছিলো আরবী লেখা সম্বলিত আর্কণীয়, এবং বাজার সংলগ্ন সমাগম স্থলে বহুজনের দর্শনীয়। পাথরটি হয়তো প্রাচীন কোন ইমারতের গায় স্থাপিত, বিশেষ বিবরণ ও সময় জ্ঞাপক ছিলো। প্রাচীন কালে ভূজ পত্র, চামড়া, তামার পাত ও পাথরকে বিভিন্ন বিবরণ ফরমান, আইন উপদেশ, স্থাপনা ও বিজয় জ্ঞাপক পত্র ও পাত্ররূপে ব্যবহার করা হতো। এ হিসাবে পাথরটি মূলবান প্রত্ন নিদর্শন ছিলো।

স্থানীয় লোকদের সাথে আলাপ করে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে যে, পাথরটির লেখা ছিলো আরবী। তাতে ইসলামী ধর্মীয় বাক্য অথবা ঐতিহাসিক বিবরণ থাকা সম্ভব।

আরাকানের ইতিহাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়, আরাকান সহ সংলগ্ন অঞ্চলে আরবী ইরানী বণিক ও ইসলাম প্রচারকদের আনাগোনার কাল প্রায় অষ্টম শতাব্দী থেকেই শুরু। দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনৈক সুরতান ও আরাকানী রাজা সূলত ইঙ্গ চন্দ্র ৯৫৩ খ্রীঃ সালে পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। ঐ সুরতান হয়তো সুলতানই হবেন। বর্ণিত পাথরটি ঐ যুগের বা পরবর্তীকালেরও হতে পারে। যখনকারই হোক পাথরটি প্রাচীন নিদর্শন এবং ঐ অঞ্চলে মুসলিম উপস্থিতি ও আধিপত্যের স্মরক। এটি উদ্ধারে মনোনিবেশ করা উচিত। সাথে সাথে ঐ অঞ্চলে প্রত্নতাত্বিক অনুসন্ধান পরিচালনাও জরুরী, যদ্ধারা এক সমৃদ্ধ অতীত উদঘাটিত হওয়া সম্ভব। লোকে বলে স্থানীয় বন কর্মকর্তার স্ত্রী পাথরের উপর গোসল করায় পাগলা হয়ে যান।

আমরা পার্বত্য অঞ্চলের ইতিহাস উদঘাটনে উদাসীন। রাণী কালিন্দি বিবি রাজা ভূবন মোহন রায়, টি, এইচ লুইন ও অ্যর্থার ফেইর এই কয় জন মাত্র গুণী ব্যক্তি

কিছু মৌলিক ঐতিহাসিক অবদান রেখে না গেলে, এখনো আমরা এ অঞ্চল সম্বন্ধে অন্ধকারে থাকতাম। তাদের বিবরণগুলোকে অবলম্বন করে, এবং তাতে কিছু সংযোগ ঘটিয়ে পরবর্তীদের ইতিহাস রচনার প্রয়াস চলছে। অথচ ইতিহাস অজ্ঞতার কারণে এতদাঞ্চলীয় রাজনৈতিক সমস্যায় দেশ হাবুডুবু খাচ্ছে, তলিয়ে দেখার প্রয়াস নেই। এতদাঞ্চল বাংলার আদি অবিচ্ছেদ্য অংশ একথা বাদ দিয়ে কোন কোন উপজাতীয় পণ্ডিত, তত্ব ও তথ্যহীন, আজগৌবী সস্তা ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত। অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠীকে কেউ করছেন উপজাতি, কেউ করছেন আদিবাসী, কেউ বলছেন স্থানীয় প্রাচীন রাজ্যাধিকারী। আইনে কখনো তাদের দেয়া হচ্ছে অগ্রাধিকার কোটাধিকার রাজনৈতিক পদ প্রাধান্য ও সংরক্ষিত আসন। তবু তাদের দাবী দাওয়া অভিযোগ অসন্তোষ ও আকাঙ্খার শেষ নেই। তারা প্রতিনিয়ত আন্দোলন মুখর। এই অন্ধ কার্যক্রম বর্জনীয়।

(তাং-বৃহস্পতিবার ২৬ মাঘ ১৪০৭ বাংলা/ ৮ জানুয়ারী ২০০১ খ্রীঃ/ দৈনিক গিরিদর্পণ রাঙ্গামাটি।)

প্রত্যেকটি উপজাতির অতীত স্মৃতিকথা আছে। সে সবই স্থানীয় লোক ঐতিহ্য আর ইতিহাসের উপাদান। অনুমান ভিত্তিক উপজাতীয় পরিচিতির চেয়ে তাদের স্মৃতি কথা ভিত্তিক পরিচিতি অধিক মূল্যবান। ঐ স্মৃতিকথা গান ও কবিতায় সংশ্লিষ্ট লোকজনের উচ্চা আকাঙ্খাবলী ব্যক্ত হয়, যা তাদেরকে বুঝার পক্ষে ও সহায়ক।

আজকাল প্রচুর সংখ্যক উজাতীয় লোক উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ও শিক্ষা গ্রহণরত আছেন। দুর্বোধ্য উপজাতীয় ভাষায় ব্যক্ত গান কবিতা ও স্মৃতি কথাগুলো তাদের মাধ্যমে বোধগম্য ভাষায় অনুবাদ করা অসম্ভব নয়। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটগুলোকে অনুরূপ কাজে লাগান যায়। তবে সতর্ক থাকতে হবে, ঐ গান ও স্মৃতিকথাগুলোর মৌলিকতা যেন রক্ষিত হয়। আজকাল রাজনৈতিক কুমতলবে অনেক কিছুই অতিরঞ্জিত আর বিকৃত হচ্ছে।

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটগুলো কেবল কর্মসংস্থান মূলক প্রতিষ্ঠান নয়। এগুলোর গঠনমূলক কর্মতৎপরতা না থাকা দুঃখ জনক। এ সবের কর্মকর্তাদের কেউ কেউ উদ্ভট চিন্তা চেতনা নিয়ে ব্যস্ত, এবং তা এই ইনস্টিটিউটের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে ও তৎপর। যা প্রকৃত তথ্য ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী তাও লেখা হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য যে, ঐ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা বাবু সুগত চাকমা লিখেছেনঃ চাকমারা একদা পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি স্বাধীন রাজ্যের অধিকারী ছিলো; যে রাজ্যটির সীমানা ছিলো; উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে শঙ্খ নদী, পশ্চিমে নিজামপুর সড়ক, আর পূর্বে কুকি রাজ্য। (সূত্রঃ চাকমা পরিচিতিঃ সুগত চাকমা, (কর্মকর্তা উ, সা, ই) রাঙ্গামাটি।

সরকারী পৃষ্ঠ পোষকতায় এই উদ্ভট ক্ষতিকর তথ্য চর্চা কি সঙ্গত? এটা কি

দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক? অথচ এটাই কাঙ্খিত যে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে সমাবিষ্ট উপজাতীয় পন্ডিতেরা, নিজেদের সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস ও

৪। ইসলাম বনাম জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস

(ক) শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে একদল লোক ধর্ম ও নৈতিকতাকে রীতিমত বিপন্ন করে তুলেছে। এদের কার্যকলাপে ধর্ম ও নৈতিকতা নিজ মূল্যমান হারিয়ে ফেলছে। মানুষ হয়ে পড়ছে বিভ্রান্ত। এটা এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এ থেকে পরিত্রাণ লাভ আবশ্যক।

পৃথিবীতে ধর্মই প্রথম নৈতিকতা ও আইন-শৃঙ্খলার শিক্ষা দান করেছে। এক সৃষ্টিকর্তা মহাপ্রভুর প্রতি আনুগত্য ও তার উপাসনা এবং তার সৃষ্টিকে রক্ষা ও সেবাই সব ধর্ম ও নৈতিকতার গোড়ার কথা। এই মৌলিকতা থেকে ব্যক্তি স্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থ মানুষকে বিচ্ছুত করতে শুরু করেছে। ক্ষমতা ও আধিপত্যের লোভ এর সাথে যুক্ত হয়ে, দিনে দিনে পরিস্থিতি হয়ে উঠছে নাজুক থেকে নাজুকতর। এ কালের সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ, চরম অধর্মীয় আর অনৈতিক কর্মকান্ডের সমষ্টি। এর পক্ষে ধর্ম ও নৈতিকতার দোহাই দান ভুল ও বিভ্রান্তিকর। ধর্ম ও নৈতিকতাকে এটা কালুষিত করছে। শান্তি-শৃঙ্খলার ভিত্তি তদ্বারা দুর্বল হচ্ছে।

সব প্রধান ধর্মেই শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রধান পালনীয় মানবীয় আচরণ রূপে মান্য। ইসলাম নামেও নীতিতে শান্তির ধর্ম। হিন্দুবাদের প্রধান প্রার্থণাই হলো ঃ ওং শান্তি। খৃষ্টবাদের প্রধান পালনীয় হলো ঃ সহনশীলতা। বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম শিক্ষা হলো ঃ প্রাণী হত্যা থেকে বিরতি গ্রহণ। এই ধর্মীয় শিক্ষাগুলোর অপব্যাখ্যা করে, এসবের অনুসারী অনেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের চর্চা করছে। এটা অধর্মাচার।

ইসলামের শাব্দিক অর্থ ঃ শান্তি ও আনুগত্য। এর পারিভাষিক অর্থ ঃ এক মহাপ্রভু আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তার এবাদত যা হলো একত্ববাদ। সুতরাং উভয় অর্থে ইসলাম মানে আল্লাহর প্রতি আস্তা আর শান্তি ও নৈতিকতার প্রতি আনুগত্য। এক আল্লাহকে মহাপ্রভু জ্ঞান করা। একমাত্র তারই আরাধনা করা। তার সৃষ্টিকে রক্ষা ও সেবা করা। এটা এক নৈতিক ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনাচার। এটাই শান্তি ও বিশ্ব-বিধাতার প্রতি আনুগত্যের ধর্ম। এর বিরোধীতা মানে অধর্মাচার। এটা কবিরা গোনাহ বা প্রধান পাপ। আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য প্রভু না মানা ও তাঁর প্রভুত্বে অন্যকে শরিক করা হলো ধর্মদ্রোহ ও শিরিক। এটি সর্বপ্রধান গোনাহ। এর পরবর্তী প্রধান গোনাহ হলো হত্যাকান্ড। আত্মহত্যাও সাধারণ হত্যাকান্ডের পর্যায় ভুক্ত কবিরা গুনা সাধারণ হত্যাকান্ড ক্ষমাহীন অপরাধ নয়। অনুতাপ, ক্ষমা ও শাস্তিতে তার প্রতিকার হয়। কিন্তু আত্মহত্যা এমন একটি অপরাধ, যার কোন প্রতিকার নেই। ধন, মান, প্রাণ, ধর্মরক্ষা ও দেশ রক্ষার মত মহৎ কাজেও ইসলাম আত্মহত্যাকে সমর্থন করে না। ইসলামে জেহাদ অর্থ ধর্ম ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম।

এটা যুদ্ধ আর আন্দোলনের নাম। কিন্তু এটা ব্যক্তি ও সংগঠনের আওতাভুক্ত বিষয় নয়। এটা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন বিষয়। ইসলামী রাষ্ট্রের আদেশ ছাড়া কোন যুদ্ধ ও আন্দোলনই জেহাদ পদবাচ্য হয় না। এমনি যেন তেন প্রকারে মৃত্যু বরণ ও আত্মহত্যাতেও শহিদ হওয়া যায় না। ধর্ম, ধন, মান, প্রাণ ও জাতির জন্য প্রাণ দান মাত্রই শাহাদত নয়। একজন মুসলমানের শহিদ হওয়ার শর্ত হলো ঃ তার নিজকে জাতি দেশ ও ইসলামকে অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হতে হবে এবং তার প্রতিকারে ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক তাকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। এ ভিন্ন গাজি বা শহিদ হওয়া যয় না।

সাধারণভাবে ইসলাম যুদ্ধ, হত্যাকান্ড ও দাঙ্গায় অবতীর্ণ হতে বলে না। শাব্দিক অর্থে মুসলমান মানে শান্তিবাদী। তার উচ্চারিত অভিবাদন মূলক শুভেচ্ছা বার্তা, সালাম অর্থ ঃ শান্তি। শান্তিবাদী বলেই মুসলমানরা প্রতিবার নামাজান্তে এই নীতি আদর্শের প্রকাশ ঘটিয়ে ডানে বামে মুখ ফিরিয়ে সবাইকে শুভেচ্ছা জানায় ঃ আস-সালামু-আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহ। এমন সুন্দর শান্তির প্রেকটিস অপর কোন সমাজ ও ধর্মে নেই। এটা একটি প্রশংসনীয় উপাসনা রীতি আচার ও অভ্যাস।

এই নীতি আদর্শের কারণে ইসলাম তার অনুসারীদের আহ্বান করে ঃ হে বিশ্বাসীরা শান্তি ধর্মে পরিপুর্ণ ভাবে নিজে প্রবিষ্ট হও। এ ব্যাপারে দলাদলি ও মত ভিন্নতায় লিপ্ত হয়ো না, যথাঃ 'ইয়া আইয়ু হাল লাজিনা আমানু উদখুলু ফিস সিলমি কাফফা ওলা তাফাররাকু' (আল কোরান)।

ইসলাম শান্তি-শৃঙ্খলাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয় এবং তার অনুসারীদের এর পক্ষে উদ্বুদ্ধ করে, যথা ঃ

ক) 'লা-তাক-তুলুন-নাফসাল-লাতি-হাররা মাল্লাহ।' (আল কোরান)

বাংলা ঃ এমন কাউকে হত্যা করো না, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন (আল-কোরান)।

খ) 'মান-কাতালা-নাফসান বি গায়রি -নাফসিন-আও-ফাসাদিন-ফিল-আরধি-ফাকা-আন্নামা-কাতাল্বান-নাসা জামিয়ান ও মান আহ-ই-য়াহা, ফাকাদ-আহইয়াহান-নাসা-জামিয়া।' (আল কোরান)

বাংলা ঃ মৃত্যু দন্ডব্যতীত যে বিনা অপরাধে কাউকে হত্যা করলো, সে যেন মানব জাতিকেই হত্যা করলো,আর যে কাউকে মৃত্যু থেকে বাঁচালো, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই নিশ্চিত রূপে বাঁচালো (আল-কোরান)।

গ) 'মান কাতালা মুসলিমান মুতায়াম্মিদান, ফা জাঝা উহু জাহান্নাম, খালিদিনা ফিহা' (আল কোরান)

বাংলা ঃ কেউ যদি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত ভাবে খুন করে, তা হলে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে চিরকাল থাকবে (আল-কোরান)।

এই খোদায়ী দিক নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা ভাবাই যায় না যে, ইসলাম জঙ্গী

ও সন্ত্রাসী ধর্ম, তাতে হত্যাকান্ড অনুমোদিত। জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস শান্তি-শৃঙ্খলা বিরোধী দুস্কর্ম, যা ইসলামী নীতিবাদ বিরোধী কবিরা গোনাহের কাজ। এ কাজ ইসলামী দৃষ্টিতে জেহাদ নয়। তাতে অংশ গ্রহণ মহা অপরাধ। এই নাজায়েজ কাজে আত্মহনন ও নিকৃষ্ট পাপাচার। কোন ব্যক্তি বা দল জেহাদ করার অধিকারী নয় আল-কোরানে আল্লাহ্ আরো আদেশ করেন ঃ

ঘ) তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি নিশ্চয়ই দয়ালু। তবে যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি ও জুলুমের মাধ্যমে তা (আত্মহনন) করবে তাকে আমি আগুনে পোড়াবো। (সুরা নিসা আয়াত ২৯-৩০)।

ঙ) আল্লাহ্ প্রত্যেক প্রাণসত্তাকে সম্মানিত করেছেন। বিনা অধিকারে তাকে কেউ বধ করবেনা এবং ব্যাভিচারও করবে না। যে এটা করবে, সে তার শাস্তি পাবে। (সূরা আল ফোরকান, আয়াত ৬৮)।

চ) আল্লাহ অরাজকতাকে পছন্দ করেন না। (সুরা বাকারা আয়াত ২৫)।

এই সাথে একটি হাদিস, স্মারণীয়। নবী করিম বলেছেন ঃ কোন অমুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যাকারী ব্যক্তি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। তিনি আরো বলেছেন ঃ হাশরের দিন সর্বপ্রথম হত্যাকান্ডেরই বিচার শুরু হবে।

সুতরাং ইসলামের বিরুদ্ধে এ বলা ভুল যে, তাতে হত্যাকান্ড অনুমোদিত, এবং তদ্বারা বেহেশত লাভ অবধারিত। ইসলাম প্রচার বা ইসলাম কায়েমে জবরদস্তি বা হানাহানি সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ। আল-কোরআনে আল্লাহ তজ্জন্য সাবধান করে দিয়ে বলেছেন ; 'লা ইকরাহা ফি দ্দীন'-ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ী নয়। ধর্মে ধর্মে ও জাতিতে জাতিতে শান্তিপুর্ণ সহাবস্থান নির্দেশ করে আল্লাহই বলে দিয়েছেনঃ 'লাকুম দীনুকুম ও লিয়া দীন'-তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার। সুতরাং ধর্মের নামে স্বেচ্ছাচারী বাড়াবাড়ি সন্ত্রাস ও জঙ্গী আচরণ ইসলাম অনুমোদিত বা নির্দেশিত, এটা ভ্রান্তিপুর্ণ ধারণা। এর দ্বারা বেহেশত লাভের আশা বৃথা। এই ভ্রান্ত ধারণা ইসলামকে কলুষিত করছে, এবং আত্মঘাতীদেরও জাহান্নাম বাস নিশ্চিত। এই ঘাতক সন্ত্রাসীরা কবিরা গোনাহে লিপ্ত, তাতে কেন সন্দেহ্ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো নিশ্চিত কোন মহৎ বা ছোয়াবের কাজ নয়। বেহেশতের প্রলোভনে সন্ত্রাস ও বোমাবাজি নিঃসন্দেহে একটি ধর্মীয় প্রতারনা। এই সন্ত্রাস ও বোমাবাজির সংগঠকরা, কোন শ্রদ্ধেয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব নয়। তারা মতলববাজ ধর্ম বেপারী। ইসলাম সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ। কেবল লেবাস ও দাড়িতেই আলিম হওয়া যায় না। তারা চটকদার কথাবার্তার ফাঁদে ফেলে নিরীহ ইসলাম ভক্তদের বেদীনী গোনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করছে। এর আড়ালে তারা রাজনৈতিক সওদাবাজিতে লিপ্ত। ধর্মীয় ছত্র-ছায়ায় অবস্থান করে, কিছু রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহল, দেশে দেশে অরাজকতা ও স্বশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতেই উদগ্রীব বলে মনে হয়।

কালের বিবর্তন হেতু ধর্মীয় বিধি-বিধান আচার আচরণ ভাষা নাম ও নৈতিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আরবী ইসলামের ধর্মীয় ভাষা। আগে হিব্রু ভাষাই এই

পরিচয় ধারণ করতো। হিন্দুদের ধর্মীয় ভাষা সংস্কৃত, এবং বৌদ্ধদের পালি। খৃষ্টানরা তাদের ধর্মগ্রন্থ লেটিন ভাষায় রূপান্তরিত করে নিলেও, তা এখনো হিব্রু প্রভাবিত আছে।

হিব্রু ভাষায় সৃষ্টিকর্তা মহাপ্রভু ইসর নামে অভিহিত। সংস্কৃতে তিনি ঈশ্বর। এই সাদৃশ্যে মনে হয় ঃ উভয় শব্দ অভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভুত। আগে ইসরই ছিলো ইসলামী পরিভাষা। পূর্ববর্তী বহু নবী রসুল ছিলেন হিব্রু ভাষী বনি ইসরাইলভুক্ত লোক। তারা নিজ নিজ ভাষা হিব্রতেই ওহি বা খোদায়ী অধ্যাদেশ লাভ করেছেন এবং সে ধর্মীয় পুস্তকাদিতে আল্লাহ ইসর নামেই অভিহিত হয়েছেন। সে আমলের খোদা প্রদত্ত প্রধান ধর্মীয় পুস্তক তাওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল এই সত্যই ধারণ করে। ঐ পুস্তকগুলোতে ব্যক্ত ধর্ম, মুসলমানদের দাবী অনুযায়ী প্রচীন ইসলাম বলে অভিহিত হলেও, আধুনিক চাহিদা নীতি ও আদর্শের বিচারে এখন আর তা যুগোপযোগী নয়। খৃষ্টবাদ ও এহুদীবাদে ইসলামের মত বিশুদ্ধ একত্ববাদ ও আরাধনা পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। এটা ভাবা স্বাভাবিক যে, ভাষা আচার-আচরণ পরিবেশ ইত্যাদির মত ধর্মীয় মতবাদ আর করণীয় সমূহের ক্ষেত্রেও চাহিদা মত পরিবর্তন ঘটেছে। অধিকন্তু কালের বিস্মৃতি ও বিবর্তন অনেক কিছুকেই গ্রাস করেও নিয়েছে। তাই প্রাচীন ধর্ম ও পুস্তকাদির হুবহু আসলরূপ থাকা সম্ভব নয়। হজরত মোহাম্মদ (ছল্লাল্লাহ) আধুনিক ধর্ম প্রচারক। তার জন্ম ও জীবন কাল আধুনিক ঐতিহাসিক কালকে ধারণ করে আছে। তার কালের প্রতিটি কাজ আচার অনুষ্ঠান ঘটনা ও রচনা, বর্তমান কাল পর্যন্ত হুবহু আসল রূপে বিদ্যমান। তাতে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিস্মৃতি ঘটেনি। হাদিস ও কোরান আদি ও আসল বিশুদ্ধ রূপ বজায় রেখে এখনো বিরাজমান। পূর্ববর্তী ধর্ম ও ধর্মীয় পুস্তকাদির ক্ষেত্রে এই বিশুদ্ধতার দাবী করা অবান্তর। তা এখন খাঁটি একাত্মবাদী নয়। মাতা মেরি, পুত্র যিশু আর পিতা গড মিলে এখন খৃষ্ট ধর্মের ত্রিত্ববাদ প্রচলিত। ইসলামের বিচারে এটা শিরিক বা মিশ্র প্রভুত্ববাদ। সুতরাং এটা আর ইসলাম পদবাচ্য খোদায়ী ধর্ম নয়। তখনকার ধর্মপুস্তক, তাওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল, যা আজকাল বাইবেল আকারে সংকলিত,তাতে ব্যাপক পরিবর্তন পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিস্মৃতি ঘটেছে। সে সব আসল খাঁটি রূপে সংরক্ষিত নেই। সেই আদি হিব্রু ভাষাও বিলুপ্ত। সুতরাং আদি অকৃত্রিম খৃষ্টবাদ ও এহুদীবাদ এবং তার ধর্মীয় বিধি বিধানের অবশিষ্ট থাকা অসম্ভব। এখন যা আছে তা কৃত্রিম। ঐ ধর্ম সমাজ সমূহ খাঁটি একত্মবাদ ধারণ করে না। শরিয়ত মতে মুশরিক ও পৌত্তলিক সমাজে বিয়ে শাদি নাজায়েজ ও তাদের জবাইকৃত পশু পাখি হারাম। এখন তাদের মাঝে মোটেও একত্ববাদ অবশিষ্ট নেই বলেই খৃস্টান এহুদী ও অন্যান্যরা আর মুসলমানদের ভ্রাতৃ সমাজও নয়।

হিন্দুবাদ পৌত্তলিকতার ধারক। এ সমাজ বহুত্ববাদে বিশ্বাসী। তাই তারা শরিয়ত অনুযায়ী মুশরিক। মুসলমানদের জন্য তাদের জবাইকৃত পশু পাশি হারাম। তাদের সাথে বিয়ে শাদি ও না জায়েজ। তবে দাবী করা হয় তাদের ব্রাহ্মী সমাজীরা

একেশ্বরবাদী। তারা পৌত্তলিকতা থেকে মুক্ত বলে প্রমাণিত হলে, শরিয়তের নিষিদ্ধ সমাজ থেকে বাদ পড়ে মুসলমানদের মিত্র সমাজ রূপে গণ্য হবেন। আরেক মিত্র সমাজের যোগ্যতা রাখে বৌদ্ধরা। তাদের ধর্মীয় ও পঞ্চশীল নীতি হুবহু ইসলামী নীতিরই বহিরপ্রকাশ। জীব হত্যা, মিথ্যাচার, চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার ও মাদকাসক্তি ইসলাম ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্মেই নিষিদ্ধ মহাপাপ। তবে অসঙ্গতি হলো বুদ্ধ পূজা, যা খানেক পৌত্তলিকতাই বটে এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতা, ঈমানী ব্যতিক্রম। হ্যাঁ বৌদ্ধ বাদী পঞ্চশীল নীতি খোদায়ী ইসলামী নীতির সাথে হুবহু সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় ভাবা যায়, এটা মূলতঃ খোদায়ী ধর্মই বটে। প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীনতার কারণে তাতে অসঙ্গতিগুলো ঘটে গেছে। গৌতম বুদ্ধের নাম ও পরিচয় সংস্কৃত ভাষিক। কোরান হাদিস ও বাইবেলে, গৌতম নামের সাথে সঙ্গতিশীল কোন ধর্মীয় পুরুষের নাম উল্লেখিত নেই। তবে নীতিগত সঙ্গতির কারণে এই সূত্রে তাকে অন্যতম নবীর মর্যাদা দেয়া যায়। নবী মানলে তাকে একত্ববাদী বলেও স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। আল্লাহ বলেন 'লি কুল্লি কৌমিন হাদম্ব (আল-কোরান) অর্থাৎ প্রত্যেক কৌমেই নবী ছিলেন। প্রাচীন সভ্য দেশ ভারতেও তাই নবী রসুলের আবির্ভাব হয়ে থাকবে। গৌতম ভারতের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় মহাপুরুষ হওয়ায়ও ইসলামের সাথে তাঁর প্রচারিত ধর্মের সঙ্গতি থাকায় নবীর তালিকা থেকে তাকে বাদ দেয়া যায় না। ধর্মীয় সংখ্যাতত্ব অনুযায়ী নবীর সংখ্যা কয়েক লাখ। অথচ হাদিস কোরান ও বাইবেলে তাদের বৃহদাংশই নামে উল্লেখিত নেই।

মুসলমানদের ধর্মীয় শপথ অনুযায়ী সব ঐশী ধর্মীয় কেতাব বা গ্রন্থ, এবং সব নবী রসুলদের উপর বিশ্বাস স্থাপন ফরজ। সুতরাং নামে অচিহ্নিত সাবেক নবী রসুল ও তাদের প্রাপ্ত কেতাবগুলোকে সত্য জানা মুসলমানদের ঈমানী কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও জানার দায়িত্ব অবশ্যই আছে। অনির্দিষ্ট হলেও ঐ নবী রসুল ও কেতাবগুলো বিশ্বাসের বিষয়ভুক্ত অবশ্যই।

মুসলমানদের মহানায়ক হযরত মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু) কে আল্লাহ বিশ্বজগতের করুণা বলে অখ্যায়িত করেছেন, যথা ঃ 'অমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুললিল আলামিন' (আল কোরান) এবং মুসলমানদেরও আল্লাহ এভাবে মুল্যায়িত করেছেন 'কুনতুম খায়রা উম্মাতিন, উখরিজাত লিন নাসি, তামুরুনা বিল মারুফ ও তানহাওনা আনিল মুনকার।' (আল কোরান)।

বাংলা ঃ তোমরা এক উত্তম জাতি, মানব জাতির সেবার উদ্দেশ্যে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা কল্যাণ ও উপকারের পথ নির্দেশ করবে এবং মন্দ থেকে লোকদের বিরত রাখবে। এই খোদায়ী মুল্যায়নের আলোকে মুসলমানদের কঠোর ও নিষ্ঠুর হওয়ার অবকাশ নেই। জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস গঠনমূলক ও কল্যাণকর কিছু নয়। এগুলো অপরাধমূলক দুষ্কর্ম। এ সবের সাথে মুসলমানদের সংশ্রব থাকা ধর্মতঃ নিষিদ্ধ।

নৈতিকতা বিরোধী হলেও অনেকে জঙ্গী কার্যক্রম ও সন্ত্রাসে সক্রিয়। তার কারণ রাজনৈতিক। বহুদিন থেকেই দেশে চরমপন্থী সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের প্রকাশ্য চর্চা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম চলছে। এদের একদল নিজেদের প্রকাশ্যেই পরিচয় দিচ্ছে, বামপন্থী জনযুদ্ধ গ্রুপ নামে। প্রতিটি প্রধান রাজনৈতিক দল পোষন করছে সশস্ত্র কেডার বাহিনী। পার্বত্য চট্টগ্রামেও সশস্ত্র উপজাতীয় কেডারদের ব্যাপক ছড়াছড়ি। এই সবাই মিলে দুর্মূস বাহিনীর সংখ্যাই কেবল বাড়ছে এবং অরাকতা বিস্তৃত হচ্ছে। সবাই দেখাচ্ছে নিজেদের কার্যক্রমের পক্ষে অকাট্য যুক্তি।

জনযুদ্ধ কেডাররা সর্বহারা রাজ গঠনে প্রতিশ্রুত। শ্রেণী শত্রু খতম ও বুজুর্য়া সরকার হটাও তাদের লক্ষ্য। এদের কেডাররা, দলীয় আধিপত্য কায়েমে সঙ্কল্প বদ্ধ। মোল্লা বেশধারী কিছু স্বার্থান্বেষী লোক, এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে, ইসলামের নামে আরেক দল কেডার সৃষ্টির মাধ্যমে, দেশ দখলে এগিয়ে এসেছে। এদের যৌক্তিক অস্ত্রঃ আধুনিক সরকার রাষ্ট্র ও সমাজে মনগড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা। মাঝখানে নিরীহ জনসাধারণ আর আলিম সমাজ হতভম্ব। রাজনৈতিক ছত্রছায়া ও মুরব্বী ছাড়া বাঁচা দায়। এই পরিস্থিতিতে শত্রু মিত্র নির্ধারণ কঠিন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতীয় জঙ্গিরা ঐ অঞ্চলে তাদের আধিপত্য আর নিজস্ব শাসন প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। সরকার জাতীয় ভিত্তিতে শান্তির লক্ষ্যে আলোচনার প্রস্তাব রেখেছেন। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এর প্রতি আগ্রহী। এতে সফল হতে হলে সংশ্লিষ্টদের নিরস্ত্র আর নিঃস্বার্থ হতে হবে। নিজেদের মধ্যে অস্ত্রবাজ রেখে আর নীতি ধর্ম অমান্য করে, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন সম্ভব নয়।

এটা নৈতিক কথা যে, শান্তি–শৃঙ্খলা স্থাপনই সরকারের প্রধান দায়িত্ব। কেবল জেল, জুলুম, ও নিপীড়ন সরকারের সাফল্য নিশ্চিত করতে পারে না। সরকারের নির্দেশে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী দমনে র‍্যাব সহ শান্তিরক্ষীরা বহু অপ্রিয় কঠোরতা অবলম্বন করছে। কিন্তু সন্ত্রাস ও হানাহানি নির্মূল হচ্ছে না। ঘাতকদের নতুন কৌশল হলো আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার সমাজবাদ ও ধর্মের আশ্রয়ে নতুনভাবে সংগঠিত হওয়া। তাতে তারা সাফল্য লাভের আশায় সক্রিয়। প্রচুর অর্থ-অস্ত্র ও জানবাজ লোক তাদের করায়ত্ত আছে। এই পরিস্থিতিতে শান্তিবাদীদেরও কৌশল বদলাতেও সংগঠিত হতে হবে। র‍্যাবসহ শান্তি রক্ষীরা ব্যর্থ। দলীয় কেডার বাহিনী সন্ত্রাসীদেরই নামান্তর। এখন দরকার ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নতুন শান্তি উদ্যোগ গ্রহণ।

শান্তি সার্বজনিনভাবে আকাঙ্খিত। তবু তা সহজ প্রাপ্য নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে শান্তি স্থাপন সম্ভব কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে সম্পুর্ণ আস্থার সাথে বলা যায়, বিষয়টি দুসাধ্য নয়। অব্যাহত বিরূপ পরিস্থিতির শিকার ও হতাশাগ্রস্ত অনেকের কাছে,শান্তি দুষ্প্রাপ্য ও দুরূহ মনে হবে, কিন্তু তাতেও আশাহত হওয়া ঠিক নয়। ভুল ত্রুটি স্বীকার ও সদিচ্ছার বশবর্তী হলে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহজ আর নমনীয়

করে তোলা সম্ভব। এতদাঞ্চলীয় রাজনৈতিক সংকট অসমাধ্য নয়। তাই আন্তরিকতার সাথেই সংকটের সমাধান ও শান্তির কামনা করা চাই। সংশ্লিষ্ট সবাই সমাধান ও শান্তির জন্য উদগ্রীব হলে, অসাধ্য সাধন সম্ভব। শুধু আগ্রহ আর সদিচ্ছা থাকাই যথেষ্ট নয়। সক্রিয় উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রথমেই যুক্তির মাধ্যমে জনমত গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। পক্ষ-বিপক্ষের কাছে ব্যাপক ভাবে যুক্তি তুলে ধরা দরকার। অনুকুল আগ্রহ সৃষ্টি ও আস্থা অর্জনের এই অব্যাহত প্রক্রিয়ায়, প্রতিকুলতার বাধ্য, ক্রমান্বয়ে শিথিল হতে বাধ। এভাবে একটি অনুকুল ও আস্থাশীল পরিবেশ রচনা সম্ভব। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ একত্রিত হলে, এই শান্তি আন্দোলন অধিক জোরদার হবে। পূর্ব নির্ধারিত বিরূপ ধারণা ঝেড়ে মুছে, ভুল ক্রটি স্বীকার করে নতুন উদার দৃষ্টি ভঙ্গীতে, মন ও মেজাজকে প্রস্তুত করা না গেলে, উদ্যোগ গতিশীল হবে না। উদার ভাবে ভেবে দেখতে হবে, সংকটের গতি প্রকৃতি কী এবং তার দায় ভাগ পক্ষে বিপক্ষে কার কতটুকু ? শুধুই বিপক্ষের উপর দোষারোপ ও নতি স্বীকার না করার স্বপক্ষীয় একগোয়েমী, মীমাংসার পক্ষে অন্তরায় বিষয়। শান্তির অন্বেষায় স্বপক্ষীয় যুক্তির সমাবেশ ঘটান আবশ্যক। খোঁজে দেখা দরকার মিল আর অমিলের কারণ কী? অমিল গুলোকে ঘষা মাজার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। রাজনৈতিক অমিল আর সংকট, দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যম ছাড়া সহসা মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। তাই ব্যর্থতায় হতাশ হলে হবে না। হতাশায় চরম সিদ্ধান্ত নেওয়াও অনুচিত। জাতীয় আকাঙ্খার সাথে সঙ্গতি বিধানের মাধ্যমে গ্রহণ বর্জনের দ্বারা আঞ্চলিক আকাঙ্খা পুরণকে সম্ভব করে তুলতে হবে। তখন মীমংসা সুদুর পরাহত থাকবে না।

এ যাবৎ দুই প্রতি পক্ষ বহু রক্তপাত ঘটিয়েছেন। উভয় পক্ষে বহু ভুল ক্রটি হয়েছে। হিংসায়, বিভেদে, সারা পর্বতাঞ্চল নরক কুণ্ডে পরিণত। মানবিক মূল্য বোধ ও দরদ নির্বাসিত। বাঙ্গালী পাহাড়ী সাধারণ লোকের অগণিত জান মাল ও ইজ্জত খোয়া গেছে। অব্যাহত হিংসা ও বিভেদের দ্বারা সমস্যার সমাধান হয়নি। উভয় পক্ষে ক্ষয়ক্ষতি আর দুঃখই বেড়েছে। এবার সে ব্যর্থতাকে অবলম্বন করে তার কার্য কারণ খুঁজে দেখতে হবে। তাতে নিশ্চিত হওয়া যাবে ঃ হিংসা ও বিভেদে শান্তি নেই। অস্ত্র কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না। তাতে শুধু ক্ষয়ক্ষতি বাড়ে।

পর্বতবাসী জনসাধারণ ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাই, মনে প্রাণে শান্তিপুর্ণ এমন পরিবেশ কামনা করে, যেখানে পারস্পরিক সংঘাত ও সংঘর্ষ নেই, নেই কোন ও অসদ্বাব। সন্দেহ প্রবনতার দ্বারা কেউ কাউকে শত্রু মূল্যায়ন করে না। নির্দ্বিধায় সর্বত্র যাতায়াত, বসবাস ও জীবন-যাপন করা যায়। পেশা ও ব্যবসা, বাধা বিপত্তি, বাধা নিষেধ, তালাসি, তদন্ত , ভয় ও নিরাপত্তার কড়াকড়ি থেকে মুক্ত। জীবন-যাপন ও জীবিকার তৎপরতা প্রতিবন্ধকায় আবদ্ধ নয়। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি গুলো বাস্তবে পারস্পরিক হিংসা ও সংঘর্ষেরই ফল।

মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করে জন কল্যাণ হয় না। সাময়িক বাধ্য বিপত্তি এ দুর্দশা সহ্য হয়। কিন্তু স্থায়ী উপদ্রবকে কখনই মান্য করা যায় না। অধিকার আদায়ের নামে স্থায়ীভাবে হানাহানিতে আবদ্ধ থাকা রাজনীতি হতে পারে না। সারাক্ষণ দৈনন্দিন জীবনকে বিপন্ন রাখা, আর চলমানতাকে স্তব্ধ করে দেয়া, মহা বিরক্তিকর। মানুষের নামে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বা যুদ্ধে, সে মানুষই উপদ্রুত আর জিম্মি হলে, তা অকাঙ্খিত থাকে না। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম বা যুদ্ধ গণ মানুষের দুর্ভোগ বৃদ্ধি করে। তাই তারা সে সংগ্রাম বা যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ এই পর্যায়ে উপনীত। এখন হিংসার অবসান ও সংঘাতের বিরতি দরকার। আজ মানবতার নামে অস্ত্রধারীদের প্রতি দোহাই ঃ দয়া করে আপনারা বিরত হোন। দীর্ঘ স্থায়ী উপদ্রবে মানুষ অতিষ্ঠ।

অস্ত্রে নয় মুখোমুখি আলোচনায় মীমাংসা সম্ভব। জাতীয় রাজনৈতিক আকাঙ্খার সাথে পর্বতবাসী সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক আকাঙ্খার সমন্বয় সাধন দুঃসাধ্য নয়। উভয় পক্ষ বাস্তবতার নিরিখে নমনীয় হলে, সমঝোতা অবশ্যম্ভাবী। অস্ত্র আড়ালে রেখে, মিলিটারী মিজাজে শান্তির সন্ধান, অপপ্রয়াস মাত্র। রাজনৈতিক অঙ্গনে, গ্রহণ বর্জন নমনীয়তা ও ছাড় দেওয়ার মাঝেও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা কঠিন কাজ নয়। রাজনীতি কঠিন ও ভঙ্গুর নয়-নমনীয়। বিপক্ষদের ভেবে দেখা দরকার, বাঙ্গালীদের সহ্য করতে না পারা ও তাদের অধিকার অস্বীকার করা বাস্তব সম্মত কাজ নয়। সারা দেশে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। সমুদয় জন সংখ্যার ৯৯% তারাই। দেশের সীমান্তে অবস্থিত এই পার্বত্য অঞ্চলে অবাঙ্গালী সংখ্যা লঘুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে মিলে যৌগিকভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ হলেও সারা দেশের বাঙ্গালীদের তুলনায় তারা এক শতাংশের অর্ধেক মাত্র। স্থানীয়ভাবেও বাঙ্গালীরা একক প্রধান সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে গেছে। রাষ্ট্র ক্ষমতা তাদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল। তাদের কয়েক কোটি লোক ভূমিহীন। উক্ত ভাসমান লোকের স্রোত ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব। নগরী গুলো তাদের দ্বারা ভারাক্রান্ত। সারা দেশের পথ ঘাট, হাটবাজার, মাঠ ময়দান তাদের দ্বারা প্লাবিত। কোন আইন ও বাধা নিষেধের দ্বারা এই জনস্রোতকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব। এটি তাদের জন্মস্থান ও স্বদেশভূমি। এদেশে তাদের ভৌমিক অধিকার প্রাপ্য। ভূমিহীনদের ভৌমিক অধিকার নির্দিষ্ট না হলেও তা নীতিগতভাবে সারাদেশ ব্যাপ্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামকেও তাদের উপদ্রব সইতে হবে, এটা অভিন্নভাবে সারা দেশের নিয়তি। তবে অবাধ বাঙ্গালী জনস্রোত সম্ভব পর্যায়ে ঠেকিয়ে রাখা আবশ্যক। নতুবা স্থানীয় সংখ্যা লঘুদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে।

হত্যা, লুটতরাজ ও অগ্নি সংযোগের দ্বারা এতদাঞ্চলকে বাঙ্গালী মুক্ত রাখা যাই নাই যাবে ও না। ঘন ঘন তুফান ও জলোচ্ছাসের দ্বারা লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী নিহত হলেও বঙ্গোপসাগরের দ্বীপাঞ্চল বাঙ্গালী মুক্ত হয়নি। বৃটিশ আমল থেকে বাঙ্গাল খেদা আন্দোলন নৃশংসভাবে পরিচালিত হলেও আসামে এখনো বাঙ্গালী টিকে আছে। আরাকানের বাঙ্গালীরা সে দেশে বহু নৃশংসতার শিকার হলেও সেখান থেকে উৎখাত

হয়নি। জন্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে বছরে অন্তত পঁচিশ লক্ষাধিক বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে। স্বদেশভূমির একাংশে ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীয় লোকের দ্বারা তাদের রক্তপাত, সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, এবং তাদের সংখ্যা তদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াও অসম্ভব। হিংসা প্রতিহিংসারই জন্ম দিবে। দেখাদেখি বাঙ্গালীদেরও অস্ত্র বাজিতে অভ্যস্ত হওয়া অসম্ভব নয়। তারা আত্মরক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনে তাই করতে বাধ্য হবে। তখন হানাহানির পরিবেশে, বাঙ্গালী আরেক বাঙ্গালীরা দ্বারা এবং অবাঙ্গালী লোকজন তাদের আপনজনদের হাতে নিগৃহীত হবে। সুতরাং সেই সম্ভাব্য অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে আগে ভাগেই শামাল দেয়া দরকার। আর যেন কোন বাহিনী না বাড়ে সেই প্রয়োজনে প্রচলিত বাহিনী গুলোকে নিজ থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। এই ধারণা বাস্তব সম্মত নয় যে, কারো দাবী বা অস্ত্রের মুখে সরকারী বাহিনী গুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে। তাদের দায়িত্ব চিরাচরিত দেশ রক্ষা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান। এখানে বহুল সংখ্যায় বাঙ্গালীর থাকা ও প্রতিরক্ষার অংশ। সুতরাং এই অপ্রিয় বাস্তবতাকে অস্বীকার করা সম্পুর্ণ ভুল।

এটা ভাবা ও সঠিক নয় যে, অবাঙ্গালীদের দাবী দাওয়া সবই অন্যায়। সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে তাদের এ আশংকা থাকা স্বাভাবিক যে, রেড ইন্ডিয়ান, পাপুয়ান ও অন্যান্য আদিবাসীদের মত তাদের অস্তিত্ব সংখ্যাগুরুদের হাতে হুমকীর সম্মুখীন। তাদের এই আশংকা ও সন্দেহের প্রতিকারে আস্থাসূচক রক্ষা কবচ দেয়া ছাড়া শুধু আশ্বাস আর ওয়াদা প্রদান যথেষ্ট নয়। বাঙ্গালী নিয়ন্ত্রণ নয়, উপজাতীয় অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই মূল বিষয়। তা না হলে, বহিরাঞ্চলে থেকেও তাদের ক্ষতি করা যাবে। স্বায়ত্তশাসনের দাবী অসমাধ্য নয়। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে জাতি একমত হলে সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা করা যাবে। এটি জাতীয় সম্মতি সাপেক্ষ ব্যাপায়। এজন্যে রক্তপাত নিরর্থক। সংবিধান সম্মত নয় তাই বলে স্বায়ত্তশাসনের দাবী অন্যায় নয়। স্বায়ত্তশাসন দিলেও তাতে বাঙ্গালীরা বৃহৎ অংশীদার হয়ে থাবে, এবং এখানকার শান্তি-শৃঙ্খলা অখণ্ডতা রক্ষা থেকে সরকারী বাহিনী গুলো নিষ্ক্রান্ত হবে না। স্বায়ত্তশাসনের অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, বিদ্রোহীদের হাতে সব নিয়ন্ত্রণভার ছেড়ে দেয়া এবং বাঙ্গালীদের তাড়িয়ে দিয়ে পর্বতাঞ্চলকে এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিচ্ছিন্ন করে যাওয়া।

স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা ও ব্যাখ্যায় এখনো এমন গুরুতর কিছু উত্থাপিত হয় নি, যা মঞ্জুর করা বিপর্যয় ও দুশ্চিতার বিষয়। আপাততঃ উত্থাপিত বিরোধীয় বিষয় গুলোর ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত আলোচনা হতে পারে, যদ্বারা উভয় পক্ষ নীতিগতভাবে আশ্বস্ত বোধ করতে পারেন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প করে গ্রহণ করা যায়। তবে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এর পক্ষে বিপক্ষে সমঝোতা রচনায় জনমত যাচাই হতে পারে। সে পর্যন্ত রাজনৈতিক বিতর্কটি স্থগিত থাকুক। তবে জনমত যাচাইকে সরকারী ও বেসরকারী চাপ মুক্ত রাখতে হবে। সরকারী ও বেসরকারী বাহিনীগুলো এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় আর নিরপেক্ষ থাকলে যথাযথভাবে

জনমত প্রতিফলিত হবে। সরকারী বাহিনীগুলোর কার্যতঃ এ ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই। বাহিনী মুক্ত পরিবেশে একমাত্র প্রাইভেট বাহিনীগুলোকেই ভয়। তবে তাদের নিরস্ত্র তৎপরতা ক্ষতিকর নয়। দেশের সাধারণ বাসিন্দা হিসাবে বেসমারিক পর্যায়ে সবারই জনমত গঠনে ভূমিকা রাখার অধিকার স্বীকার্য। বলা যায় স্থানীয় সরকার বা জেলা পরিষদ আইন এমনিতেই সংবিধান বিরোধী। সুপ্রীম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হলে তার টিকে থাকা হবে কঠিন। কারণ সংবিধানে সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণবাদী নির্বাচন ব্যবস্থা অনুমোদিত নয়। সম্প্রদায় ভেদে সুযোগ-সুবিধার তারতম্য তাতে স্বীকৃত নয়। অথচ স্থানীয় জেলা পরিষদ আইনে বাঙ্গালীদের পক্ষে চেয়ারম্যান হওয়া নিষিদ্ধ, এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের বাহিরে বৈষম্য আরোপিত হয়েছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাইভেট বাহিনীগুলোকে মানা যায় না। তবে এ সংগঠনগুলো বেআইনী অস্ত্রবাজ হলেও নিজেদের সমাজ স্বজন ও জন্মস্থানের স্বার্থের পক্ষে উদ্বুদ্ধ। বিরোধীতার প্রশ্নে তাদের সাথে সমঝোতা সম্ভব হলে তারা স্বদেশ ও স্বজাতির পক্ষে সাহসী ভূমিকা রাখতে পারে। তখন তাদেরকে যোগ্যতানুসারে সরকারী বাহিনী গুলোতে আত্মস্থ করাও যাবে। জনসংহতি সমিতি ও ইউপিডি এফ নেতাদের স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক পদে মনোনীত করে তাদের সেবা গ্রহণ করা সম্ভব। ওদের পুনর্বাসনের সম্মানজক ব্যবস্থা এটাই হতে পারে।

৫। শান্তি ও সহিষ্ণুতা

দীর্ঘদিন যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত। এখানে উত্তাপ উত্তেজনা আর আতঙ্ক ছাড়া শান্তি প্রায় দুর্লভ। যাতায়াত, বসবাস, পেশা, ব্যবসা ইত্যাদি কিছুই নিরুপদ্রব নয়। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী প্রত্যেকেরই জীবন ও জীবিকা প্রায় বিপন্ন। প্রত্যেকেই পরস্পরকে গা বাঁচিয়ে চলে। যেন তারা একে অন্যের অঘোষিত শত্রু, কেউ কারো কাছে নিরাপদ নয়। পারোত পক্ষে কেউ কারো কাবুতে যেতে অনিচ্ছুক। পরস্পরের প্রতি ভীতি আর অবিশ্বাস, অন্তরের গভীরে প্রথিত। রোজকার দুশ্চিন্তার বিষয় না হলেও কোথা ও শান্তি ও স্থিতির পরিবেশ বিরাজিত নেই। এই পরিস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক। হিংসা আর বিভেদের মনোভাবকে, এই পরিস্থিতিটাই লালন করছে। এটা অবাঞ্ছিত।

না চাইলেও বিরূপ পরিস্থিতি সবাইকে গ্রাস করছে। মানুষের অহিংস শান্তির কামনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। চীৎকার সহকারে সবাই শান্তির কামনা জানাতে চায় । ভুলের খেসারত আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। বিবেক-বোধ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। আদিম বর্বরতা, উন্নয়ন ও সভ্যতার বাহন হতে পারে না। আমাদের এই দুর্বহ আকাঙ্খা পূরণ হবার নয়। এক দেশ ও জাতির গর্বিত সন্তানদের পরস্পরের সাথে হিংসা ও বিভেধে লিপ্ত থাকা অনুচিত। এই বিরূপতা ভুলে যেতে হবে।

শান্তিপুর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতিকে প্রতিবেশীত্বের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা ছাড়া জীবন ও জীবিকা স্বাভাবিক হবে না।

সুধী ও সাধু জনেরা নিরূপদ্রব জীবন কামনা করেন। নিরিহ সাধারণ লোকজন উপদ্রবকে ঘৃণা করেন। আমাদের নতুন প্রজন্মের অবুঝ সদস্যরা তাদের বেড়ে উঠা ও গড়ে উঠার জন্য চায় সুস্থ শান্ত পরিবেশ। আমরা যেন উত্তরাধিকার সুত্রে, এই পরিবেশে, হিংসা ও বিভেদের আবহাওয়া রেখে, ভাবী বংশধরদের তাতে সংক্রমিত হওয়ার সুযোগ রেখে না যাই। অন্যতায় তা হবে মানব জাতির বিরুদ্ধে আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এক মহা অপরাধ।

চিরকাল হিংসা হানাহানি আর বিভেদের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাষ্ট্র শক্তির অধীনে, বিভিন্ন বাহিনী পোষণের প্রয়োজন হয়, তবে তা কখনো কোথাও তিক্ততার উন্মেষও ঘটায়। মূলতঃ সমাজই সে হানাহানি ও তিক্ততার জন্য দায়ী হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে অগণিত প্রাণ হানি, অপরিমিত রক্ত পাত, বিপুল আহতের আহাজারি, অসংখ্য বাড়ীঘর ও সম্পদের বিনাশ, সীমাহীন দুর্দশা, দুর্ভোগ, আর বাস্তুত্যাগ, সহনীয় কাজ নয়। এই অবাঞ্ছিত ধ্বংসযজ্ঞ কোন সাফল্যই বয়ে আনে না। যে সব দাবী দাওয়া আমাদের অনেককে বিক্ষুব্ধ করে, তার সব কিছুই অর্জিতব্য নয়। ব্যর্থতায় শুধু ক্ষোভ ও সংঘাতের অনুশীলনই হচ্ছে। দিনে দিনে বাড়ছে দুঃখ দুর্দশা ও ক্ষতি। এখন সে ব্যর্থতাকে হিসাব করা দরকার। আতকে উঠার মত যথেষ্ট হয়েছে। এবার ক্ষ্যান্ত দেওয়া আবশ্যক। আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিরোধে সীমাহীন মূল্য দেওয়া হয়ে গেছে। জান মাল ও ইজ্জতের এত চড়া মূল্যে রাজনীতির বাজি ধরা অনুচিত। নিশ্চিত বিপুল ক্ষয়-ক্ষতিতে, যোদ্ধমান দুই প্রতিপক্ষের হুশ হওয়া জরুরী। ভুল স্বীকার করা আবশ্যক। আর হিংসা হানাহানি নয়। অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে আলিঙ্গনের মাধ্যমে পরস্পরকে বুকে নিয়ে সর্বাগ্রে পরিবেশকে স্বাভাবিক করে নিতে হবে। অস্ত্র কোন দিনই দুস্প্রাপ্য নয়। সহসাই রক্তপাত ও হানাহানি লাগান যায়। কিন্তু শান্তি ও সুস্থিতি অর্জন বড় কঠিন। উন্নয়ন ও সভ্যতার পক্ষে শান্তি আর সুস্থিতি অপরিহার্য। অস্ত্রের ধ্বংস যজ্ঞে, কিছু গড়ে উঠে না। তদ্বারা অর্জিত হার জিত ও স্থায়ী হয় না। কিন্তু শান্তিতে অর্জিত জ্ঞান ও সম্পদের শক্তি অপ্রতিরোধ্য। তাকে দমান যায় না। আলোচনার টেবিলে বিবেক ও জ্ঞানের জয় অবশ্যম্ভাবী। যা অস্ত্রের দ্বারা অর্জন সম্ভব নয় তা আলোচনার মাধ্যমে লাভ করা যাবে না, সে ব্যর্থতায় পুর্ব-ধারণা পোষণ অনুচিত। আমার দাবী হুবহু পেতে হবে, এরূপ এক গোয়েমীতে ও যুক্তি নিহিত নেই। পেতে হবে, ছাড়তে হবে, জাতীয় আকঙ্খার সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে। মন মানসিকতাকে এরূপ ননমীয় করা ছাড়া কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। এখানে খোয়াবার কিছু নেই। দিবো আর নিবো, মিলবো ও মিলাবো, তফাৎ এতটুকুই মাত্র।

যে বিরোধ ও তফাতের জন্য আমরা ভাইয়েরা আজ পরস্পরের শত্রু, বাস্তবে তার শান্তিপুর্ণ মীমাংসা সম্ভব। ত্যাগ ও লেনদেনের উদার মনোভাবে সমাধান আকাঙ্খিত হলে, সমস্যাটি অসমাধ্য কঠিন হয়ে থাকবেনা। ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত আলাপ

আলোচনা ও ব্যয়িত সময়ের দ্বারা গড়ে উঠা সমঝোতায় বিরোধের পরিধি, অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। সহ্য ধৈর্য্য আর যুক্তিকে কাজে লাগান হলে, আরো সাফল্য অর্জিত হবে এ সম্ভাবনা প্রচুর।

রাজনৈতিক বিরোধাবলী মীমাংসায়, এক গোয়েমী পরিত্যজ্য, এবং অস্ত্রের স্থান চূড়ান্ত পর্যায়ের আগে নয়। আমরা এই উভয় পন্থারই যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি। যুক্তিকে আগে স্থান দিতে হবে এবং এখনো সে সুযোগ ফুরিয়ে যায় নি। তিক্ত অভিজ্ঞতাকে অগ্রযাত্রার পাথেয় করা দরকার।

এখানকার অবাঙ্গালীদের জাতীয়তা রাষ্ট্র ভিত্তিক হওয়াই সঙ্গত এবং আখেরে তাই হয়েছে। বাঙ্গালী জাতীয়তায় তাদের আপত্তি থাকা স্বাভাবিক। সংখ্যাগত স্বল্পতার কারণে কিছু অবহেলা প্রাপ্য বলে, সত্তরের দশকের প্রারম্ভে তাদের উপর যে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী পরিচয় চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো, তার বিপরীতে তাদের প্রচন্ড বিদ্রোহ, সেই অবহেলাকে ভুল প্রমাণিত করেছে। তারা প্রমাণ করেছে সেই অব মুল্যায়ন যথার্থ ছিলো না। হিসাবে সংখ্যালঘু হলেও গোটা দেশের এক দশমাংশ অঞ্চলে তাদের প্রাধান্য বিদ্যমান। তদুপরি এতদাঞ্চল এমন এক নাজুক সীমান্ত অঞ্চল, যার বিপরীতে পরপারে সমজাতীয় জনগোষ্ঠী সংখ্যারিষ্ঠ, যারা স্বভাবতই স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনার অধিকারী, যে চেতনার সঞ্চারণ এ পরে ঘটাও স্বাভাবিক। সুতরাং পরিবেশগত কারণে ও স্থানীয় সংখ্যালঘুরা, এদেশের গুরুত্বপুর্ণ নাগরিক। সারা দেশের মত এতদাঞ্চলকেও বাঙ্গালী প্রধান অঞ্চলে পরিণত করার চেষ্টায় তাদের মাঝে সন্দেহ আর উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এতদাঞ্চলের জনঘনত্ব হালকা হলেও, এর ধারণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা এখানকার প্রাণী জীবন ও প্রকৃতিতে বিপর্যয় দেখা দেয়া সম্ভব। বস্তুতঃ পক্ষে এই পাহাড়ী ভূমির ধারণ ক্ষমতা সমতলের সমান নয়। এর খাড়া ঢাল, সংকীর্ণ খাদ ও সরু চুড়া, বসবাসের পক্ষে প্রতিকুল। বন ও ফল মূলের পক্ষে এটি উপযোগী হলেও প্রধান খাদ্য ধান ও গম উৎপাদনের পক্ষে অনুপোযোগী।এর সংকীর্ণ খাদ ও উপত্যকাই তজ্জন্য ব্যবহারযোগ্য। সুতরাং জনসংখ্যার খাদ্য যোগ্যন ক্ষমতা পাহাড়ী ভূমির অপেক্ষাকৃত কম। কর্ষণ ও সেচ কাজের অসুবিধাও যথেষ্ট। বর্ষা কালের বৃষ্টির পানি একমাত্র অবলম্বন হওয়ার কারণে এর সীমিত কৃষি ভূমিতে এক ফসল মাত্র উৎপাদন সম্ভব। সুতরাং জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেলে, তাদের গৃহ সংস্থান ও ফসলী ভূমির চাহিদা মিটাতে, বন সংকোচনের আবশ্যক দেখা দেবে, তাতে পরিবেশ ক্ষুণ্ন হবে, যে চাহিদা কোন সীমা রেখায় আবদ্ধ নয়। এখানে অনাবাদী পাহাড় ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল মিলে, লোকবসতির অনুপাত সারাদেশের তুলনায় কম, কিন্তু কৃষি ও বসতোপযোগী জায়গার হিসাবে জনবসতি মোটেও হালকা নয়। ভূমির ধারণ ক্ষমতার হিসাব না করে, শুধু ভূমিহীন পুনর্বাসন, আর সাম্প্রদায়িক ভারসাম্যবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজনে, বসতি বৃদ্ধির চেষ্টা করা হলে, স্থানীয়ভাবে জীবিকার সংস্থান কৃষি ভূমি ও বাসস্থানের সংকট দেখা দিবে। জনসংখ্যার চাপের প্রতিক্রিয়ায় বনবাদাড় ও

বৃক্ষ সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে প্রয়োজনীয় বনজ দ্রব্যের অভাব দেখা দিবে। বন্য পশু পাখী জন্তু জানোয়ার আশ্রয়হীন এবং তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। আবহাওয়া ভারসাম্যতা ও প্রকৃতিগত গুণ হারাবে। পরিবেশ হয়ে পড়বে জীবন ও জীবিকার পক্ষে অনুপযোগী। অক্সিজেনের অভাবে পরিবেশে বিষবাষ্পের আধিক্য দেখা দিবে। আদ্রতার অভাবে প্রকৃতিতে শুষ্ক মরু প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। অনিয়ম দেখা দিবে ঋতুর আবর্তনে। শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার হ্রাস বৃদ্ধিতে আবহাওয়ায় পরিলক্ষিত হবে বিরাট পরিবর্তন। অতএব এখানে প্রকৃতির ভারসাম্যবস্থা রক্ষার প্রয়োজনেও বটে, জনসংখ্যার বিরাট বৃদ্ধি ঘটান ক্ষতিকর। শান্তিপুর্ণ সহাবস্থান বাস্তবায়ন ও জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি রোধের দ্বারা, প্রকৃতির ক্ষতিকর প্রবণতাকে শামাল দেয়াও আবশ্যক।

বিরোধের অপর কার্যকারণ জমি জমার বিরোধ একটি কৃত্রিম সমস্যা। সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে, তার নিবারণে উদ্যোগ নিলে সহজেই মীমাংসায় পৌছা সম্ভব। দখল ও মালিকানা সংক্রান্ত প্রমাণের অভাবে জরিপ কর্মচারীদের দ্বারা স্থানীয় সংখ্যালঘুদের আবাদকৃত অনেক জমি সরকারী খাস রেকর্ডের ভিত্তিতে নবাগত বাঙ্গালীদের বরাদ্দ করা হয়েছে। এ জাতীয় বিরোধের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে বিরোধাবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের মাঝে আপোষরফা অথবা ভিন্ন জমি সংস্থানের দ্বারা বিরোধের বৃহদাংশের নিষ্পত্তি করা কঠিন নয়। আবাদকৃত জমি সে খাসই হোক, বন্দোবস্তির বেলায় ন্যায়তঃ আবাদকারীর অগ্র প্রাপ্য। তবে বন্দোবস্তি না নেওয়ার খেসারত ও তাকে দিতে হবে, যা পর হস্তে চলে যাওয়ায় তাকে ভুগতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে নতুন মালিক থেকে ঐ জমি উদ্ধারও কঠিন হবে। কারণ ইতিমধ্যে তার মালিকানা পাকা পোক্ত হয়ে গেছে, এবং খাস বলে সরকারীভাবে ঐ জায়গা তাকে বন্দোবস্তি দিয়ে হস্তান্তর করাও হয়েছে। সে কার্যত বেআইনী ভোগদখলকার নয়। অনেক জায়গায় সংখ্যালঘু পরিবেশও নেই। সুতরাং বিকল্প জায়গাজমির মাধ্যমে, অনেক ক্ষেত্রে সাত্বনা পেতে হবে। জিদ ও জিঘাংসাকে প্রশমিত করা এসব ক্ষেত্রে একান্তই উচিত। খরির বিক্রির ব্যাপাটিও দাপ্তরিকভাবে সমাধানযোগ্য।

সামাজিক অশান্তি সৃষ্টিতে যৌন অনাচার আর খেলাপী আর্থিক লেন দেন কম দায়ী নয়। এসব ব্যাপারে সামাজিক কঠোরতা আর যৌথ সালিষী ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যেতে পারে। কেউ যেন জবরদস্তি বা সামাজিক সম্মতি ছাড়া কোন রূপ যৌন সম্পর্ক রচনায় সফলকাম না হয়, এবং কোনরূপ অনাচার না ঘটায়, এরূপ সামাজিক বিধি নিষেধ রচনা ও চালু করা, এবং তজ্জন্য সালিষ কর্তৃপক্ষ গঠন আবশ্যক। প্রচলিত সামাজিক বিচার পদ্ধতির আদলে, আন্তঃ সামাজিক বিধি নিষেধ এবং তজ্জন্য সালিষ কর্তৃপক্ষ থাকা আবশ্যক। সামাজিক ভাবে কঠোরতার দ্বারা অবাঞ্ছিত যৌন সম্পর্কের ঘটনা ও খেলাপী লেনদেনের প্রতি লোকজনকে নিরুৎসাহিত আবশ্যক।

সামাজিকভাবে প্রতিকার ও প্রতিরোধযোগ্য অন্যায় অনাচারের প্রতিটি ঘটনায়

সমাজপতিদের বিচার ও শাস্তি বিধানের ক্ষমতা দিলে, ধীরে ধীরে উত্তেজনাহীন আন্তঃ সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠার সুযোগ আছে। মন ও মানসিকতাকে অহিংস ও বন্ধুভাবাপন্ন করে গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপই হলো বিপক্ষের বিরক্তি উৎপাদন না করা। তার স্বার্থহানী থেকে বিরত থাকা, এবং ব্যবহারে হওয়া সহিষ্ণু ও ভদ্র। ন্যায়-অন্যায়ের মূল্যায়নে আপন পরে তারতম্য আর পক্ষপাতিত্ব মোটেও প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয়। ন্যায় ও উদার আচরণের দীর্ঘ অনুশীলন পার্বত্য আবহাওয়াকে ভারসাম্যময় করে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধীয় বিষয়ঘুলো এড়ান ও নিবারণ করা গেলে, একটি সদ্ভাবের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া সম্পুর্ণ সম্ভব। সেরূপ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য আশা-আকাঙ্খার পার্থক্য ক্রমে সঙ্কোচিত হলে উভয় সমাজই সদ্ভাবের দিকে এগুবে। তখন দেখা যাবে সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় ক্ষেত্রে অনুপস্থিত এবং উভয় সমাজের চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ক্ষমতা আর সুযোগ-সুবিধায় একের বঞ্চনায় অপরের প্রাপ্তি যোগ না হলে এবং ন্যায্য অধিকারের প্রতি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে জাতি ও রাষ্ট্রের কাছে কিছুই অপূরণীয় থাকবে না। যে রাজনৈতিক ক্ষমতা আর অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অর্জনের চেষ্টায় একা সংখ্যালঘু সমাজ সংগ্রামে লিপ্ত, তাদের সমুদয় ব্যর্থতা, স্থানীয় বাঙ্গালীদের সহায়তায় অচিরেই সাফল্যে পরিণত হওয়া সম্ভব। তাই দরকার কৌশলের পরিবর্তন। স্থানীয় বাঙ্গালীদের দলভুক্ত করে যদি দাবী করা যায় ঃ যথেষ্ট হয়েছে, আর বাঙ্গালী আবাসন নয়, এবং জনসংখ্যানুপাতিক গণতান্ত্রিক নিয়মে সব সুযোগ-সুবিধায় সমানাধিকার ভোগ করা সহ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই, তা হলে তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াবে। এর মোকাবেলায় অস্ত্র তুচ্ছ। তাই অস্ত্রবাজিটা পরিত্যক্ত হওয়া দরকার।

এতদাঞ্চলের অবাঙ্গালী জনগণের পক্ষে জনসংহতি সমিতি ইউপিডিএফ ও তাদের সশস্ত্র অঙ্গ বাহিনীগুলো আন্দোলনে ও অস্ত্রের মাধ্যমে একযোগে প্রচন্ড আকারে যে রাজনৈতিক আকাঙ্খা ব্যক্ত করে চলেছে, তা দেশে-বিদেশে আলোড়ণ সৃষ্টি করেছে। এটা একা বাঙ্গালীও বাংলাদেশের পক্ষেই শুধু বিরক্তিকর নয়, দুর্ভোগের বিচারে খোদ অবাঙ্গালীদের পক্ষেও চরম বিপর্যয়কর। রাষ্ট্র এবং অবাঙ্গালীদের পক্ষে এটা দুর্ভাগ্যজনক। দুর্ভোগ ও বিপর্যয়কর এই পরিস্থিতি বজায় রাখার দ্বারা কেউ উপকৃত হচ্ছে না। চিন্তাশীল ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিগণের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা জনক নয় যে, সমস্যা জিইয়ে রাখার চেয়ে তার আপোষ মূলক সমাধানই উত্তম। বিপরীত মুখী একরোখা মনোভাব ক্ষতিকর। দেশ ও জাতির পক্ষে মৌলিক ও জৈবিক চাহিদাগুলো পর্যন্ত পূর্ণ করার যথেষ্ট ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের এখনো অর্জিত হয়নি। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক ও উন্নয়নমূলক দাবী দাওয়ার অপূর্ণ থাকা সম্পুর্ণ স্বাভাবিক। আমাদের পরস্পরের উপর এই অপূর্ণতার কারে ও হিংসায় মেতে উঠা সঙ্গত নয়। কেউ কাউকে বঞ্চিত করছেনা, সবাই বঞ্চিত। দোষ এককভাবে কারো নয়, দোষ ভাগ্যের। কিছু অন্যায় অবিচার আর হেরফের হওয়া স্বাভাবিক। দুর্বল আর

সংখ্যালঘুদের প্রতি কিছু অবিচার হওয়া অসম্ভব নয়, এবং তজ্জন্য কিছু কাড়াকাড়ি হানাহানি ঘটা বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতারই অংশ। এটা যুদ্ধ বা বিদ্রোহ ঘটানোর মত চরম ঘটনা নয়, কার্যতঃ চাহিদা গত বিরোধ। ব্যাপারটিকে সহজভাবে গ্রহণ করে, মিট মাটের কথা ভাবা উচিত।

ইতোমধ্যে পরিস্থিতিতে সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এরশাদ আমলে প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়, জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে অবাঙ্গালী জনসাধারণকে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দানের জন্য আহ্বান জানান হয়েছে। পরে জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানিয়ে, তদ্বারা স্থানীয় পার্বত্য জনগণের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান হওয়া সম্ভব বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। এটা ইতিবাচক ও নিরস্ত্র রাজনৈতিক তৎপরতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই অনুকূল মনোভাবের প্রতি স্থায়ী আগ্রহ ব্যক্ত হওয়া উচিত।
উপজাতীয় দাবী দাওয়া আতিশয্য আছে তবে তার পক্ষে সহসা চূড়ান্ত পর্যায় থেকে নিম্নতম নমনীয়তায় নেমে আসা এবং তার আশা করাও অবাস্তব। স্থানীয় ভোটার তালিকা, আমদশুমারী, জায়গা জমির দলিল পত্র, মামলা মোকদ্দমার রেকর্ড পত্র কর খাজনার রশিদপত্র ইত্যাদিতে নাম ভুক্তি স্থানীয় জীবন যাত্রার সাথে সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত প্রমাণাদি কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না, এ সবই উপজাতীয়দের স্থানীয় হওয়ার প্রমাণ। পূর্বাহ্নেই নাগরিকত্ত্বে ব্যাপারে খুটি নাটি আপত্তি উত্থাপন করা ঠিক নয়, এবং দাবী দাওয়ার বহরে ঘাবড়ে যাওয়া অনুচিত। অনুকূল আগ্রহই এখানে প্রধান বিবেচ্য বলা যায়। শান্তির ক্ষুদ্রতম সুযোগকেও আমাদের জাপটে ধরা আবশ্যক।

স্থানীয় তিন সংসদীয় আসন, সরকার ও সংসদ গঠনের পক্ষে অরিহার্য নয়। শান্তির স্বার্থে এখানে নমনীয় নির্বাচনী নীতি বিবেচিত হতে পারে। তবে সমনাধিকার ও গণতন্ত্রই মূল বিবেচ্য বিষয়।

সারা দেশের ভৌগোলিক প্রকৃতির মাঝে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। স্থানীয় মানুষেরা ও রং গঠন, ভাষা, সংস্কার ও সংস্কৃতির বিচারে কতিপয় স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত। জাতীয় রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রেও এখানকার মানুষ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। গোটা দেশের ৯৯% মানুষ বাঙ্গালী হওয়ায় তাদের মাঝে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও সামাজিক অনুভূতিতে বিপরীতমুখী স্রোত খুব বেশী প্রকট নয়। অমিলের চেয়ে মিলের ব্যাপারগুলো তাদের পরস্পরকে অধিক আপন ভাবার অনুভূতি যোগায়। কিন্তু এখানকার পার্বত্য অবাঙ্গালী সমাজ জাতীয়ভাবে সংখ্যালঘু এবং আঞ্চলিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায়, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য আধিপত্য আর অস্তিত্বের নিরাপত্তার প্রশ্নে অধিক ভাবিত। তাদের এই উৎসাহ আর সন্দেহ প্রবণ মানসিকতাকে প্রবোধ দেয়ার প্রয়োজনেই, নিরাপদ ভবিষ্যৎ কামনায় তাদের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, কিছু ভিন্নভাবে পরিচালিত। এই চিন্তার সাথে জাতীয়

চেতনার অমিল ও সংঘাত ঘটায় বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য জনসংহতি সমিতি ইউপিডিএফ ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীরগুলোর জন্ম সুত্র এটাই। বৃটিশ আমল থেকেই এখানে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের একটি ধারা প্রবহমান। তখন স্থানীয় অভিজাত শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ আর আধিপত্য সুসংহত করার সুযোগ পেয়েছেন। একদল শিক্ষিত আর অভিজাত লোক পাকিস্তানে যোগাদানের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছিলেন। তার সাথে স্থানীয় আধিপত্য ও সাম্প্রদায়িক হিংসার প্রশ্ন জড়িত ছিলো। পাকিস্তান আমলের শেষ নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য পদে প্রার্থী হয়ে প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সর্বপ্রথম মৌখিকভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে, সাধারণ লোকজনকে উজ্জীবিত করেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিরোধীতায় তিনি আবার সোচ্চার হোন। পরে তিনি লিখিতভাবে চার দফা রাজনৈতিক দাবী তখনকার সরকার প্রধান শেখ সাহেবের নিকট পেশ করেন ও তা গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হলে সশস্ত্র আন্দোলনে অগ্রসর হোন। পরবর্তী জিয়া সরকার স্থানীয় সশস্ত্র বিদ্রোহকে দেশ রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে তার স্থায়ী সমাধান হিসাবে বিদ্রোহী পক্ষকে স্থায়ীভাবে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদার ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নেন। তড়িঘড়িতে বাঙ্গালী সংখ্যা বৃদ্ধি, সেনা ছাউনী নির্মাণ ও স্থানীয় উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হলে তিনি আপোষের পথে শান্তিপুর্ণ মীমাংসায় ব্রতী হন। বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত নয়। মারিষ্যার গহীন বনাঞ্চলে রাত্রি যাপনের মাধ্যমে তিনি ঐ পক্ষকে আপোষ মীমাংসার আহ্বান জানান। সেই আশাব্যঞ্জক ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার সূচনাতেই দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন এবং মীমাংসার উদ্যোগটি তমসাচ্ছন্ন হয়ে যায়। পরবর্তী এরশাদ সরকার সমস্যাটির মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার প্রতি আকৃষ্ট হোন এবং আলাপ আলোচনাকে দুই সশস্ত্র বাহিনী অঙ্গনে ঠেলে দিয়ে মীমাংসাকে অসম্ভব করে তুলেন। ঐ আলোচনা বৈঠকে বিবেচনা যোগ্য রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা গুরুত্ব পায়নি। দুপক্ষই মীমাংসার অনুপযোগী দাবী দাওয়ায় অটল ছিলেন। উত্থাপিত দাবী দাওয়ার ভিত্তিতেই এরশাদ সরকারের পতনের পর বিদ্রোহী মহলে নমনীয়তার লক্ষণ দেখা দেয়। তারা প্রথমেই এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন দানের জন্য তাদের সমাজের লোকজনকে আহ্বান জানান। পরে শরণার্থীদের ফিরিয়ে এনে তাদের চলমান সংসদীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে দাবী উত্থাপন করেন। দাবীটির মাঝে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্রোহী মহলের নিজেদের ঐ ইচ্ছাটিরও প্রকাশ ঘটে যে, আসলেতারা ও সসম্মানে স্বদেশে ফিরে আসতে ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দাবী দাওয়ার মীমাংসায় আগ্রহী। তবে তাদের পাকিস্তান আমলের শরণার্থীদের বাংলাদেশী করার প্রচেষ্টা অগ্রহণযোগ্য হয়। সে আমলের দেশান্তর ও বিদেশে অধিবাস গ্রহণের ঘটনাগুলো দেশ বিভাগ ও বিজাতীয় রাজনৈতিক আনুগত্যের সাথে জড়িত। এ যুগে তার পরিবর্তন হতে পারে না। যদি হিংসা আর রক্তপাতের প্রতি তারা অনীহ এবং শান্তিপুর্ণ বা নিয়মতান্ত্রিক

আন্দোলনের প্রতি আগ্রহান্বিতই হতেন, তবে কেন সন্ত্রাসী উৎপাত অব্যাহত রাখা? বিদ্রোহী মহলের আন্তরিকতার প্রতি এই সন্দেহ অমুলক ছিল তা প্রমানের দায়িত্ব তাদেরই।

এখন দেখা দরকার অতীতে মীমাংসার আলোচনায় কী কী সমস্যা চিহ্নিত এবং কোন কোন প্রশ্নে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন সম্ভাব্য মীমাংসার ক্ষেত্রগুলো তাতেই চিহ্নিত হবে।

আমাদের বিচারে দুটি প্রশ্নে মাত্র অনমনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। বিদ্রোহী পক্ষের প্রধান দাবী ছিলো ঃ ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সমূদয় অতিরিক্ত বাঙ্গালী জন সমষ্টিকে প্রত্যাহার এবং দ্বিতীয় দাবী ছিলো ঃ স্বায়ত্ত শাসন দান। এই উভয় প্রশ্নে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি ভিত্তিক দীর্ঘ কোন আলোচনা পরিচালিত হয়নি। উভয় পক্ষের আলোচকবৃন্দের ভিতর রাষ্ট্র বিজ্ঞানী আইনজ্ঞ ও ঝানু রাজনীতিক সদস্য ছিলেন না। তাড়াহুড়ার ভিতর সপক্ষীয় সুবিধা আদায় এবং বিপক্ষকে বাধ্য করার এক তরফা সামরিক মনোবৃত্তি কার্যকরী ছিলো। সুতরাং কেন বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী যাবে, বা থাকবে এবং কেন কি করে স্বায়ত্ত শাসন দান জরুরী বা অসম্ভব তার পক্ষে বিপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক আলোচনা হয় নি। উভয়পক্ষের দাবী সঙ্গত কি অসঙ্গত নির্ধারণের প্রয়োজন ছিলো। খুটি নাটি মূল্যায়ন ছাড়াই, সরকার পক্ষ উত্তর দেনঃ বাঙ্গালী প্রত্যাহার অসম্ভব এবং স্বায়ত্ত শাসন দান, সংবিধান সম্মত নয়। এর প্রত্যুত্তরে বিদ্রোহী পক্ষ নিজেদের দাবীতে অটল থাকেন। সুতরাং ৬ষ্ঠ বৈঠকের সময় আলোচনা ভেঙ্গে যায়। বিদ্রোহী পক্ষের ৫ দফা দাবীর বিপরীতে সরকার পক্ষ ৯ দফা ভিত্তিক সুযোগ- সুবিধাযুক্ত একগুচ্ছ প্রস্তাব দেন। কিন্তু মত পার্থক্য অক্ষুণ্ন থাকে। ঐ ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার অতঃপর বিদ্রোহী সমাজের নেতৃবৃন্দকে সম্মত করে তিন পার্বত্য জেরার জন্য তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনের এক ক্ষমতা ভিত্তিক টোপ দেন, যার বিরোধীতায় বিদ্রোহী পক্ষ এবং তাদের অনুগত লোকজন সোচ্চার হোন। মনে হলো মীমাংসার আলোচনায় বাঙ্গালী সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্থানীয় স্বশাসনের প্রশ্নে কিছু ছাড় দেয়া বা নমনীয় হওয়া ব্যতীত বিদ্রোহী পক্ষ অস্ত্র ত্যাগে সম্মত হবেন না। এই দুই প্রধান প্রশ্নেই এখনো বিরোধীতা সীমাবদ্ধ বলা যায়।

শান্তির জন্য অপেক্ষা উৎকণ্ঠার শেষ নেই, তবু তা দৃশ্যমান নয়। শান্তি পরম আকাঙ্খিত বিষয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে অবিলম্বে শান্তি স্থাপিত হোক, এটাই সবার কামনা। কিন্তু এই কামনাটি সরল বাস্তবায়ন যোগ্য নয়, বাস্তবে জটিলতায় আবদ্ধ। উপজাতীয় পক্ষের চাওয়া পাওয়া আর বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের চাহিদার মাঝখানে, বিস্তর ফাঁক ও ফারাক বিদ্যমান। জটিলতার সূত্র এটাই। এই জট ও জটিলতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রয়োজন আছে।

বাংলাদেশ সংবিধানে দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বক্তব্যই লিপিবদ্ধ রয়েছে, যথা ঃ 'অনুচ্ছেদ-১ঃ প্রজাতন্ত্র। বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।

বর্ণিত এই সাংবিধানিক ব্যবস্থাটি বিশুদ্ধ এক-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রেরই সমর্থক। এতে অধঃস্তন কোন সরকার বা অংগ রাজ্যের সামান্যতম সুযোগ সম্ভাবনা ও নিহিত নেই। গোষ্ঠীতান্ত্রিক কোন প্রশাসন ও তাতে স্বীকৃত নয়। এখানে কেন্দ্রই একক ক্ষমতার অধিকারী।

এই সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিপরীতে পার্বত্য জন সংহতি সমিতির প্রাথমিক দাবী ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা লাভ, যথা ঃ

'দাবী নং-১ (ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান করা।
(খ) পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করা।
(গ) প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমবায়ে গঠিত হইবে, এবং প্রদেশ তালিকাভুক্ত বিষয়ে এই পরিষদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের অধিকারী হইবে।' (সূত্র মূল দাবী নামা)।

উল্লেখ্য যে, এই দাবীটি উপরে বর্ণিত সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরোধী। জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা, সংবিধান প্রণেতা জাতীয় সংসদের একজন সদস্য হলেও, অনুরূপ স্বায়ত্ত শাসনের দাবী, ঐ সংসদে কখনো উত্থাপন করেননি। বিশুদ্ধ এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের পরিপন্থী, এটা জানা স্বত্ত্বেও তিনি স্বায়ত্ত শাসন ও যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি জাতীয় সংসদে সোচ্চার ছিলেন না। তার উক্ত নীরবতাই এক কেন্দ্রিক বাংলাদেশের প্রতি মান্যতা ব্যক্ত করে। তাই বলা যায় সংবিধান প্রণয়নের ঐ সূচনা লগ্নেই বিষয়টির ফয়সালা হয়ে গেছে। এখনকার স্বায়ত্ত শাসন বিতর্কটি তাই যথার্থ নয়, দেশ ও জাতিকে বিব্রত করার একটি নতুন ইস্যু মাত্র।

৬। এরশাদ সরকারের ৯দফা শান্তি প্রস্তাব

জন সংহতি সমিতির সাথে এরশাদ সরকার আমলে অনুষ্ঠিত সংলাপে, বাংলাদেশ পক্ষ সংবিধানের সাথে উপরোক্ত দাবীটির অসংগতির কথা উত্থাপন করেন ও তা পূরণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করা হয়। এ নিয়ে অনেক ব্যর্থ আলোচনার পর, সরকার নয় দফার একটি বিকল্প শান্তি প্রস্তাব পেশ করেন, যথা ঃ

(১) সংবিধানের ২৮ ধারার আলোকে তিন পার্বত্য জেলাকে বিশেষ এলাকা রূপে চিহ্নিত করা।

(২) সংবিধানের ৯ ও ২৮ ধারার আলোকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সার্বিক ক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি জেলা পরিষদ গঠন করা।
(৩) বিষয় বিভক্তি নির্ধারণ।
(৪) সংবিধানের ৬৫ ধারার আলোকে হস্তান্তরিত বিষয় ভিত্তিক উপ-আইন আদেশ বিধি, প্রবিধান, রচনা, জারি ও কার্যকরী ক্ষমতা পরিষদ গুলোকে প্রদান।
(৫) জাতীয় সংসদে প্রণীত কোন আইন আপত্তিকর বিবেচিত হলে তিন জেলা পরিষদ কর্তৃক তা পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারকে অবহিত করার ক্ষমতা দান।
(৬) জেলা ও উপজাতীয় সার্কেলের এলাকার পুনর্বিন্যাস সাধন।
(৭) জেলা ও উপজাতীয় প্রধানের সমন্বিত অবস্থান নির্ণয়।
(৮) প্রতি সার্কেলে পুলিশ বাহিনী গঠন।
(৯) পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির প্রয়োজনীয় সংশোধন বাস্তবায়ন অথবা বাতিল করণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

কিন্তু এই প্রস্তাবের প্রতি জন সংহতি সমিতি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এর বিপরীতে সরকার, প্রস্তাবিত পরিষদের স্বপক্ষে একটি সংসদীয় আইন প্রণয়ন ও জারি করেন। নির্বাচনের মাধ্যমে তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। জন সংহতি সমিতি-এর প্রতিরোধে সচেষ্ট হলেও ব্যর্থ হয়। দেশে নির্বাচনে মাধ্যমে নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হয়। সরকার প্রধন খালেদা জিয়া, ১২ই মে ১৯৯২ তারিখে খাগড়াছড়ির জন সভায় ঘোষণা করেন ঃ পার্বত্য সমস্যার সমাধান সংবিধানের ভিত্তিতে হতে হবে। এবার জন সংহতি সমিতি সচকিত হয়। তারা দাবীনামা সংশোধনের প্রয়োজন অনুভব করে। এবং অচিরেই তা ঘোষিত ও প্রচারিত হয়। সাথে সাথে সমিতির পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় অস্ত্র বিরতির ঘোষণাও আসে। সরকার তাতে উৎসাহিত হন। মনে করা হয় জন সংহতি সমিতির বোধোদয় হয়েছে। এটা শান্তির প্রতি তার সদিচ্ছার প্রকাশ। সংশোধিত দাবী নামায় শান্তি পুর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব উথাপিত হওয়ায়, তৎপ্রতি সরকারও আগ্রহান্বিত হোন। গঠিত হয় সর্বদলীয় নয় সংসদ সদস্যের সমন্বয়ে, একজন পুর্ণমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় সংলাপ কমিটি। কিন্তু দাবী দাওয়ার জটিলতায় উক্ত সংলাপ কমিটি দীর্ঘ দিনেও কোন সম্মত মীমাংসা ফর্মূলায় পৌছতে ব্যর্থ হন।

এবার বিবেচনা করা দরকার, সংশোধিত পাঁচ দফা দাবী নামাটি কী এবং সেটি কি সহজ না কঠিন কিছু ? যথাঃ
'দাবী নং-১। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করিয়া
(ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা।
(খ) আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।

(গ) এই আঞ্চলিক পরিষদ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়া গঠিত হইবে এবং ইহার একটি কার্য নির্বাহী পরিষদ থাকিবে।

(ঘ) আঞ্চলিক পরিষদে অর্পিত বিষয়াদির উপর এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে বিধি, প্রবিধান, উপ বিধি, আদেশ নোটিশ প্রণয়ন, জারি ও কার্যকর করার ক্ষমতার অধিকারী হইবে। দ্র (সূত্র ঃ সংশোধিত দাবী নামা)।

জন সংহতি সমিতি স্বীয় দাবী নামার এই নবায়িত বক্তব্যে এই প্রথম সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনকে স্বীকার করে নেয়। নতুন দাবীটি ও সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষ বলে স্বীকার করায়, এ কথাও স্বীকার্য হয় যে, সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারটি যথেষ্ট জটিল। এটি তারা নিজেরাও ওয়াকিবহাল। সুতরাং সরকারের সাথে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার প্রশ্নে একমত হওয়া সম্ভব হলেও, হুট করে তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, একথাও তাদের জানা বিষয়।

সংবিধান একটি জাতীয় দলিল। এর কোন বিধি বিধান পরিবর্তনের পক্ষে জনমতের চাপ থাকতে হবে। শুধু জন সংহতি সমিতি ও পার্বত্য উপ জাতিদের দাবীটাই তজ্জন্য যথেষ্ট নয়। শান্তির প্রয়োজনে ও তৎপ্রতি জনমত গঠন করা আবশ্যক হবে। তাতেও আইন ও আনুষ্ঠানিকতা মূলক জটিলতা আছে। প্রথমেই ভাবতে হবে দেশের এক কেন্দ্রিকতা তদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা। সংবিধানের মৌলিকতা রক্ষা ও বিবেচ্য বিষয়। তৎপর বিবেচ্য হলো ঃ স্বায়ত্ত শাসন, যুক্ত রাষ্ট্র বা ইউনিয়ন রাষ্ট্রের অংগ রাজ্য বা উপ অঞ্চল ভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামো ভিত্তিক বিষয়। এই ব্যবস্থা এক কেন্দ্রিক এই বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে সংস্থান যোগ্য নয়। এই সংশোধনীর চরিত্র হলো মৌলিক। তারপক্ষে সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে। সম্ভবতঃ এটি গণ ভোটের যোগ্য বিষয়। তখন জনমত কী এই সংশোধনের পক্ষে থাকবে?

জনগণ শান্তিকে সাধারণ ভাবে সমর্থন জানালেও এখন দেশীয় রাজনৈতিক পরিবেশ, উপজাতীয় ক্ষমতায়নের সমর্থক বলে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। উপজাতিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত্যা, নির্যাতন, জিম্মি করণ, চাঁদাবাজি, বাংগালী নির্মূল করণ ও বিতাড়ন, আর আধিপত্যবাদী দাবী দাওয়া সহ সেনা প্রত্যাহারের দাবীর বিপরীতে আইনীভাবে এতদাঞ্চলের উপজাতীয়করণ ও উপজাতীয় প্রশাসন কায়েমের উচ্চাভিলাষ পূরণ জন সমর্থিত নয়। এই প্রথম দফার উপ-দফা গুলোতেই বিবৃত হয়েছে সমূদয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী আর পুলিশের সবাইকে স্থানীয় উপজাতীয় হতে হবে। এতদাঞ্চলে বাংগালী প্রবেশাধিকার থাকবে না। প্রাপ্ত অধিকার ও সম্পদ সম্পত্তি ত্যাগ করে তাদেরকে চলে যেতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের জন্য অভিবাসন আইন প্রবর্তিত হবে। এতদাঞ্চলের নাম হবে জুম্ম ল্যান্ড ও তার অধিবাসীরা হবে জুম্ম জাতি নামে পরিচিত, ইত্যাদি। তাহলে বিচ্ছিন্নতার আর বাকি থাকে কী? বাঙ্গালীদের প্রতি অনুষ্ঠিত আর অনুষ্ঠেয় নৃশংসতা এবং অব্যাহত বৈরিতা,

পরিস্থিতিকে বিরূপ করে রেখেছে। তাছাড়াও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে কোন গ্যারান্টি নেই। জন সংহতি সমিতির বিচ্ছিন্নতা বিরোধী ঘোষণা, কোন স্থায়ী নিশ্চয়তা নয়। সর্বোপরি সেনা ও বাঙ্গালী প্রত্যাহারের দাবী চূড়ান্ত সন্দেহ জনক। এর বিপরীতে দেশকে অখন্ড রাখা সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ। উপজাতীয় আধিপত্যবাদ বিচ্ছিন্নতার সন্দেহটিকে গাঢ়তর করেছে। বিশেষতঃ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের তিক্ত অভিজ্ঞতা জাতিকে সচকিত করে রেখেছে। জাতিগত প্রাধান্যের কারণে, বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। এই একই কারণেএকদিন পার্বত্য উপজাতিদেরও বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে, এ বিষয়টি অবহেলার যোগ্য নয়। স্বায়ত্ত শাসনই উপজাতিদের আধিপত্য বজায় রাখার সুত্র, এবং এটি স্বাধীনতার সোপানও বটে। সুতরাং বিষয়টির সাথে দেশের অখন্ডতা ও প্রতিরক্ষা বিরোধী বিপদের যোগসুত্র নিহিত।

উপজাতিদের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, তবে তা দেশের অখন্ডতার বিনিময়ে নয়। এতদাঞ্চলের প্রতিরক্ষা শুধু সেনাবাহিনীর উপরই নির্ভরশীল নয়। স্থানীয় বাঙ্গালীরাও পার্বত্যঞ্চলের প্রতিরক্ষার অংশ। উপজাতীয় বিদ্রোহই প্রমাণ করে দেশের প্রতিরক্ষার পক্ষে তারা আস্থাভাজন, জনশক্তি নয়। তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ আছে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় আস্থাভাজন জনশক্তি বাঙ্গালীদের উপজাতিদের সমান্তরালভাবে সমান শক্তিতে উন্নীত করা, এবং অবস্থান গত সমান সুবিধা দেয়া অপরিহার্য্য কর্তব্য। এটি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন। স্বায়ত্ত শাসন ক্ষমতায় বাঙ্গালীদের সমান অংশীদার হতে হবে । একা উপজাতীয় স্বায়ত্ত শাসন ক্ষমতা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নয়। চূড়ান্ত বিচারে একতরফা উপজাতীয় স্বায়ত্ত শাসন পরিকল্পনা, বিচ্ছিন্নতারই নামান্তর। পাঁচ দফার মূল্যায়নে তা পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়ে।

শান্তি বাহিনী জন সংহতি সমিতির বেআইনী সশস্ত্র সংগঠন। এর অবস্থান হলো বাঙ্গালী ও বাংলাদেশ বিরোধী। এই জীবন্ত হুমকিটি যুক্তি ও শান্তির সহায়ক নয়। পাঁচ দফা দাবীটি অস্ত্রের দ্বারা শক্তিশালী করে তাতে বাংলাদেশকে কাবু করাই লক্ষ্য। বাংলাদেশ বিপজ্জনক উদারতার পরিচয় দিয়ে আলোচনাকালে ফেনী সিমান্তের আটটি সেনা ছাউনী প্রত্যাহারও পাঁচটি নিষ্ক্রিয় করে। বিনিময়ে পেয়েছে হিংস্র আর উগ্র আচরণ।

দাবীটিতে সংবিধানের প্রতি মান্যতা নিঃর্শত নয়। সরাসরি মান্যতার প্রকাশ না ঘটায়, জন সংহতি সমিতি তৎ প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছে না। এ অবস্থান নেতিবাচক। এতে দেশ জাতি ও সাংবিধানিক আইনের বিপক্ষে আন্দোলন ও রাজনীতি পরিচালনার অধিকার জন সংহতি সমিতির পক্ষে খোলা থাকছে। এই সুবিধাবাদী নীতি সন্দেহজনক।

দেশ ও জাতি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। জনসংহতি সমিতির দাবীনামা সরল সহজ নয় । আওয়ামী লীগ ঘোষিত নীতি হলো ঃ পার্বত্য সংকটের

রাজনৈতিক সমাধান করা। বিএনপির ঘোষিত নিতী হলো সাংবিধানিক সমাধান। পার্বত্য চট্টগ্রামে গত দু'টি জাতীয় নির্বাচনে তৎপ্রতি জনসমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগ উপস্থিত ক্ষমতাসীন হওয়ায় সে অংগীকারটি বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়েছে । পার্বত্য চুক্তি তারই ফল।

এখন বিচার করে দেখা দরকার, জনসংহতি সমিতির স্বায়ত্ত শাসনের দাবী গণতান্ত্রিকও সার্বজনীন কিনা? সাংবিধানিক বৈধতা যাচাইর পক্ষেও এ প্রশ্নটি মুখ্য। গণ-প্রজাতন্ত্র মানে কোন প্রকার গোষ্ঠীতন্ত্র নয়। গণতন্ত্র ও সার্বজনীনতার এক মূলমন্ত্র। জনসংহতি সমিতির দাবীতে উপজাতীয় ক্ষমতায়নই পরিকল্পিত। বিপরীতে এক কেন্দ্রিক গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সাংবিধানিকভাবে অগোষ্ঠীবাদী আর অসাম্প্রদায়িক। তার এই চরিত্র মৌলিক।
আঞ্চলিক পরিষদের যে ক্ষমতা কাঠামো, দাবী নামার প্রথম দফা ও উপদফা সমূহে ব্যক্ত হয়েছে, এবং পরবর্তী চারদফা ও উপদফা সমূহে যেভাবে দাবী দাওয়ার স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, সে সব পূরণ করতে হলে, বাংলাদেশ সংবিধানকে আগোগোড়া বদলে ফেলারই দরকার হবে, এবং এতদাঞ্চলের উপর জাতীয় অধিকার অবশিষ্ট থাকবে না। এটিতো সুযোগ-সুবিধা আদায়ের দাবী মাত্র নয়, এ হলো ঘোমটা দেওয়া বিচ্ছিন্নতা। এই লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষার সহায়ক নয়। এটাকে বিচ্ছিন্নতা নয় বলা একটি ধোকা।

হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের অভিবাসন আইন ৫২ ধারার মর্মার্থ মতে উপজাতিদের অধিকাংশ বিদেশী বহিরাগত নাগরিক-স্থানীয় আদিবাসী নয়, তাই তাদের জন্য অভিবাসন মঞ্জুর করার প্রয়োজন হয়েছে। স্বদেশী-বাংগালীরা নিজেদের দেশের এই অংশে কখনো ইমিগ্রেন্টস বা অভিবাসী নয়। স্বদেশীদের বসতি স্থাপন অভিবাসন নয়। আর কোন বিদেশী অভিবাসীর পক্ষেও স্বায়ত্ত শাসন মঞ্জুর যোগ্য নয়।

আলোচনা অনুষ্ঠান ও উদারতা প্রদর্শণের দরকার আছে। কিন্তু এ গুলোকে স্বপক্ষীয় অবস্থান দৃঢ় করণে ব্যবহার করতে না পারা হবে ব্যর্থতা। প্রতিপক্ষকে সুযোগ ও জামাই আদর দিতে আপত্তি নেই। তবে জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে দৃঢ়তাও দেখাতেহবে। অপরাধীর মত নরম হওয়ার অবকাশ নেই। যদি প্রতিপক্ষ দেশের অখন্ডতা ও জাতীয় স্বার্থের প্রতি নমনীয় হয়, তবে সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা দেয়া সম্ভব। নতুবা মোকাবেলা ছাড়া উপায় নেই। তাদের কাছে বাংলাদেশ ও বাংগালীরা আসামী বলেই মনে হয়, আর নিজেরা নিরিহ নিরাপরাধ। এই মনোভাব অবাঞ্ছিত।
৭।
আসলে শান্তি আমাদের দোর গোড়ায় উপস্থিত। তবে নীরবে নিভৃতে ধরণা দিয়ে রয়েছে, শুধু স্বাগত সম্ভাষণের অপেক্ষা, আর উপলব্ধির প্রতীক্ষা। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, মীমাংসার একটা চূড়ান্ত রূপরেখা নির্ণীত হয়ে রয়েছে, তবু তার উপলব্ধি নেই। আমরা এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগী নই। পার্বত্য সমস্যাটির উপর মেধাও

কৌশল খাটান হচ্ছে না। অবহেলার দ্বারা এটিকে দিনে দিনে জটিল করা হচ্ছে। বাস্তবে শান্তি স্থাপনের পূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়ে আছে, যাকে ভিত্তি করে প্রকৃত শান্তিচুক্তি সম্পাদন সম্ভব। শুধু অস্ত্র সম্বরণ নয়, শান্তিবাহিনীর সার্বিক অস্ত্র ত্যাগ, আর প্রত্যার্বন ও সম্ভব। এতো দীর্ঘ সংলাপ ও দর কষাকষির প্রয়োজন ছিলো না। আসলে সংলাপ ও দরকষাকষিতে কিছুই অর্জিত হয়নি। শান্তির মাইল ফলক স্থাপন করে দিয়েছে খোদ জন সংহতি সমিতি নিজে । সংবিধান ও গণতন্ত্র মান্যতা এবং তার ভিত্তিতে পাঁচ দফা দাবীর সংশোধন, জন সংহতি সমিতির চূড়ান্ত ছাড়। তৎপর অস্ত্র বিরতি হলো বাস্তবে শুভেচ্ছা মূলক অনুষ্ঠান। নতুবা আজও এই পর্বতাঞ্চল বাসীদের অস্ত্রের কাছে জিম্মি হয়ে থাকতে হতো। আজ মূল্যায়ন করা দরকার সংবিধান মান্যতা, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কামনা বিচ্ছিন্নতা পরিহার, দাবী দাওয়া সংশোধন, ও স্বেচ্ছায় অস্ত্র বিরতি গ্রহণ, শান্তিপুর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা জনসংহতি সমিতির সদিচ্ছা ও আন্তরিকতারই বহিঃ প্রকাশ কি না ! যদি তাই হয়, তাহলে পাঁচ দফা দাবীনামা আইন ও নীতি। আদর্শের মোকাবেলায় ঠুনকো। চূড়ান্ত বিবেচনায় বিদ্রোহীদের জাতীয় নীতি আদর্শের সাথে আপোষ করতেই হবে। পাঁচ দফা মঞ্জুরের অঙ্গিকার হবে সংবিধান ও গণতন্ত্রের পক্ষে অনুমোদন সাপেক্ষ। সংবিধান মানে বলেই সংহতি সমিতি সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী দাবী করেছে। মনে রাখা উচিত, সংশোধনীর অর্থ নতুন ধারা সংযোজন বা কোন আইনের পরিবর্তন নয়। তাদের এ দাবী সরল ভাবনাজাত। সংশোধনের পক্ষে অঙ্গিকার ব্যক্ত হলে, তা বিল আকারে সংসদে গৃহীত হতে হবে। বিষয়টি মৌলিক বিধায়, তা গুণভোটে অনুমোদিত হওয়ারও প্রয়োজন হবে। প্রক্রিয়াটি জটিল ও সময় সাপেক্ষ, এবং তৎপূর্বে শান্তিচুক্তি ও অস্ত্রত্যাগ সম্পন্ন হতে হবে। আমার বিশ্বাস সংবিধান, অখন্ডতা ও গণতন্ত্রকে মান্য রেখে, পাঁচ দফা মঞ্জুরের অঙ্গিকার সম্পন্ন, একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনে, জন সংহতি সমিতি ছিল অঙ্গিকারাবদ্ধ ও উদগ্রীর। এখন তাই নবতর সংলাপের একমাত্র বিষয় হলো, চুক্তির খুটিনাটি ত্রুটি নির্ধারণ সহ তার পক্ষে দলিল সম্পাদন করা।

বিদ্রোহের সাথে জড়িত জটিল বিষয় হলো ঃ স্বায়ত্ত শাসন, বাঙ্গালী প্রত্যাহার ও সশস্ত তৎপরতা। এ বিষয়গুলোর সাথে দেশের অখন্ডতা সংবিধান ও গনতন্ত্র-মান্যতা জড়িত বলে, চুক্তির অন্ধ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন অবশ্যই পালনীয় নয়। বিরোধীয় বিষয় সমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন জরুরী হবে। সরকার ও জনসংহতি সমিতি, শান্তি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার পর, তা বাস্তবায়নে সংবিধান ও গণতন্ত্রের দ্বারা, যে যে ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হবে, যুক্তি ও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, আবার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, তা কাটিয়ে উঠার প্রতিও দায়িবদ্ধ। জন সংহতি সমিতি রাষ্ট্রের সংবিধান সম্মত এক কেন্দ্রিকতা রক্ষায় প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী পরিত্যাগ করে, সুবিবেচনা ও যুক্তি গ্রাহ্যতার পরিচয় ইতিমধ্যেই দিয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতেও যুক্তি গ্রাহ্যতাকে প্রাধান্য দিবে, তা নির্দ্বিধায় কাম্য। সরকার

পক্ষকেও অনুরূপ উদার ও বুদ্ধি দীপ্ত মানসিকতার পরিচয় দিতে হবে। মূল বিবেচ্য বিষয় হবেঃ উপজাতিদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্দ্র্য রক্ষা, এবং তাদের কল্যাণ সাধন। সাথে সাথে অন্যান্যদের সাথে তাদের শান্তিপুর্ণ সহাবস্থান, সম্প্রীতি ও সমানাধিকার নিশ্চিত করা। তদুপরি ছোট বড় কেউ যাতে বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার না হয়, রাষ্ট্রকে তৎপ্রতি ও সতর্ক থাকতে হবে। চুক্তির মুখ বন্ধ -তা-ই বলে।

পার্বত্য পরিষদ সমূহের আইনী সংস্থান

(তাং শুক্রবার ৪ আষাঢ় ১৪০৬ বাংলা ১৮ জুন ১৯৯৯ খ্রীঃ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী এককেন্দ্রিক এই দেশে দু'ধরনের শাসন ব্যবস্থা অনুমোদিত, যথা ঃ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসন। অনুচ্ছেদ নং ১ এর বিধান বলে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের শাখা হলো বিভাগ জেলা, উপজেলা বা থানা প্রশাসন। এবং স্থানীয় কর্তৃত্বের শাখা হলো স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সম্বলিত কর্তৃপক্ষ, যথা ঃ জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, কর্পোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি। এই মূল্যায়নে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ, স্থানীয় শাসনভূক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান। এ কারণেই বিধান করা হয়েছে, আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব হবে ঃ

২২ (ক) পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ উহাদের আওতাধীন এবং উহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন..

(খ) পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ তত্তাবধান ও সমন্বয় সাধন। (সূত্র ঃ পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ আইন)

এতদসত্বেও এই পরিষদ দুটির আইনী সংস্থান ও মর্যাদার ব্যাপারে প্রশ্নাদি বিদ্যমান। এখন পর্যন্ত কোন বিবরণে এটা পরিষ্কার নয় যে, সংবিধানের কোন আইনে এ দুটি গঠিত। যদি এ দুটি স্থানীয় শাসনের আরো বর্ধিত মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তা হলে কোন বিধান বলে, এ পরিষদগুলোর রাজনৈতিক মর্যাদা প্রাপ্য। সাংবিধানিকভাবে দেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় না হওয়ায়, আঞ্চলিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে রাজ্য মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু আঞ্চলিক মর্যাদায় এতদাঞ্চলকে উন্নীত করা হয়ে গেছে এবং এ থেকে পিছানো বিব্রতকর, সেহেতু এই আঞ্চলিক পরিষদকে বিভাগীয় মর্যাদায় সমুন্নত করাই স্বস্তিকর। স্থানীয় শাসন আইনেই এমনটি করা সম্ভব। নতুবা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক এককেন্দ্রিকতা রক্ষিত হচ্ছে না, এবং অসন্তুষ্ট ভিন্ন পক্ষীয়রাও প্রবোধ মানবে না। এ কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, রাষ্ট্রীয় শাসন প্রশাসন, ইউনিটারী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীন বিষয়। রাষ্ট্রের ভিতর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠন করা ছাড়া অঞ্চল ভিত্তিক কর্তৃত্ব দান সম্বব নয়। সে পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিষদ বা সরকারের মর্যাদা লাভের আশা সুদুর পরাহত। তবে স্থানীয় শাসন কাঠামোতে কিছু রদ বদল ও যোগ বিয়োগ সাধন সম্ভব। রাষ্ট্রকে ইউনিটারী রেখেও, শিথিল কাঠামোতে পূনরগঠন করা অসম্ভব নয়। এ নিয়ে সরকার ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মত চিন্তা ভাবনা ও গবেষণার দরকার আছে।

আঞ্চলিক রাজনৈতিক আকাঙ্খা, গঠনমূলক হলে, তা অন্যায় নয়। বিপরীতে এক রোখা ও অসহিষ্ণু বিরোধিতা হলে, তাতে ধ্বংসাত্মক প্রবণতার উদ্ভব হওয়া সম্ভব। রাষ্ট্র ও জাতিকে বহু অঞ্চল ও ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হতে হয়। এই গঠন প্রক্রিয়ায় সমন্বয় ও উদারতা অবশ্যই মান্য। ভিন্ন চিন্তা ও ভিন্ন মতকে বৈরীতা ও ধ্বংস কামিতা বলে না ভেবে, তাকে গঠণমূলক রূপে গ্রহণ করাই উচিত। তাতে বিপক্ষদের দেশাত্মবোধ ও

জাতিপ্রেম আহত হবে না এবং বিদ্রোহ ভাব হবে স্তিমিত। উভয় পাক্ষিক অসহিষ্ণুতাই, হানাহানি ও বিদ্রোহের কারণ হয়। শুধু এক পাক্ষিক আত্মস্বার্থ চিন্তা, ও তার পক্ষে বীরত্ব প্রদর্শন, বৃহত্তর মঙ্গলসাধনের উপযোগী কাজ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে এরূপ নীতি আদর্শের প্রয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন সারাদেশের জন্য উদাহরণ হয়ে গেছে। এখন সাবেক বৃহত্তর জেলাগুলো আঞ্চলিক পরিষদের গঠনতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হবে। জেলা পরিষদ তো মঞ্জুর হয়ে আছেই। এখন বিবেচ্য হবেঃ পার্বত্য অঞ্চলের চেয়ে কম ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধায় অন্যরা রাজি হবে কি না। স্থানীয় শাসন ক্ষমতা পেতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকাকে একটি প্রশাসনিক ইউনিট রূপে গঠিত হতে হবে। যেমন পার্বত্য অঞ্চল তেমন অধিকাংশ সাবেক জেলা এখনো ডিভিশনে উন্নীত হয়নি। স্থানীয় শাসন আইনে সর্বত্র আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করতে হলে, সর্বাগ্রে সাবেক জেলাগুলোকে ডিভিশনে উন্নীত হতে হবে। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন আইনে এই পরিষদগুলো পরিচালনার চিন্তা ভাবনা থাকে, তা হলে এখনই পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, ঐ ভিন্ন আইনগুলো কী। নতুবা অসন্তুষ্ট পক্ষের আইনী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, এই পরিষদীয় সম্ভাবনাটির সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে আইনী চ্যালেঞ্জ ওৎ পেতে আছে, তা বলাই, বাহুল্য। পার্বত্য অঞ্চলে ব্যবস্থাটির প্রবর্তন কালে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, দেশটি যুক্তরাষ্ট্রীয় না এককেন্দ্রিক চরিত্র সম্পন্ন তা হয়তো ভুলে গিয়ে থাকবেন। অন্ততঃ প্রশাসনিক কাঠামোকে অজ্ঞতাবশতঃ ফেডারেল ব্যবস্থা বলে ভাবা হয়ে থাকবে। যদ্দরুণ ভিত্তিরূপে আঞ্চলিক পরিষদের জন্য প্রশাসনিক অঞ্চল থাকা জরুরী একথা অনুভূত হয় নি। কিন্তু এই শূন্যতা সাংবিধানিক বলে দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আঞ্চলিক পরিষদ না ফেডারেল, না ইউনিটারী কর্তৃপক্ষ। এর কোন প্রশাসনিক স্থিতি ভিত্তি নেই।

উভয় পরিষদ নিয়ে আরেকটি আইনী প্রশ্ন উত্থাপন যোগ্য। ১৯৮৯ সালের জুন মাসে আইনতঃ তিন বছর মিয়াদের জন্য তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচিত হয়ে গঠিত হয়েছিলো। বর্তমান জেলা পরিষদগুলো তারই এক প্রতিভু লাশ। এখন নতুন নির্বাচিত পরিষদের কার্যভার গ্রহণ করা পর্যন্ত এগুলো অন্তরবর্তীকালীন দৈনন্দিন কার্য নির্বাহী পরিষদ। নির্বাচিত পরিষদের সমান নীতি নির্ধারনী ক্ষমতা এগুলোর প্রাপ্য নয়। কিন্তু কার্যতঃ এই মনোনীত পরিষদগুলো আইনী ক্ষমতা বহির্ভূত সব কাজই করছে। তাদের আয়ু কখন শেষ হবে তাও অনিশ্চিত। দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন ছাড়া, অনির্বাচিত মনোনীত দীর্ঘজীবী পরিষদগুলোর বাড়তি ক্ষমতা ভোগ কি বিধি সম্মত? এই বাড়তি ক্ষমতা চর্চার উদাহরণ হলো প্রবিধান রচনার মাধ্যমে তারা বেতন ভাতাকে দ্বিগুন তিনগুণ বাড়িয়েছেন। নগদ ও খাদ্যশস্যে প্রাপ্ত অনুদানের বিলি বন্টন ও ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা মোটেও পালন করছেন না। দূর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্বাচন হীন লাগাতার ক্ষমতা ভোগের এই উদাহরন আঞ্চলিক পরিষদের সামনেও দোদুল্যমান। আদৌ কোনদিন নির্বাচন ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা হবে কিনা কে জানে? এগুলো লাগাতার মাথাভারি খাই খাই পরিষদ

হয়ে আছে। জরুরীভাবে অবিলম্বে চলতি ভোটার লিষ্টে এখনই কেন নির্বাচন নয়? দাবী অনুযায়ী সংশোধিত ভোটার লিস্ট করা সময় সাপেক্ষ। জেলা পরিষদ আইনে বাঙ্গালীদের স্থানীয় স্থায়ী নাগরিকত্ব সম্পন্ন ভোটাধিকারের যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাতে সংবিধানিক আইন লঙ্ঘিত হয়। সুতরাং সংক্ষুব্ধ বাঙ্গালীদের পক্ষে ঐ আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা হওয়া সম্ভব। বাঙ্গালীদের ভোটাধিকার প্রশ্নে এখনই উপজাতীয় আপত্তি ও বাঁধার কারণে ভোটার করণ ও নির্বাচন আটকে আছে। এ পরিস্থিতিতে নির্বাচন ছাড়াই বর্তমান অন্তরবর্তী জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের লাগাতার ক্ষমতা ভোগ করে যাওয়াই হবে ভাগ্য লিপি। পরিষদগুলোর আয়ত্ত দফায় দফায় বাড়বে। অথচ আইনে নির্বাচনই ক্ষমতার উৎস। মনোনীত পরিষদের কোন বিধান সংবিধানে নেই। এবং অন্তরবর্তী পরিষদের পক্ষেও অনির্দিষ্ট দীর্ঘ কার্যকাল ক্ষমতা ভোগ অনুমোদিত নয়। সুতরাং আপাততঃ চলতি ভোটার লিষ্টে জরুরী ভিত্তিতে যত শীঘ্র সম্ভব নির্বাচন সমাধান করাই সঙ্গত। তাতে পরিষদগুলোর আইনী বৈধতা অর্জিত হবে।

জনসংহতি সমিতির দাবীনামার প্রথম দফায় সঠিকভাবেই সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষ দাবী উত্থাপিত হয়েছিলো। কিন্তু চুক্তিকালে নেতৃবৃন্দ এ কথাটি ভুলে গিয়েছিলেন যে, আঞ্চলিক পরিষদ বাস্তবে আইনী ঘোর প্যাঁচে পতিত হচ্ছে। বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলা ভিত্তিক একক কোন প্রশাসনিক ইউনিট বিদ্যমান নেই। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন নিদিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্র নয়। এই দৃষ্টিতে আঞ্চলিক পরিষদ হলো ভূমি এখতিয়ার মুক্ত এক বায়বীয় কর্তৃপক্ষ। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন ক্ষমতা কেন্দ্র নয়। জেলার উপর এটা কোন উর্ধ্বতন প্রশাসনিক ইউনিটও নয়। সেহেতু এ নামের কোন কর্তৃত্ব অধঃস্তনদের পক্ষে মান্যও নয়। আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্বকে এ বলে অমান্য করা যাবে। তাই আঞ্চলিক পরিষদের টিকে থাকার কোন নিশ্চয়তা নেই। এখন এটাকে বিভাগীয় মর্যাদায় উন্নীত করা এবং তাকে বিভাগীয় তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের ক্ষমতা দান ছাড়া এই ত্রুটির কোন সমাধান কল্পনীয় নয়।

সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে যদি এরূপ একটি উপ অনুচ্ছেদ সংযোজন করা যেতো যে, উপজাতি সমাজ ও তাদের অধ্যূষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি অপ্রশাসনিক ইউনিট রূপে বিশেষ সুযোগ সুবিধা অগ্রাধিকার, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় মূলক পারিষদীয় ক্ষমতা ভোগ করবে। তা হলে কোন আইনী ঝামেলাই পোহাতে হতো না। এই ব্যবস্থার অবর্তমানে এখন আঞ্চলিক পরিষদকে সাংবিধানিকভাবে জায়েজ করতে একমাত্র গ্রহণীয় উপায় হলো অনুচ্ছেদ ৫৯ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষে পরিণত করা, এবং তা তখনই যথাযথ হবে,যখন তিন পার্বত্য জেলা মিলে হবে একটি ডিভিশন। তখন নামে আঞ্চলিক পরিষদ হলেও কার্যতঃ তা হবে বৈধ এক বিভাগীয় পরিষদ।

সর্বোপরি, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে জাতীয় স্থানীয় শাসন আইনের সাথে সঙ্গতিশীল হতে হবে। তখন অনেক যোগ বিয়োগ মেনে নেয়ার ও প্রয়োজন হবে। নতুবা এটিকে জাতীয়ভাবে মানিয়ে নেয়া কঠিন হতে প্যার।

বৃহস্পতিবার ১০ আষাঢ় ১৪০৬ বাংলা ২৪ জুন ১৯৯৯ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পন, রাঙগামাটি,

এই প্রবন্ধের শিরোনামভূক্ত প্রশ্নটি যথেষ্ট জটিল। এটি সাংবিধানিক আইন সরকার ও রাজনীতি বিজ্ঞানভূক্ত তাত্ত্বিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবু সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের আগ্রহ মিটাতে আরো কিছু আলোচনা দরকার।

মনোনীত আর অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী পরিষদের ক্ষমতা দৈনন্দিন কার্যসম্পাদনে সীমাবদ্ধ থাকবে এ কথাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে লিখিত নেই। এ হেতু এই পরিষদদ্বয়ের মৌলিক নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা আছে এ বলা সঠিক নয়। বাংলাদেশ সংবিধানের তত্ত্বাবধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ নং ৫৮ (ঘ) হলো এতদসংক্রান্ত আইনী উদাহরণ যথা ঃ

"(১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্যে ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না। (সূত্র ঃ বাংলাদেশ সংবিধান)

এই আইনী উদাহরণের ভিত্তিতে এ বলা সঙ্গত যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচিত নয় বলে, তা মনোনীত অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক বা কার্যনির্বাহী অস্থায়ী কর্তৃপক্ষ। এগুলোর দায়িত্ব হলো দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন। নীতি নির্ধারণ ও প্রবিধান রচনার কোন বৈধ এখতিয়ার এগুলোর নেই। এমতাবস্থায় এগুলোর দ্বারা এ যাবৎ সম্পাদিত ও গৃহীত সমুদয় নীতি নির্ধারনী কার্যাবলী ও প্রবিধানাদি বেআইনী হয়েছে। এসবের দায় দায়িত্ব সংস্থাদ্বয়ের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের উপর বর্তায়। এবং এজন্য তাদের জবাবদেহী হতে হবে। তাদের এই ক্ষমতা বহির্ভূত বেআইনী কাজে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নির্বাহী কর্মকর্তাদের নীরব সমর্থন ও সহযোগীতা প্রমাণিত হলে, দায় দায়িত্বের ভাগ তাদের উপর ও বর্তাবে। সরকারী সম্পদ সম্পত্তি অর্থ কড়ি ব্যয় ও বিনিয়োগ এই তৎপরতার সাথে সম্পর্কিত বলে তার ক্ষতিপূরণ ও আদায় যোগ্য হবে। অজ্ঞতা ও অসতর্কতার অজুহাত পার পাওয়ার যোগ্য হবে না।

পরিষদগুলো বিধিবদ্ধ সংস্থা। এগুলোর প্রকৃতি প্রতিনিধিত্বমূলক। নির্বাচনই যার মৌলিক সাংগঠনিক ভিত্তি। বিধি বহির্ভূত অনিয়মতান্ত্রিক কোন কর্মকান্ডই তাতে অন্তর্ভূক্ত নেই। এই মৌলিকতার বিচারে মনোনীত পরিষদ আর অন্তর্বর্তী পরিষদ, কোনক্রমেই স্বয়ং সম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ পরিষদ নয়। এগুলো অনির্দিষ্ট দীর্ঘমেয়াদী হতেও পারে না। হয় অবিলম্বে নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্যতা পূরণ করতে হবে, নয়তো তত্ত্বাবধায়ক পরিষদগুলো ভেঙে যাবে। সরকারের কোন বিধিবদ্ধ সংস্থার পক্ষে অগণতান্ত্রিকভাবে দীর্ঘকাল বা অনির্দিষ্ট দীর্ঘ মিয়াদ কাল যাবৎ টিকে থাকাও সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ আইন সম্মত নয়। রাজনৈতিক বা নির্বাচনী জটিলতা, দীর্ঘমান্য অজুহাত রূপেও গণ্য হতে পারে না। রাষ্ট্রের এককেন্দ্রিক কাঠামো নিম্নোক্ত সাংবিধানিক আইনে গঠিত যথাঃ

"বালাদেশ সংবিধান প্রথম ভাগ। প্রজাতন্ত্র। অনুচ্ছেদ-১। বাংলাদেশ-একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।"

এই মৌলিক আইন দেশের কোন অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীকে যুক্ত রাষ্ট্রীয় ধরণের আঞ্চলিক ক্ষমতা ভোগের অধিকার দেয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের কাঠামোগত ক্ষমতার ভিত্তি কি ইউনিটারী না ফেডারেল ? পরিষদ আইনে বিষয়টি পরিস্কার নয়। যেহেতু দেশ সাংবিধানিকভাবে ফেডারেল নয়, সুতরাং আঞ্চলিক ভাবে ফেডারেল ক্ষমতা ও প্রদানযোগ্য নয়। তাতে সৃষ্টি শূন্যতার বিকল্প বলেও কিছু নেই।

ইউনিটারী সাংবিধানিক ব্যবস্থায়, স্থানীয় শাসন আকারে, একটি বিকল্প ব্যবস্থা রাখা আছে, যা বর্ণিত পরিষদ সমূহের ব্যাপারে একমাত্র প্রয়োগযোগ্য ব্যবস্থা। আর সে হলো সাংবিধানের ৫৯নং অনুচ্ছেদ, যথাঃ "(১) আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।"

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবে।

ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য, (খ) জন শৃংখলা রক্ষা, গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।"

এই সাথে সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৯ ও ৬০ আরো জোরদার সমর্থন ব্যক্ত করে যথাঃ

"অনুচ্ছেদ নং -৯। রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠান সমূহে কৃষক, শ্রমিক ও মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।"

"অনুচ্ছেদ নং ৬০ ঃ এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।"

এখন প্রশ্ন হলোঃ বর্ণিত পরিষদ আইন দেশ ও জাতি ভিত্তিক সার্বজনীন ও অবাধ গণতান্ত্রিক নয়। উপজাতিভূক্ত লোকদের জন্য এটিতে পদ সংরক্ষণ বিশেষ ক্ষমতা ও অগ্রাধিকার মঞ্জুর করা হয়েছে, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১৯, ২৭, ২৯, ও ৩১ অনুমোদন করে না। সাংবিধানে গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গিকার ও মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। অথচ পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে তার

ধারাবাহিকতা নেই যথাঃ

সাংবিধানিক আইন ঃ "প্রস্তাবনা। আমরা আরো অঙ্গিকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি শোষনমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে নাগরিকের জন্য আইনের শাসন মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক সাম্য স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"

"অনুচ্ছেদ ১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

"অনুচ্ছেদ ১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।"

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্তের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্ননের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

"অনুচ্ছেদ ২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"

"অনুচ্ছেদ নং ২৯।

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।"

"(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না, কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।"

এই মৌলিক বিধানগুলো স্থানীয় পরিষদ আইনে বিভিন্নভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে, যথা ঃ পার্বত্য মন্ত্রণালয় ও পরিষদ সমূহে মন্ত্রী ও চেয়ারম্যান পদে বাঙ্গালীদের অযোগ্য করে বিধান করা হয়েছে। সংখ্যানুপাতিক জন প্রতিনিধত্ব বাঙ্গালীদের নেই। মাত্র তিন ভাগের ১ ভাগ সদস্য পদই তাদের প্রাপ্য। এটি অবাধ গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতি লঙঘন। সুতরাং সংবিধানের প্রস্তাবনা ও ধারা নং ১১ তদ্বারা সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। জমি বন্দোবস্তি, লাইসেন্স পারমিট প্রদান ও কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতিদের অগ্রাধিকারের বিধান, সংবিধানের ধারা নং ১৯, ২৭, ২৯, ৩৬ ও ৪২ এর প্রকাশ্য লঙ্ঘন। অনুচ্ছেদ ২৮ (৩) ২৯ (৩) এর বিশেষ ছাড়ও সুবিধা দানের আওতায় অনগ্রসর লোকজন ধর্মীয় আর উপসম্প্রদায়ভূক্ত কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর অগ্রাধিকার ও পদ সংরক্ষণের সুবিধা লাভের অর্থঃ মৌলিক অধিকার হরণ নয়। অনুচ্ছেদ ২৬ এর বিধান মতে, অনুরূপ আইন আপনা আপনি বাতিল হয়ে যাবে, বা মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যহীন অংশ রহিত হয়ে যাবে যথাঃ

"অনুচ্ছেদ নং- ২৬। এই ভাগের বিধানবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন

যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ, এই বিধান প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।" (সূত্রঃ সংবিধান, তৃতীয় ভাগ-মৌলিখ অধিকার)

এভাবে চীফদের নির্বাহী ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তাদের স্থানীয় স্থায়ী অধিবাসী হওয়ার সার্টিফিকেট দানের ক্ষমতা দান, সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূত কাজ। সরকারী নির্বাহী ক্ষমতা ছাড়া কারো পক্ষেই জনগণের উপর কোন কর্তৃত্ব প্রাপ্য নয়।

১৫ আষাঢ় ১৪০৬ বাংলা ২৯ জুন ১৯৯৯/খ্রীঃ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙগামাটি)

এটা নিঃসন্দেহ যে, বিশুদ্ধ এক ইউনিট ভিত্তিক বাংলাদেশে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ও ক্ষমতা দান অসাংবিধানিক। আইনতঃ এটা পরিস্কার যে, পার্বত্য পরিষদীয় ক্ষমতা কোন রাখ-ঢাক ছাড়াই স্থানীয় শাসন ভূক্ত বিষয়। আসলে যদি বিষয়টি তা-ই-হয়, তাহলে এ পরিষদগুলো স্থানীয় শাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন না হয়ে, আগে ছিলো স্পেশাল মন্ত্রনালয়ের অধীন এবং এখন আছে নব সৃষ্ট পাবত্য মন্ত্রনালয় নিয়ন্ত্রিত, এ লোকচুরি যথার্থ নয়। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো ঃ জাতীয়ভাবে প্রযোজ্য সাধারণ জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরষদ আইন এখনো রচিত হয় নি। যদি তা পার্বত্য আইন থেকে ভিন্ন হয়, তখন বিশেষ কোন অঞ্জল ও সম্প্রদায় আইনগত প্রশ্রয় পাবে না। যদি পার্বত্য আইন ও সুযোগ সুবিধা ক্ষনস্থায়ী কিছু হয়, তা হলে উপজাতিদের সাময়িক রাজা উজির বাণিয়ে দিতে কোন আপত্তি নেই। আর যদি তা স্থায়ী ব্যবস্থা রূপে চিন্তা করা হয়ে থাকে, তখন ব্যবস্থাটিকে সার্বজনীন কল্যাণ অর্থেই সংগঠিত হতে হবে। ব্যবস্থাটির দুর্বলতা হলোঃ এটি কোন রাখ-ঢাক ছাড়াই নানাভাবে সাম্প্রদায়িক, পক্ষপাতদুষ্ট, অগণতান্ত্রিক ও একপেশে ব্যবস্থা। স্থানীয় ও সাময়িক ভাবে এর পক্ষে হাততালি জুটলেও পরিণামে এটি হবে কালান্তর। এর প্রবক্তারা ক্ষণস্থায়ী লাভের চিন্তায় মগ্ন। লক্ষ্য অর্জনের পর, হয় তারা নিজেরাই এর মুন্ডপাত করে যাবেন, নয়তো ক্ষমতাসীন বিপক্ষের হাতে তাকে কাতল হতে দিবেন।

প্রশ্ন হতে পারেঃ গোপন লক্ষ্যটা কী?

উত্তর হলোঃ দলীয় রাজনীতির সাফল্য হিসাবে গোলযোগ পূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের কৃতিত্ব প্রদর্শন। জাতীয় নির্বাচন মুহূর্তে বিরূপ জনমতকে বাগে আনতে কৌশল হবেঃ চুক্তির সাফল্য ও শান্তি প্রদর্শন, তৎপর গৃহশত্রু বিভীষণদের বলিদান। ভোট আর ক্ষমতা লাভের পর এক ফুৎকারে উবে যাবে শান্তি চুক্তি পরিষদীয় আইন ও উপজাতীয় ক্ষমতা। পক্ষে বিপক্ষে মাঠ গরম করার ইস্যু এটি। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের পক্ষে বাঙ্গালী স্বার্থের বিরোধীতা করে, ক্ষমতায় ফেরার আশা অবাস্তব কল্পনা। তাই এ কথা ভাবাই সঙ্গত যে, তাদের পার্বত্য রাজনীতি সব দেয়ার চাতুর্থ ও ফাঁকি সম্বলিত। কেড়ে নেয়ার শেষ খেলাটি বাকি। হয় বশংবদ লেজুড়ে পরিণত্ত হতে হবে, নয়তো মেনে নিতে হবে সব সংশোধন। এ ভাবে সন্তু বাবুদের মহা ফাপরে পড়া আসন্ন।

আমি আগেও বলেছি, এখনো বলি, উচ্চাভিলাষী চিন্তা পরিহার করুন। ঢালুতে অবস্থিত বাংলাদেশটি পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার আধিবাসীদের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সমাজ এই পর্বতাঞ্চল ও তার অধিবাসীদের ভাগ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ বন্ধন জন্মগত। উভয়কে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতায় এগুতে হবে। সাম্প্রদায়িক বৈরীতা বৈষম্য

ও উত্তেজনা নয়, সমানাধিকার ও একক রাজনৈতিক লক্ষ্যে সম্মিলিত আন্দোলনেই সাফল্য অর্জন সম্ভব। উপজাতীয়দের এক পাক্ষিক আন্দোলন সাফল্য অর্জনে কখনো সক্ষম হবে না। বিপরীতে ঐক্যবদ্ধ পাহাড়ী বাঙ্গালী আন্দোলন হবে দূর্বার। তাকে কখনো দমান যাবে না। কঠিনতম রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে এই ঐক্য হবে সফল শক্তি। আদি আর নবাগত বিভক্তি নয়, সম্মিলিত পাহাড়ী বাঙ্গালীর আন্দোলনে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সমাদর ও সাফল্যেরও সম্ভাবনা প্রচুর। এটি রাজনৈতিক সাফল্যের স্বর্ণদ্বার রূপে উন্মুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষমান।

ধর্মান্ধতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগ শেষ। একক ধর্ম বর্ণ সমাজ সম্প্রদায় ও শ্রেণীগোষ্ঠীভূক্ত লোক অধ্যুষিত দেশ ও জাতি গঠনের চিন্তা অবাস্তব। বিবিধের সহাবস্থানে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দেশ ও জাতি হয়ে থাকা এবং গড়ে ওঠার চিন্তা চেতনাই সঠিক। প্রত্যেক অন্যায় অবিচারকে মানবিক ও আইনী দৃষ্টিকোণের বিচারে দেখে তার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। হিংসা বিদ্বেষ ও হানাহানিতে তিক্ততাই বাড়ে, সমস্যার সমাধান হয় না। এ সংশোধিত পথে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের অগ্রপদক্ষেপ কাম্য। সাধারণ বাঙ্গালীরা তাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। সাম্প্রদায়িক একপেশে নীতি ও রাজনীতিটাই, ঐক্যের পথে বাধা। পর্বতাঞ্চলের আঞ্চলিক ও স্থানীয় রাজনীতিকে বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতির অঙ্গিভূত করা না গেলে, বিচ্ছিন্নতার সন্দেহ আর অবিশ্বাস দুরীভূত হবে না, যে সন্দেহ অবিশ্বাস জাতিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ করে রেখেছে। তা থেকেই বিদগ্ধ পক্ষ ভাবছেনঃ ক্ষমতায় গেলে তারা এই একপেশে ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন।

পার্বত্য বিধি ব্যবস্থাকে জাতীয়ভাবে গ্রহণীয় আইনীরূপ প্রদান দরকার। যদি পরিষদীয় কাঠামোটি সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক, ও সার্বজনীন হয়, আর এটি হয় জাতীয়ভাবে গ্রহণীয় একটি মডেল, তখন সন্দেহ অবিশ্বাস ও নেতিবাচক চিন্তা চেতনা বিদুরিত হবে। ব্যবস্থাটির স্থায়িত্বের জন্য, এরূপ উদার পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। আর এ উদ্যোগটি উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আসাই উপযোগী। কারণ অন্যরা সন্দেহে আক্রান্ত।

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের অভিযোগ আর অসন্তোষের মাত্রা কমান দরকার। তারা এখন সরকারী আনুকুল্য স্নাত বরপুত্র। যারা তাদের ক্ষমতাসীন করেছেন, এবং বালা মুছিবত থেকে বাঁচিয়ে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখছেন, প্রতিনিয়ত তাদের দোষারোপ ও গঞ্জনা দান অসঙ্গত। অলিখিত চুক্তির নামে বাঙ্গালী প্রত্যাহার সেনা ক্যাম্প সীমিত করণ, ভোটার তালিকা সংশোধন, প্রথাগত ভূমি মালিকানা, জেলা প্রশাসকদের নির্বাহী ক্ষমতার সংকোচন, বাঙ্গালীদের দখল ও অধিকার থেকে জমিজমা মুক্তকরণ, চীফদের ক্ষমতাকে প্রাধান্য দান, চাকুরী ইত্যাদি সুযোগ সুবিধার প্রশ্নে অগ্রাধিকার ইত্যাদি দাবী অবাঞ্ছিত। এগুলো ঐক্য, সদিচ্ছা ও সাফল্যের পথে বাঁধা।

পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি শৃংখলা নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় সেনাবাহিনীর ব্যাপক সমাবেশ থাকা অপরিহার্য। এখনো স্থানীয় সাম্প্রদায়িক সম্পর্কটি উত্তপ্ত। এখনো শান্তি চুক্তি বিরোধী একদল উপজাতীয় নব্য বিদ্রোহী মারমুখী। বহির্দেশীয় অনেক সশস্ত্র বিদ্রোহী সীমান্তের

পাহাড়ে জঙ্গলে গোপনে ঘাঁটি গেড়েছে ও উৎপাতে লিপ্ত। জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনীর অস্ত্র মুক্ত সদস্যরা স্বাভাবিক জীবনযাপনে হুমকির সম্মুখীন। পুলিশ বিডিআর আনছার ইত্যাদি শান্তি রক্ষী বাহিনীগুলোর শক্তি ও সামর্থ, বিপদ মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয়। দুর্গম অঞ্চলকে জেলা সদর থেকে তৎক্ষণাত নিয়ন্ত্রণ করা ও অসম্ভব। সুতরাং শান্তি নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার স্বার্থে সর্বত্র সেনা বাহিনীর নিয়োজিত থাকা এখনো জরুরী।

নাটকীয় কল্পনা অপহরণ

(বৃহস্পতিবার ২৫ জুলাই ১৯৯৬ ইং দৈনিক গিরিদর্পণ)

সংবাদ মাধমে ঝড় তলেছে কল্পনা চাকমার অপহরণ ঘটনাটি। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনারও সৃষ্টি করেছে। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্বাভাবিক চলাচল, পেশা, ব্যবসা ও রুজি রোজগার। সবাই আক্রমণের ভয়ে ভীত ও গৃহবন্দী। ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিদ্যমান। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীও ঘটনাটির দ্বারা আক্রান্ত, তাই কল্পনা উদ্ধারে তারাও পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। প্রশাসন ও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে অভিযুক্ত। বিজয় সূচীত হয়েছে অভিযোগকারী ও তাদের সংগটকদের। এখানে গোটা বাংলাদেশ ও বাংগালী সমাজও অভিযুক্ত। জাতীয় পত্রপত্রিকাগুলো নিজেদেরই দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ঢাকা ঢোল পিটিয়েছে। অথচ অভিযোগটি সন্দেহজনক। কল্পনা চাকমার হত্যা, অপহরণ, পলায়ন, অথবা আত্মগোপন কোন নিশ্চিত ঘটনা নয়, সবই গুজব। চোখ বাঁধা অবস্থায়, অন্ধকার গভীর রাতে চলমান অবস্থায় অহরণকারীদের হাত থেকে, কল্পনা সহোদরদের পলায়ন, গুলিতেও হতাহত না হওয়া, এবং কল্পনার হারিয়ে যাওয়া, এক অবিশ্বাস্য গল্প। বড়জোর এটি হতে পারে যে, অপহরণকারীরা সহোদরদের স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে এবং হাউকাউ না করার লক্ষ্যে, ভয় লাগাতে শূন্যে গুলি ছুঁড়েছে। অথবা সহোদররাই বোনটিকে পলায়ন বা আত্মগোপনের পথে এগিয়ে দিতে গিয়েছিল। পরে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে এটিকে অপহরণের অভিযোগে সাজানো হয়েছে। এই সম্ভাবনাগুলো ছাড়া এ ব্যাপারে ভিন্ন কিছু ভাবার অবকাশ নেই। আমরা বিষয়টির এই নাটকীয়তা আর অপপ্রচারে হতভম্ভ। প্রকৃত ঘটনা উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত, এটাই আমাদের অভিমত।

এখন বিবেচ্য হলো, এই সন্দেহজনক ঘটনার ঢাকঢোলের আড়ালে প্রায় চল্লিশাধিক লোকের অপহরণ ঘটনা, মুক্তিপণ দাবী, ও বহু হত্যাকাণ্ড নির্বিঘ্নে ঘটে গেছে, যার হোতা হলো, কল্পনা অপহরণ অভিযোগে সোচ্চার সংগঠন ও তার দোসররা। ঘটনাগুলো প্রমাণিত সত্য। পত্রপত্রিকায় এই মর্মন্তুদ ঘটনাগুলো সমান উৎসাহে প্রচারিত না হওয়া দুঃখজনক। মানবতাবাদীদের এ ব্যাপারে নীরবতা পালন ও আপত্তিকর। আজ সন্ত্রাসীদের হাতে বন্দী পাহাড়ী বাঙ্গালী চল্লিশাধিক ব্যক্তি অসহায়ভাবে মৃত্যুর ক্ষণ গুনছে, আর তাতেও তাদের স্বজনেরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় বিভক্ত। তারা জীবন ও জীবিকার সংকল্পে অসহায়। এই চল্লিশাধিক নির্যাতিতের প্রামাণ্য উদাহরণ হলো, বাঘাইছড়ির ইসহাক অপহরণ ও হত্যা, সুবলংয়ের ইউপি চেয়ারম্যান বীরো চাকমার অপহরণ, ও লোহার জিঞ্জিরে আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে শারিরীক নির্যাতন ও লক্ষ টাকার মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি। এই লোকজনের উদ্ধারের ব্যাপারটি অগ্রাধিকার পাবারযোগ্য। এ পর্যন্ত আগে পরে অনুষ্ঠিত সমুদয় হত্যা, অপহরণ, নির্যাতন, চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি ও মুক্তিপণ আদায়ের বিপরীতে কথিত কল্পনা অপহরণ ঘটনাটি এক

আড়ালকারী ঢাল। এটি উপজাতিদের স্থানীয় নির্বাচনী পরাজয়ের ক্ষতিপূরণমূলক একটি চাঞ্চল্যকর ইস্যুও হতে পারে। অতীতে তাদের নীতি কৌশল ছিল তা-ই। তারা আগ বাড়িয়ে প্রতিটি ঘটনা ঘটায়, তৎপর হুলস্থুল বাঁধিয়ে দোষ চাপায় বিপক্ষের ঘাড়ে।

এখন কল্পনা নাটকের মর্মন্তুদ প্রতিক্রিয়ায় 'পাহাড়ী বাংগালী উভয় সম্প্রদায় মুখোমুখি পারস্পরিক সন্দেহ আর নিরাপত্তাহীনতা তুঙ্গে। সবাই কর্মক্ষেত্র ছেড়ে গৃহবন্দী, আর পরস্পরে প্রতি মারমুখী। ঘটনার সত্যা-সত্য বিবেচ্য নয়, দোষ ক্রটি নির্ণয় ছাড়াই বাংগালী পক্ষ নিন্দিত আর অভিযুক্ত। এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে ইন্ধন যুগিয়েছে কিছু পত্র-পত্রিকার অপপ্রচার ও মানবতাবাদী কিছু ব্যক্তির উদ্দেশ্যমূলক উস্কানী। আজ পাহাড়ীরা বাংগালীদের উপর আর বাংগালীরাও পাহাড়ীদের উপর সন্দিহান। পারস্পরিক আক্রমণ অত্যাচারের ভয়ে প্রত্যেকেই ভীত। গরীব কাঠুরে জনগণ পাহাড় ও বন থেকে গাছ, বাঁশ ও লতাপাতা আহরণ থেকে বিরত। কৃষি জীবিরাও মাঠ ছাড়া। তাই চাষাবাদ বন্ধ। হাট বাজারে যাতায়াত ও কেনাকাটায় ভাটা পড়েছে। এভাবে রুজি রোজগার পেশা ও কর্মতৎপরতায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘরে ঘরে তাই হাহাকার। গ্রামের অধিকাংশ লোকই গরীব আর অস্বচ্ছল। যারা নিত্য আনে নিত্য খায়, তাদের অবস্থা এখন অত্যন্ত করুণ। তারা খেয়ে না খেয়ে জীবন নিয়ে এখন বড় বিপাকে। তাদের এই অসহায় দুর্ভিক্ষাবস্থার কোন প্রতিকার নেই। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক প্রতিপক্ষতার কাছে এরা অসহায়, জিম্মি।

সন্ত্রাসী আর তাদের দোসরদের কাছে অনুরূপ হাহাকার-ক্ষুব্ধ বিশৃংখল পরিস্থিতিই কাম্য। বিশেষতঃ গত নির্বাচনে জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতঃ হওয়ায়, তাদের নতুন করে ইমেজ সৃষ্টি প্রয়োজন। কল্পনা চামকা অপহরণ রটনা, তাদের এ রাজনৈতিক ক্ষতিপূরণে সহায়ক। ঘটনাটি সত্যমিথ্যা যাই হোক, দেশে বিদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এর মূল সাংগঠনিক তৎপরতায় জনসংহতি সমিতি পিজিপি, পিসিপি ও উইম্যানস ফেডারেশনই সক্রিয়। নির্বাচনে তারা জাতীয় দলগুলোর বিপরীতে নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড় করায়, এবং জনগণকে ভোট দিতে বলে। কিন্তু তাদের ঐ আহ্বান-প্রত্যাখ্যাত হয়। এই রাজনৈতিক ক্ষতিটির পূরণ করা ও জনগণকে আবার নিজেদের কমান্ডে আনার উপায় হিসাবেই বিরোধী লোকজনদের অপহরণ, উৎপীড়ন, মুক্তিপণ আদায় ও হত্যাকান্ড শুরু হয়। সন্দেহ করা হয়, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে কল্পনাকেও সরিয়ে দিয়ে অপহরণের নাটক সৃষ্টি করা হয়েছে। নতুবা চোখ বাঁধা দুই সহোদরের অপহরণকারীদের হাত থেকে পলায়ন গুলিতে ও তাদের হতাহত না হওয়া, অবিশ্বাস্য ঘটনা। সম্ভবতঃ তারাই বোনটিকে গোপন যাত্রাপথে এগিয়ে দিয়েছে।

এখন জাতীয় পত্রিকাগুলোর আবার সোচ্চার হয়ে বলা উচিত যে, কল্পন অপহরণ ঘটনাটি সন্দেহজনক। এর আড়ালে শান্তি বাহিনী, পিজিপি, পিসিপি ও উইম্যান ফেডারেশনের দ্বারা যে বিপুল সংখ্যক পাহাড়ী ও বাংগালী অপহৃত ও নির্যাতিত হয়েছে ও হচ্ছে, তাদের নাম পরিচয় ও ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ পত্রপত্রিকায় আসা উচিত এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনারোধ, সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি ও তার প্রতিকারের পক্ষেও সুপারিশ থাকা আবশ্যক। অবিলম্বে দুর্ভিক্ষাবস্থার প্রতিকার হওয়াও জরুরী। মনে রাখা উচিৎ পাহাড়ী বাংগালীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্তান ও সমানাধিকারই শান্তির সূত্র। জনসংখ্যাকে দুই সম্প্দ্রায়ের মাঝে ভারসাম্যময় হতে হবে। কারো অগ্রাধিকারকে প্রাধান্য দিলে উত্তেজনার প্রশমন হবে না।

আদিবাসী বর্ষ পালন ও তাত্ত্বিক পরিচয় বিভ্রান্তি

(তাং-রোববার ৫ বৈশাখ ১৪০৬ বাংলা ১৮ এপ্রিল ১৯৯৯ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

১৯৯৩ সাল হলো জাতিসংঘ কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষিত আদিবাসী বর্ষ। বিষয়টি প্রকৃত আদিবসীদের পক্ষে উৎপাসহব্যঞ্জক। পৃথিবীর আদিম জনগোষ্ঠীগুলো, বর্তমান সভ্য, অগ্রসর ও মুরব্বি জাতিগুলোর দ্বারা অতীতে চরমভাবে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়েছে। যারা পালিয়ে আত্মগোপন করে বেঁচে রয়েছিলো, তারাই আদিবাসী অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখে প্রমাণ দিচ্ছেঃ সভ্য আর অগ্রসর মানব সন্তানেরা, তাদের পূর্ব পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, ধ্বংস করেছে বাড়িঘর ও বসতি, দখল করে নিয়েছে তাদের গোটা দেশ। ইউরোপের স্বদেশত্যাগী অভিবাসীরা গোটা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে বাসতি স্থাপন করে, নিজেরাই সংখ্যাগুরু জন শক্তিতে পরিণত। এখন পূর্বের অবশিষ্ট আদি অধিবাসী রেড ইউনিয়ান, মাউরী, আদিম অষ্ট্রেলিয়ান, আর এক্সিমোরা, পর্যুদস্ত, বিতাড়িত, অথবা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু করুণার পাত্র। এই অন্যায় অনাচারের কি কোন প্রতিকার আছে? মানবিক অধিকার আর দরদের কথা, যতই উথলে উঠুক না কেন, রেড ইন্ডিয়ানরা কি তাদের স্বদেশ ভূমি আমেরিকা ফেরৎ পাবে? মাউরীরা কি পুনরায় তাদের স্বদেশ ভূমি নিউজিল্যান্ডের অধিকারী হতে পারবে? আদিম অষ্ট্রেলিয়ানরা কী স্বপ্নেও দেখতে পাবে, ঐ দেশটির নিয়ন্তা পূনরায় তারা নিজেরা? এক্সিমোরা কি ফিরে পাবে তাদের ভূমি আইল্যান্ড ইত্যাদির দখল? বহিরাগত ঔপনিবেসিক দখলদারদের বংশধররা এখন ন্যায় নীতি, মানবিকতা, আইন ও নীতিকথায় সোচ্চার। পূর্ব পুরুষদের স্বদেশ ভূমিতে ফেরার ও তাদের অন্যায়ের প্রতিকার করার কোন উপায় তাদের নেই। এখন নিরূপায় হয়ে তাদেরকে অত্যাচারিতদের সাথে সহাবস্থান করতে হচ্ছে। কিন্তু একটি উপায় অবশ্যই আছে, আর সে হলোঃ পূর্ব পুরুষদের পক্ষে দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা এবং আদিবাসীদের সুযোগ সুবিধা গত অগ্রাধিকার দান। জাপান অনুরুপ মহানুভবতার পথ প্রদর্শন করে স্বীয় ঔপনিবেসিক ইতিহাসের বিকৃতি ও যৌন দাসত্বের দোষ স্বীকার করে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর উচিত অনুরূপভাবে আদিবাসীদের ক্ষতিপূরণ দান করা। কেবল অন্যকে নসিহত করে যাওয়াটাই যথেষ্ট নয়।

আমাদের পার্বত্য অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী জাতিসংঘের আদিবাসী নীতির প্রতি খুবই আকৃষ্ট। সরকারী নীতি হলোঃ বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই। কিন্তু তবু বাংলাদেশী

অবাঙ্গালী সংখ্যালঘু সুধী নেতৃবৃন্দ মোটেও দমিত নন। তারা এক তরফা আদিবাসী হওয়ার দাবীতে সভা সম্মিলন করে যাচ্ছেন। রাঙ্গামাটিতে গত ১৯৯৮ সালের ৯ ও ১০ এপ্রিল বিপুল উৎসাহে আদিবাসী সম্মিলন ও উৎসব হয়ে গেছে, এবং পুনরায় ১৯৯৯ সালের ৭, ৮, ৯ এপ্রিল দ্বিতীয় আদিবাসী সম্মিলন ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জমজমাট মেলা ও আলোচনা সভায় প্রবন্ধ পঠিত হয়েছে দুটি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বাঙ্গালী পন্ডিতরাও তাতে আমন্ত্রিত ও শরিক হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা হলোঃ আদিবাসী ধারণাটি না দুটি প্রবন্ধকারের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, না আলোচক পন্ডিতদের কেউ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। অথচ প্রবন্ধকার উভয়ই পন্ডিত ও স্থানীয় অবাঙ্গালী ব্যক্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের আমন্ত্রিত পন্ডিতজনেরাও আদিবাসী দরদীও সে ধারণা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।

এ থেকে প্রাথমিক ধারণা জন্মে যে উপজাতি পরিচয় সম্বলিত আদিবাসী ধারণাটি, দুই প্রবন্ধকারের দ্বারা জ্ঞাত সারেই উপেক্ষিত হয়েছে। এবং আলোচকরাও বিষয়টির যথার্থতা, সরেজমিনে দেখতে পান নি। এখনকার আদিবাসী দাবীদাররা ভাষা, আচার, আচরণ ও লেবাসে নিজেদের আধুনিক অগ্রসর মানুষ রূপেই উপস্থাপন করেছেন। ডঃ আমিনা মোহসিন তাই যথার্থই প্রশ্ন রেখেছেন, আদিবাসী ভাষায় কারো মুখে একটি কথাও উচ্চারিত হলো না। ডঃ মেঘনাদ গুহ ঠাকুরতা বললেনঃ কেবল কিছু মেয়েই তাদের জাতীয় পোষাক পরে এসেছে, আর পুরুষেরা আধুনিক পেন্ট সার্টে সুসজ্জিত। ডঃ ইমতিয়াজ স্থানীয় পাহাড়ী ভাষায় শিক্ষাদানের প্রস্তাবকে উদ্ভট বলে উড়িয়েই দিলেন। তিনি জানালেনঃ অগ্রসর বাংলাভাষাটিও উচ্চ শিক্ষার উপযোগী নয়। আমাদের পশ্চাদমুখী চিন্তা চেতনা ত্যাগ করে এগুতে হবে।

তিনটি পরিচিতিমূলক সংজ্ঞাঃ উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী আমাদের পার্বত্য সংখ্যালঘুদের পক্ষে খুবই মুখরোচক। ঐ সংজ্ঞা তিনটি আদতে দুই ইংরেজ পন্ডিত, মিঃ আর্থার ফেইর ও টি এইচ লুইন প্রদত্ত। আরাকান লুসাই ও চট্টগ্রামের পর্বতাঞ্চলে এই দুব্যক্তি, দীর্ঘ নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে, সে সবের লিখিত বিবরণ রেখে গেছেন। ওগুলোই এতদাঞ্চল সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য বলে অদ্যাবধি স্বীকৃত। ঐ বিবরণ ও সংজ্ঞা অনুযায়ী স্থানীয় অবাঙ্গালীরা এখনো নিজেদের ভাবেন ও পরিচয় দান করে থাকেন। মুসলিম আমলে এই পাহাড়ী ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুদের কৌম অথবা কবিলা বলা হতো। তারা নিজেদের ভাষা আচার-আচরণ ও ধারণায় একেকটি ক্ষুদ্র জাতিরূপেই মান্য।

বর্ণিত পন্ডিতী সংজ্ঞা ১৯০০ সালের রেগুলেশন নং ১ বা হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের আইনের ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। যদ্দারা এখন এগুলো অপরিহার্য্য সংজ্ঞা। এর প্রবল প্রতাপে দেশের প্রধান সম্প্রদায় বাঙ্গালীরাও উল্লেখিত হোন নন ট্রাইব বা অউপজাতি নামে। স্থানীয় বাঙ্গালীদের সমতলবাসীও বলা হয়ে থাকে। তবে আদিবাসী বা ইনডিজেনাস শব্দটির বিপরীতে বাঙ্গালীরা কী আখ্যায়িত হবে, তা এখন ও পরিষ্কার নয়। ব্যাকরণকে তোয়াক্কা না করে, তা বিদঘুটে অউপজাতি শব্দের মত অ-আদিবাসী হতে

পারে, যার ইংলিশ হলো নন ইনডিজেনাস।

স্থানীয় সংখ্যালঘু অবাঙ্গালীরা চরম উচ্চাকাঙ্খায় বিভ্রান্ত। তারা দীর্ঘদিন যাবৎ ট্রাইব বা উপজাতি সংজ্ঞাটির অনুরক্ত সুফল ভোগী। ট্রাইব হওয়ার সুবাদে তিন সার্কেল ও তিন সার্কেল প্রধানের অধিকার ও মর্যাদা নির্দিষ্ট। এই বলে তাদের প্রত্যেকের মফস্বলে বিনা বন্দোবস্তিতে তিরিশ শতক জায়গার ভোগ দখল প্রাপ্য। জেলা পরিষদ টাস্কফোর্স ও আঞ্চলিক পরিষদে, উন্নয়ন বোর্ডে উপজাতীয় কোটায় চেয়ারম্যান পদ, সদস্য পদ মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী পদ উচ্চ শিক্ষায় লোভনীয় কোটা ও বৃত্তি রিজার্ভ। চাকুরী জমি বন্দোবস্তি ঠিকাদারী পারমিট লাভ অবারিত তবুও অভাবী সাজার কসরত অব্যাহত আছে। অতীতের পশ্চাদপদতা, কাটাতে প্রদত্ত বাড়তি সুযোগ সুবিধা ও অগ্রাধিকার দান ব্যবস্থা সুফল দিচ্ছে। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষের প্রকাশ নেই। বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল, আর বাংলাদেশ আমলের পার্বত্য জীবন মান এক নয়। এখন বিপুল বিস্তর উন্নতি হয়েছে। অন্যায়ের সমালোচনা অন্যায় নয়। তবে উন্নতি ও কল্যাণের স্বীকৃতি না দেওয়াটাও অন্যায়।

কোটি কোটি সংখ্যক বাঙ্গালী জনতা, আর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র হলো চরম বাস্তবতা। সংখ্যালঘুদের কল্যাণে, এই শক্তিটি উদ্বুদ্ধ। কিন্তু উপজাতীয় বৈরী আচরণে তারা হতাশ। স্থানীয় বৈরীতার সাথে বহির দেশীয় বৈরীতা যুক্ত হয়ে দেশের অখন্ডতা বিপন্ন হতে পারে, এই আশংকা থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করতে, সংখ্যালঘুদের কিছু অবদান রাখা জরুরী। প্রতিরক্ষা মূলক জাতীয় সন্দেহ অবিশ্বাস, পাবর্ত্য চট্টগ্রামকে নিয়েই আবর্তিত। তাই দেশ প্রেম মূলক উদ্যোগ স্থানীয় উপজাতীয়দের পক্ষ থেকেই শুরু হতে হবে। তখন সন্তুষ্ট চিত্তে জাতি সন্দেহমুক্ত মনে অবাঙ্গালী জাতি সত্তাগুলোর কল্যাণে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত হবে।

এটা দুঃখজনক যে, বাঙ্গালী চরিত্রে মন্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, চাকমারা বাঙ্গালী পরিচয়ে অনীহ। অন্যান্যদের অবাঙ্গালী চরিত্র অবশ্য পরিষ্কার। ভাষার বিচারে চাকমা ভাষা অবশ্যই বাংলার উপভাষা, যেমনি সাহিত্যের বাংলা ভাষা, আর আঞ্চলিক বাংলা ভাষা এক নয়। তেমনি আঞ্চলিক আর গ্রাম্য কথ্য বাংলাকে, সাহিত্যের বাংলার বিপরীতে ভিন্ন ভাষা জ্ঞান করা হয় না। বাংলার বহুরূপী আঞ্চলিক রূপেরই অন্যতম ধারা হলো চাকমা-বাংলা। এটি ভিন্ন কোন ভাষা নয়। এই পর্বতাঞ্চলে দুধারার ভাষা ও সংস্কৃতি প্রচলিত। প্রথম ধারা হলো চাকমা ভাষা ও সংস্কৃতি যা সাবেক ভারতীয়। দ্বিতীয় ধারা হলো অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি যা তিব্বতী-ব্রহ্মী। তবে বাংলা ভাষাই এই দুই শ্রেণীর লোকের ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম।

পরিধান আর লোকাচার বিচারেও চাকমারা সাবেক ভারতীয়। পুরুষেরা আদিকাল থেকে ধুতি, গামছা, ফতুয়া, ঝুলা ব্যবহারে অভ্যস্ত। আর মেয়েরা খাড়ু, বালা, হাচুলী, নাক ফুল, কানফুল, বাজুবন্দ, আর-আব্রু ঢাকার উপযোগী কাপড়াদির প্রতি অনুরক্ত। বাঙ্গালী কবিয়ালদের মত, চাকমা লোক কবিঃ গেং কুলিরা, দুতারা বাজিয়ে আসর জমিয়ে গান,

পালা গান, ও বারমাসি গেয়ে থাকেন। বাঙ্গালী কবিয়ালদের মত ভঙ্গিতে তারাও অঙ্গভঙ্গি আর ধুয়ার অবতারণা করেন। তাদের বৃহৎ পালাগুলো, সাবেক ভারতীয় মহাকাব্য ধর্মী। অভিবাদন ও সম্বোধন অবিকল হিন্দু মুসলিম অনুকরণ সমৃদ্ধ। সুতরাং বৈচিত্র্যময় বাঙ্গালী চরিত্রের তারাও অংশীদার। অংশতঃ তারা বাঙ্গালী মুসলিম সামাজিক ভাষাতেও অভ্যস্ত। তাদের পদবি বহুলাংশে মুসলিম, যথাঃ খান, দেওয়ান, খিসা, তালুকদার ইত্যাদি।

(৩)

(তাং-শনিবার ১৮ বৈশাখ ১৪০৬ বাংলা ১ মে ১৯৯৯ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

পার্বত্য অবাঙ্গালী লোকদের পৃথক পরিচয়মূলক নাম গুলো আবেগ আপ্লুত বিষয়। সরকারের প্রশাসনিক ভাষায় নির্ধারিত উপজাতিক সংজ্ঞা সাম্প্রদায়িক নাম পরিচিতির বাহিরে সামগ্রিক অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১৯০০ সালে জারিকৃত রেগুলেশন নং ১ এর ৫২ ধারায় উপজাতির অতিরিক্ত সংজ্ঞা রূপে ইনডিজেনাস ও হিলম্যান এর সংযোগ ঘটেছে। তবে এই ত্রয়ী সংজ্ঞার কোন একটিও কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে সুনির্দিষ্ট নয়, এবং সামগ্রিক পরিচিতির ক্ষেত্রেও এগুলোর ব্যবহার প্রশ্ন সাপেক্ষ। তবু খুটিনাটি ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করে স্থানীয় অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী নিজেদের কখনো উপজাতি কখনো আদিবাসী আর কখনো পাহাড়ী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। অথচ মূল আইন পার্বত্য শাসন বিধির ৫২ ধারায় প্রধান দুটি সম্প্রদায় চাকমা ও মগেরা স্বনামেই অভিহিত। এদের বাহিরে কিছু এমন লোককে ইনডিজেনাস হিলম্যান বলা হয়েছে, যারা কোন নির্দিষ্ট নামে উল্লেখিত নয়। এ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয় যে, অবাঙ্গালী পার্বত্য জনগোষ্ঠীর কে কে ট্রাইব বা উপজাতি, এবং কে কে ইনডিজেনাস হিলম্যান বা আদিবাসী পাহাড়ী। চাকমা ও মগেরা স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক নামে উল্লেখিত হওয়ায়, এবং তাদের নামের বিপরীতে সংজ্ঞাভুক্ত নামগুলো বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত না হওয়ায়, এটা নিঃসন্দেহ যে, এ দু সম্প্রদায় অবশ্যই ইনডিজেনাস হিল ম্যান বা আদিবাসী পাহাড়ী উপজাতি নয়। তাদের তবু তাই বলা একটি বিভ্রান্তি।

শাব্দিক অর্থে শাখা জাতি রূপে উপজাতি সংজ্ঞাটি ব্যবহার্য্য। তাত্বিক অর্থে এর ব্যবহার প্রশ্ন সাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে এই সংজ্ঞায়ন অবিতর্কিত নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পন্ডিত প্রফেসার পিয়ের বেসানেত স্বীয় পুস্তকঃ টাইবসম্যান অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস- এ উল্লেখ করেছেনঃ

(ক) উপজাতিদের আদিম সমাজের মানুষ হিসাবেই গণ্য করে গবেষণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমি এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের এই রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের অংশ হিসাবে বিবেচনা করেছি। (সুত্রঃ ঐ মুখবন্ধ শেষ প্যারা)

(খ) যদি কেউ আদিম অর্থে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম ভাবধারা বহন করে আজও যারা বেঁচে আছে তাদের বুঝায়, তাহলে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদেরকে আদিম

বলে বর্ণনা করা সত্যের অপলাপ হবে। (সুত্রঃ ঐ প্রথম পরিচ্ছেদঃ প্রথম প্যারা)

সুতরাং এখন সন্দেহমুক্তভাবেই বলা যায়ঃ চাকমা ও মগেরা তো বটেই অন্যান্য অবাঙ্গালী পার্বত্য চট্টগ্রামী সম্প্রদায়ের কেউই বর্ণিত তিন সংজ্ঞা নামের যোগ্য লোক নয়। আইনের ভাষায় তারা বাঙ্গালীদের বিপরীতে অবাঙ্গালী রূপে সংজ্ঞায়িত হওয়ার যোগ্য। তত্ত্ব অনুযায়ী নতুন সংজ্ঞায়ন আবশ্যক। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল ও জেলা পরিষদ আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞা নাম যথার্থ নয়। এই ভুলের সংশোধন হওয়া জরুরী।

এটা দুঃখজনক যে, তত্ব ও বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যাকে এড়িয়ে লেখালেখি আইন ও প্রশাসনিক পর্যায়ে বর্ণিত সংজ্ঞাত্রয়ের যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। তাই আইনের সংজ্ঞায় স্থানীয় চাকমা মগ ও অন্যান্য অবাঙ্গালীরা উপজাতি, এবং বিপরীতে বাঙ্গালী, নেপালী, ভুটানী, আসামী, মনিপুরী, সাওতাল, গারো ইত্যাদি জনগোষ্ঠী অউপজাতি। প্রশাসনিক ভাবে কেবল জনসংহতি সমিতির তালিকা ভুক্তরাই উপজাতি এবং তজ্জন্য নির্দিষ্ট সুযোগ সুবিধা ভোগের একক অধিকারী হয়েছে। এটা অন্যায় নির্দিষ্টকরণ। এখানে নীতি আদর্শ ও তত্ত্ব উপেক্ষিত। অস্ত্রের ভাষা ও রাজনৈতিক শক্তির জোরেই সংজ্ঞায়ন ও অগ্রাধিকার নির্নীত হয়েছে।

প্রবল রাজনৈতিক প্রতাপ ও স্থানীয় সংখ্যা প্রাধান্যের বলে সরকারীভাবে মগ চাকমা ও ত্রিপুরা সম্প্রদায় বিশেষভাবে সমীহ প্রাপ্ত। এদের ইচ্ছা অনিচ্ছা সন্তোষ আর বিরাগকে অত্যধিক মূল্য দেয়া হয়ে থাকে। এই আনুকুল্যকে প্রাধান্য দিয়ে সরকার মাং বোমাং ও চাকমা সম্প্রদায়ের সমাজপতি রূপে তিন উপজাতীয় সর্দারকে চীফ নিযুক্ত এবং তাদের অধীন উপজাতীয় লোকবসতিকে মাং বোমাং ও চাকমা সার্কেল নামে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। আনুগত্যের বিনিময় ও শান্তি শৃংখলা রক্ষায় সহায়তা দানের পারিশ্রমিক রূপে, আদায়কৃত সমূদয় জুম খাজনার বৃহদাংশ তাদের ভোগযোগ্য করা হয়েছে। সরকারী আনুকূল্যেই পাড়া মৌজা ও সার্কেল ভিত্তিতে, কার্বারী হেডম্যান ও চীফেরা নিযুক্ত, এবং উপজাতীয় প্রজারা সমাজবদ্ধ। উপজাতীয় কোটা ও অগ্রাধিকার বলে, উচ্চ পদ উচ্চ শিক্ষা চাকুরী, জমি বন্দোবস্তি, ব্যবসা ইত্যাদি প্রাপ্য। এভাবে গঠিত আভিজাত্যকে ক্ষমতাসিক্ত, আর্থিক ও বৈষয়িকভাবে লাভজনক করা হয়েছে,

যথা ঃ প্রথাসিদ্ধ সামন্তবাদী প্রাপ্যঃ

(ক) জুম খাজনার অংশঃ
১. চীফ টাঃ ২.৫০
২. হেডম্যান টাঃ ২.২৫
৩. সরকার টাঃ ১.২৫ (জুমিয়া প্রতি দেয় মোট টাঃ ৬.০০)

খ) মাসোহারা
১. চীফ মাসিক টাঃ ৫০০০/-
২. হেডম্যান মাসিক টাঃ ৩০০/-

৩. কার্বারী মাসিক টাঃ ২০০/-

গ) অর্থ দন্ডের অংশ হেডম্যান ২৫% চীফ ৫০%

ঘ) নজর ও সালামীর ক্ষেত্রঃ যা জমি বন্দোবস্তি, বনজ দ্রব্যের পারমিট, সুপারিশ পত্র ও স্থায়ী বাসিন্দা সনদ মঞ্জুরের সাথে সংশ্লিষ্ট। জমি হস্তান্তর ও খরিদ বিক্রির ক্ষেত্রেও নজর সালামী প্রদেয়।

ঙ) প্রত্যেক মৌজায় নিস্কর ৫০ একর প্রথমশ্রেণীর জমি সার্ভিস ল্যান্ড হিসাবে ভোগ দখল করতে দেয়া হয়। এর বাহিরে উপজাতি পরিচয়ে মফস্বলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৩০ শতক জমি বিনা বন্দোবস্তিতে ভোগ দখলের অধিকার দেয়া আছে। খাস পাহাড়ে উপজাতীয় জুমিয়া হিসাবে জমি দখল জুম চাষের মাধ্যমে বনজ সম্পদ ধ্বংস করা পশু পাখী ও পরিবেশের ক্ষতি সাধন করা হয়, তাতে বাধা দেয়া হয় না। এ কাজগুলো আইনতঃ নিষিদ্ধ হলেও কেবল উপজাতীয় জীবন ও জীবিকার স্বার্থে শৈথিল্য প্রদর্শিত হয়। গৃহস্থালী প্রয়োজনে প্রত্যেক উপজাতীয় লোকের বনজদ্রব্য আহরণ ও ব্যবহার বাধাহীন। তবে এ সুযোগকে তারা রোজি রোজগার ও বাণিজ্যিক কাজে অবাধ ব্যবহারে লিপ্ত। জাতিসঙ্ঘ ও আন্তর্জাতিক সমর্থনে, বাড়তি লাভের আশায়, এখন কথিত উপজাতিরা আদিবাসী ও পাহাড়ী পরিচয় ধরে অনুন্নত সর্বহারা সাজার কসরতে সক্রিয়। বছর বছর আদিবাসী হওয়ার প্রচার ও মহরত চলছে। সংগঠনগুলোর নাম রাখা হয়েছেঃ পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি। এবং এজন্য ব্যবহৃত হচ্ছে সরকারী প্রতিষ্ঠান উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট পর্যন্ত। উপজাতি কোটায় নির্বাচিত পরিষদীয় উচ্চ পদাধিকারীরা সরকারী সম্পদ সম্পত্তি ও ক্ষমতাকে ঐ অননুমোদিত কাজে নিয়োজিত করছেন। এর অর্থ কি এটাই যে, যা খুশি তা করতে পারাই পরিষদ চেয়ারম্যান, এমপি, মন্ত্রী ও উসাই কর্তৃপক্ষের আয়ত্বাধীন বিষয়? তা হলে তো উপজাতীয় কোটাও সুযোগ সুবিধা নৈতিক নয়, খোশামোদী খয়রাতী ব্যবস্থা।

চ) উচ্চপদ ও ক্ষমতার পারিশ্রমিক রূপে দামী গাড়ী বাড়ী, পদমর্যাদা ও বড় অংকের বেতন ভাতা উপভোগ ইত্যাদি অপ্রাপ্য সুবিধাদি কার্যতঃ মনোরঞ্জন মূলক ব্যবস্থা। এই ভোষণ ব্যবসথার কোন সুফল নেই।

আদি অনাদি রহস্য
(দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

আদি বাসিন্দা আর আদিবাসী সংজ্ঞাদ্বয়ের ভিতর অর্থগত তফাৎ আছে। আদি বাসিন্দা অর্থ অনেক দীর্ঘ অতীত কাল থেকে বসবাসরত লোক। আদিবাসী অর্থঃ ঐ সব আদিম স্বদেশী লোক, যারা সভ্যতা বিবর্জিত, টাবু মানে ও টুটেমে বিশ্বাস করে। টুটেম হলোঃ জন্তু-জানোয়ার, বস্তু, ফলমূল জাত পূর্ব পুরুষের ধারণা, আর টাবু হলো ঐ পূর্ব পুরুষ-মূলের ব্যক্তি বস্তু ফল মূল জন্তু জানোয়ারকে আহার ও পানীয় করা বর্জন এবং সম মূল থেকে স্ত্রী ও স্বামী গ্রহণ না করা এই নিষেধাজ্ঞা। এই অর্থের ভিত্তিতে বাঙ্গালীরা আদিবাসী নয়, তারা আদি বাসিন্দা। বাঙ্গালীদের আদি অনন্তকালের স্বদেশ বাংলাদেশ। তাদের এই আদিবাস ও স্বাদেশিকতা পার্বত্য চট্টগ্রামেও বিস্তৃত। বাঙ্গালী অধ্যুষিত বৃহত্তর বাংলা ভূখন্ডের সংলগ্ন বাহির অঞ্চলেও বাঙ্গালী অধ্যুষিত অঞ্চল আছে, যেমন বিহারের পূর্নিয়া, আসামের গোয়াল পাড়া ও কাছাড়, এবং উত্তর আরাকানের মংডু ও আকিয়াব। বাঙ্গালীরা আসাম ও আরাকানে অভিবাসী বলে, স্থানীয়ভাবে বাঙ্গাল-খেদা আন্দোলনের শিকার। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, খোদ বাঙ্গালীর স্বদেশ ভূমি বাংলার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও বাঙাল খেদা আন্দোলন সক্রিয় এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদি মালিক চট্টগ্রামী বাঙ্গালীরাও নিজেদের আদি মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে উপজাতিদের দ্বারা উপেক্ষিত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কখনো বিদেশী ভূখন্ডরূপে চিহ্নিত ছিলো না। অতীতে এটি এবং সমতল চট্টগ্রাম অঞ্চল কখনো আংশিক আর কখনো সার্বিকভাবে হয় আরাকানী নয় তো ত্রিপুরী দখলাধীন হয়েছে। পরে মুসলিম ও বৃটিশ রাজশক্তি এতদোভয় অঞ্চল দখল ও শাসন করেছে। কিন্তু এতদাঞ্চল কখনো ভিন দেশ হয়নি এবং ছিলো না। বিদেশী বিজাতীয় দখলকালেও এতদাঞ্চল ছিলো চট্টগ্রাম, বাংলা ও বাঙ্গালীর আপন ভূমি। প্রশাসনিকভাবেও এর বাংলা পরিচিতি অব্যাহত ছিলো। ভৌগোলিকভাবেও এটি চিরকাল ছিলো অখন্ড চট্টগ্রাম ও বাংলার ভূখন্ড। তাই এটিকে কোনদিন আরাকান, ত্রিপুরা, ও লুসাই অঞ্চলের সাতে সংযুক্ত করা হয়নি। এর বাংলা ভূচরিত্র আগে পরে অক্ষুণ্ন রেখে বাংলার সাথে আগাগোড়া চিরকাল সংযুক্ত করে রাজনৈতিক ভাগ্য নিরূপণ করা হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবেও পাহাড় ও সমতল মিলে বৃহৎ চট্টগ্রাম পরস্পর নির্ভরশীল। আরাকান, লুসাই ও ত্রিপুরা এর ক্রমিক উচ্চ ও দূর্গম পশ্চাদভূমি। মানব বসতির বিচারেও বটে এই অঞ্চলগুলো বিরূপ স্বভাব ও ভাষা চরিত্র সম্পন্ন। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম যেমন আদি চট্টগ্রামী বাংলা ভূমি, তেমনি এর

পশ্চাদ অঞ্চল আদি অবাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকারূপে পৃথক। এতদাঞ্চলে অবাঙ্গালী সংখ্যা প্রাধান্য বৃটিশের সৃষ্ট কৃত্রিম। ঐ আমলে বিজাতীয় অভিবাসন না ঘটলে, আর পৃথক জেলা রূপে উত্তরে দক্ষিনে সীমারেখা টানা না হলে, এখনো অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু হয়েই থাকতো। এখন পুনরায় চট্টগ্রামের সাথে এলাকা যোগ বিয়োগ করে, প্রশাসনিক অঞ্চল পূনর্গঠন করা হলে, অবাঙ্গালী সংখ্যাগরিষ্ঠতা তছনছ হয়ে যাবে, যা প্রয়োজনে করা অসম্ভব নয়। সংখ্যায় কম হলেও চট্টগ্রামীরাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দা। উপজাতিরা নিজেদের আদিবাসী দাবী করে, অথচ সে সংজ্ঞাটির তাত্বিক অর্থ হলো স্থানিয় আদিম অসভ্য আদি বাসিন্দা। মৌলিকভাবে তারা চট্টগ্রামী মূলের লোকও নয়।

বৃহত্তর চট্টগ্রাম পর্বতে ও সমতলে বিস্তৃত। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র বিকল্প কোন নাম পরিচয় নেই। ১৮৬০ সালে পর্বতে সমতলে বিভক্ত হয়ে দুই স্বতন্ত্র জেলা বা অঞ্চলে পরিণত হলেও, উভয় অঞ্চল পরিচয়মূলক মৌলিকত্বকে ধারণ করে, এখনো পর্বত ও সমতল বিশেষণ নিয়ে সেই আদি ভৌগোলিক চট্টগ্রাম নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম চাটিগাঁ আর চিটাগাং যা-ই বলা হোক না কেন, এই নামের বাহিরে তার কোন ভিন্ন পরিচয় নেই। এই আঞ্চলিক নাম পরিচয়, ভূগোল ও ইতিহাস খ্যাত প্রাচীন। দক্ষিণ পূর্বে লুসাই আরাকান উত্তরে ফেনী নদী আর পশ্চিম জুড়ে বঙ্গোপসাগর। এই চৌহদ্দির ভিতর অবস্থিত ভূভাগটি সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর চট্টগ্রাম। এই ভূভাগের আদি ও খাঁটি বাসিন্দা চট্টগ্রামী জনগোষ্ঠী। এই চট্টগ্রামী মৌলিকত্বের বিস্তৃতি ও অধিকার অবিতর্কিত। এই ঐতিহাসিক মৌলিকত্ব চ্যালেঞ্জযোগ্য নয়। প্রশাসনিক বিভক্তি আর অঞ্চল ভাগ সত্ত্বেও, চট্টগ্রামী অধিকার ও মৌলিকত্ব অভিভক্ত আছে। অধুনা মূল ভূখন্ডের বিভক্ত পর্বতাংশে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীভুক্ত জনসংখ্যার প্রাধান্য ঘটার হেতু অভিবাসন। আর অভিবাসন জাত সংখ্যা প্রাধান্যে মৌলিকত্ব রদ বা রহিত হয়না। মূল চট্টগ্রামী জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার বলে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সর্বক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার প্রাপ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের উপেক্ষিত আর পরবাসীর মর্যাদা নিতান্তই অগ্রহনীয়। চট্টগ্রামীদের এই মর্যাদার প্রশ্নে অবশ্যই আন্দোলন হতে পারে। তাদেরতুলনায় উপজাতি বা অবাঙ্গালীরা নিতান্তই ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু ও বহিরাগত লোক। তারা চট্টগ্রামীদেরই আশ্রিত জন। প্রশাসনিক কারণে অঞ্চল বিভক্তি, আর জুম কৃষির জন্য পাহাড় বাসের বদৌলতে, সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে পার্বত্য প্রান্তে অবাঙ্গালীরা প্রাধান্য লাভ করেছে। অথচ প্রশাসনিক ভাগ মানে, বাঙ্গালী আর অবাঙ্গালী দুই পৃথক জনগোষ্ঠীর মাঝে অঞ্চল ও এলাকা বন্টন নয়। এখন কৌশলে তা-ই দাবী করা হলে, এই কাবু নীতির জবাব হলোঃ অবাঙ্গালী উপজাতিরা বৃটিশ আমলের বহিরাগত আদিবাসী বংশধর। বৃটিশ আমলের ইতিহাসে তাদের অভিবাসন স্বীকৃত। তারা মিঃ কক্স লালিত আরাকানী শরণার্থী, আজ বিতাড়িত ও আশ্রিত জনগোষ্ঠীর আধুনিক প্রজন্ম। মূল বাসিন্দার মত দেশের উপর কোনরূপ মৌলিক ভূম্যাধিকার বা অগ্রাধিকার তাদের কারো পক্ষেই প্রাপ্য নয়। দেশের মানুষ তাদের সে অধিকারে সীমাবদ্ধতা আরোপের অধিকারী। অনুরূপ বৈষম্যের পথ প্রদর্শক তারা নিজেরাই।

এটা দুঃখজনক সত্য যে, পার্বত্য সংকট আর উপজাতীয় বাড়াবাড়িতে ও সমাধানের ঐতিহাসিক পথ খোঁজার প্রতি দেশ ও জাতি উদাসিন। চট্টগ্রামীরাও আত্মবিস্মৃত জনগোষ্ঠী। উপজাতিরা মূল দেশী জনগোষ্ঠী নয়। নিকট অতীতের এই ইতিহাস দুস্প্রাপ্য নয়। তাদের সমানাধিকার দেয়া, উদারতার বিষয়, কিন্তু পদ সংরক্ষণ অগ্রাধিকার ও বাঙ্গালীদের উপর প্রাধান্যদান অন্যায় ও বাড়াবাড়ি।

২) (তাং-রোববার ১০ শ্রাবণ ১৪০৬ বাংলা ২৫ জুলাই ১৯৯৯ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

আগে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ছিলো অনাবাদি পাহাড় ও বনাঞ্চল। বসতি অঞ্চল রূপে সমতল চট্টগ্রামই গণ্য ছিলো। সমতলে জায়গা জমির প্রাচুর্য ও জন সংখ্যার স্বল্পতা হেতু দুর্গম ও বিপজ্জনক পাহাড়াঞ্চলে, বসবাসের প্রয়োজন ছিলো না। হিংস্র জন্তু জানোয়ার ও ম্যালেরিয়ার ভয় ছাড়াও সমাজহীন নির্জনতাও ছিলো এতদাঞ্চলকে এড়িয়ে থাকার কারণ। তবে এই বিরূপ পরিবেশে জুমজীবি বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি ছিলো না। তবে ঐ বহিরাগত জুমিয়াদের অবাধে যাতায়াত ও চাষাবাদ করতে দেয়া হতো না। জুম নোয়াবাদ নামে অস্থায়ী অনুমতি এবং তুলায় বা নগদে জুমিয়া পরিবার প্রতি কর দানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। ঐ কর ও তুলা সংগ্রহের জন্য প্রথমে ইজারাদার নিযুক্ত হতেন। পরে উপজাতীয় সর্দারদের, কিছু পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে সে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথমে জুমিয়ারা ফসল তোলার শেষে, নিজেদের সীমান্ত পারের মূল বসতি অঞ্চলে, বিশেষতঃ লুসাই ও চীন পাহাড় এলাকায় ফেরত চলে যেতো, এবং পরবর্তী বছরের জুম মওসুমে আবার ফিরে আসতো। এই যাওয়া আসার ভিতর তাদের অনেকে বসতি গড়ে, এতদাঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। তবে তাদের সংখ্যা ছিলো অতি নগণ্য।

বনজ দ্রব্য ও জুম পণ্যের ব্যবহারিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে চট্টগ্রামী লোকেরা প্রাচীন কাল থেকেই বনাভ্যন্তরের সাথে সম্পর্কিত। জুমিয়াদের সাথে তারা পণ্য খরিদ বিক্রির কারবারে লিপ্ত ছিলো। এ হেতু সুদুর দেমাগ্রী, শিলছড়ি, কাপ্তাই বাজার, থানচি, বলিপাড়া ইত্যাদি গভীর বনাভ্যন্তরে তারা বাজার বসতি ও উপনিবেশ গড়ে তুলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম বৃটিশ জেলা প্রশাসক মিঃ টি এইচ লুইনের লিখিত বিবরণীতে অবগত হওয়া যায়, কুকি ও লুসাই উৎপাতে প্রত্যন্ত ও গভীর বনাঞ্চলের ঐ চট্টগ্রামী বাঙ্গালীরা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও উপদ্রুত হতো। এর প্রতিক্রিয়ায় সমতলে বাজারগামী উপজাতিদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার অশংকা দেখা দিতো। তাতেই মান্য যে সীমিত হলেও প্রাচীনকাল থেকেই নদী তীরবর্তী পাহাড়াঞ্চলে চট্টগ্রামীদের বসবাস ছিলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে উত্তর আরাকানের চীন পর্বতাঞ্চলে স্থানীয় মগ ও চাকমা সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে। রাজশক্তির সহায়তা প্রাপ্ত মগদের হাতে চাকমারা ভীষণভাবে পর্য্যুদস্ত হয়, এবং তাতে সর্বপ্রথম তাদের কিছু লোক জনৈক শেরমস্ত খাঁর নেতৃত্বে দেশ ত্যাগ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই শেরমস্ত খাঁ চট্টগ্রামের মোগল শাসক জুল কদর খানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন, যিনি তাকে দক্ষিণ রাঙ্গুনীয়ার

কোদালা উপত্যকায় ১৭৩৭ সালে একখন্ড অনাবাদি পাহাড়ী জমি বন্দোবস্ত দান করেন, যে জায়গাটি বন্দোবস্তি সূত্রে তরফে শুকদের রায় নামে খ্যাত হয়। তথাকার শুক বিলাস, রাজভিলা ও রাজস্থলী এলাকা তারই অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল। এই প্রথম দলের চাকমা অভিবাসীদের সংখ্যা ছিলো অতি নগণ্য। যাদের বংশধরেরা এখনো ঐ অঞ্চলে আছে। বর্ণিত শেরমস্ত খাঁকে চাকমা লোক গীতিতে নিম্নাকারে স্মরণ করা হয়ে থাকে, যথাঃ

আদি রাজা শেরমস্ত খাঁ
রোয়াং ছিলো বাড়ি।
তারপর শুকদেব রায়
বান্ধে জমিদারী।

নাফ নদীর দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত রোয়াং বা রোসাং রাজ্যের উত্তরাংশে কালাদন নদী উপত্যকার কথিত মইসাগিরি অঞ্চল ছিলো চাকমা অধ্যুষিত। এটা ছিলো চীন পাহাড়ের দক্ষিণ ঢাল। চাকমা প্রতিপত্তি ও স্বাধীন আচরণে, রোসাং রাজ ও শাসক জাতি মগেরা তাদের আনুগত্যের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েন। এরই পরিণতিতে একদা ঐ চাকমা অঞ্চল আক্রান্ত ও সেখান থেকে তাদের উৎখাত করা হয়। ঐ উৎখাতকৃত চাকমাদের বৃহদাংশ নিকটবর্তী চট্টগ্রামী দূর্গম পর্বাতঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে ও কিছু লোক প্রতিপক্ষের হাতে বন্দি হয়। এদেরই এক ক্ষুদ্র পলাতক অংশের নেতা হলেন শেরমস্ত খাঁ। বর্ণিত মঘী আক্রমণ ও বিতাড়নের স্মারক রূপে এখনো গীত হয় নিম্নোক্ত চাকমা গীতিকাটি যথাঃ

'ঘরত গেলে মগে পায়,
ঝারত গেলে বাঘে খায়,
বাঘে ন খেলে মগে পায়
মগে ন পেলে বাঘে খায়।
এলে মৈসাং লালচ নেই,
ন এলে মৈসাং কেলেচ নেই,
চল ভেই লোগ চল যেই,
চম্পক নগর ফিরি যেই।

এখানে এই গান সূত্রে চাকমাদের আদি পিতৃভূমি রূপে কোন এক চম্পক নগরের কথা জানা যাচ্ছে, যে দেশটির প্রতি তারা চিরকাল অনুরক্ত। কিন্তু সে চম্পক নগরের কোন হদিস নেই।

চাকমা মগ ও আরো আরাকানী ক্ষুদ্র আদিবাসীদের স্বদেশ ত্যাগ ও বাংলা অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণের দ্বিতীয় কারণ হলো, বার্মায় আভারাজ্য কর্তৃক ১৭৮৪-৮৫ সালে আরাকান আক্রমণ দখল ও স্থানীয় লোকদেল উপর ব্যাপক নির্যাতন অনুষ্ঠান। তখন প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আরকানী উদ্বাস্তুরূপে চট্টগ্রামে সীমান্তের পাহাড় ও বনে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই উদ্বাস্তু সমস্যারই শেষ পরিণতি হলো ১৮২৪ সালের প্রথম বৃটিশ বার্মা যুদ্ধ। তাতে আরাকান বিজিত হয়ে ভারতের অন্যতম প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে, এবং তা ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তা-ই থাকে।

চাকমারা বৃটিশ আমলের শুরুকাল পর্যন্ত জাতিগতভাবে ছিলো আরাকানী, আর তাদের প্রধান অংশ তথাকার বাসিন্দা। এর পক্ষে অকাট্য প্রমান হলোঃ জনৈক চাকমা প্রধান শের জব্বার খানের সীলমোহর। তাতে আরবী বর্ণ ও ভাষায় লেখা আছেঃ রোসান, আরাকান, আল্লাহু রাব্বি, শের জব্বার খান, ১১১১। মঘী সনের হিসাবে তার সে ক্ষমতারোহনের সময় হলো ১৭৪৯ খ্রীঃ সন। প্রচলিত ইতিহাস হলো তিনি ১৭৬৩ বা ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, যে সালটিতে বাদশা শাহ আলম বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ও নেজামত, ইস্ট ইন্ডিয়া, কোম্পানীর নামে মঞ্জুর করে সনদ প্রদান করেন। সুতরাং এ কথা অকাট্য সত্য যে, চাকমাদের প্রধান অংশ আরাকান ত্যাগ করে বৃটিশ আমলের প্রাথমিক বছরগুলোতে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছে। তারা মূল চট্টগ্রামী বা বাংলাদেশী লোক নয়।

চাকমা রাজা মাননীয় ভূবন মোহন রায়, স্বীয় পুস্তিকা; চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসে ও উল্লেখ করেছেনঃ ইতিপূর্বে বার্মায় চাকমাদের একটি রাজ্য ছিলো। মিঃ আর্থার ফেইর ও টি এইচ লুইন ও নিজেদের অনুসন্ধানী বিবরণে বলে গেছেনঃ চাকমাসহ অধিকাংশ স্থানীয় নয়, আরাকানী মূলের লোক।

এখন আরেকটি প্রশ্ন এই যে, চাকমা সর্দারদের মূসলিম নাম খেতাব আরবী বর্ণ, ভাষা ও ইসলামের প্রতি সংশ্লিষ্ট হাওয়ার সূত্র কী? শেরমস্ত খাঁ থেকে ক্রমান্বয়ে দশজন রাজা ও রাণীর এই ইসলামী ঐতিহ্য ধারণ বিস্ময়কর। এছাড়াও গোটা চাকমা সমাজ ভাষা আচার-আচারণে বহু ক্ষেত্রে স্থানীয় মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির অনুসারী। মুসলিম প্রতিবেশী অন্য কারো মাঝে অনুরূপ সংমিশ্রন নেই। অন্যরা চাকমাদের মত ঈশ্বর বা ভগবানকে খোদা বলেন না। সম্বোধন আর অভিবাদনে ও বলেন না হুজুর ও সালাম ইত্যাদি।

এই সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারটির রহস্যোদঘাটন এখনো গবেষণা সাপেক্ষ। তবে আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানী অভিমত হলোঃ চাকমা সর্দার গোষ্ঠী কোন প্রাচীন মুসলিম অভিজাত বংশোদ্ভুতই হবেন। তারা বৈবাহিক সূত্রে চাকমাদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে গেছেন। ঐ সর্দার বংশীয় আত্মীয় কুটুম্বরা হলেন খান দেওয়ান ও খীসা। খীসা শব্দটি ফার্সি, খেশ, বহু বচনে খেসা থেকে অপভ্রংশ। এর অর্থ আত্মীয় কুটুম্ব।

এখন এই সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব যে, চট্টগ্রামীরাই পর্বতাঞ্চলের আদি বাসিন্দা। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম অভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চল। এখানে চট্টগ্রামীদের অগ্রাধিকার প্রাপ্য।

সম্প্রতি জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান, পুরানবস্তি বাসী চট্টগ্রামীদের প্রতি দরদ ভারাক্রান্ত হয়ে, তাদের সমিতিবদ্ধ তালিকাভূক্তির একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। হায়রে চট্টগ্রামী বাঙ্গাল, আর কত ফাঁকিতে নাচবি। মরতে মরতে উজাড়, তবু বৈরীদের প্রতি অন্ধ আস্থা।

চট্টগ্রামীদের মাঝে হাতে গোনা কয়েকজন লোক মাত্র উপজাতীয় গুরুর ভক্ত। এই ভক্তরা সাধারণ চট্টগ্রামীদের বিভ্রান্ত করতে মন্ত্রমুগ্ধের মত কানমন্ত্র ছড়াচ্ছেঃ আমরা পিছনে পড়ে আছি। সন্তু বাবুরা মদদ যোগালে উপকৃত হবো। এতো ব্যাপক দাবী দাওয়া অর্জিত হয়েছে। একদিন স্বাধীন জুম্মল্যান্ড হয়ে যেতেও তো পারে। তারা আমাদের সমর্থন চায়। কেন আমরা শত্রু হবো, সমর্থন দেন! অনেক সাহায্য সহায়তা পাওয়া যাবে। সেটেলার বাঙ্গালীরা চলে গেলে, আমরাই একা বাঙ্গালী কোটা ভোগ করবো। তাতে আমাদের লাভ

ছাড়া ক্ষতি নেই। আমরা পাহাড়ী বাঙ্গালী চিরকাল ভাই ভাই ছিলাম। শান্তিতে ছিলাম। সেটেলারদের বাড়াবাড়িতেই শরীকী দূর্ভোগে ভূগেছি। এখন থেকে মিত্রতার দ্বারা সে ক্ষতিপূরণ করে নিতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

চাতুর্য্য আর কানমন্ত্র গোপন থাকছে না। অতি উৎসাহী কেউ কেউ মাঝে মধ্যে বাবুজির কদমবুচিও করছে, আর কেউ কেউ তুহফা হাদিয়াও পাঠাচ্ছে। তাদের হুশ নেইঃ সেটেলারদের তাড়ান গেলে, তারা বলির পাঠাই হবে। চট্টগ্রামীরা জামাই আদর পাবে, আর বাংলাদেশ এখানে টিকে থাকবে না, সে এক আকাশ কুসুম স্বপ্নাশা।
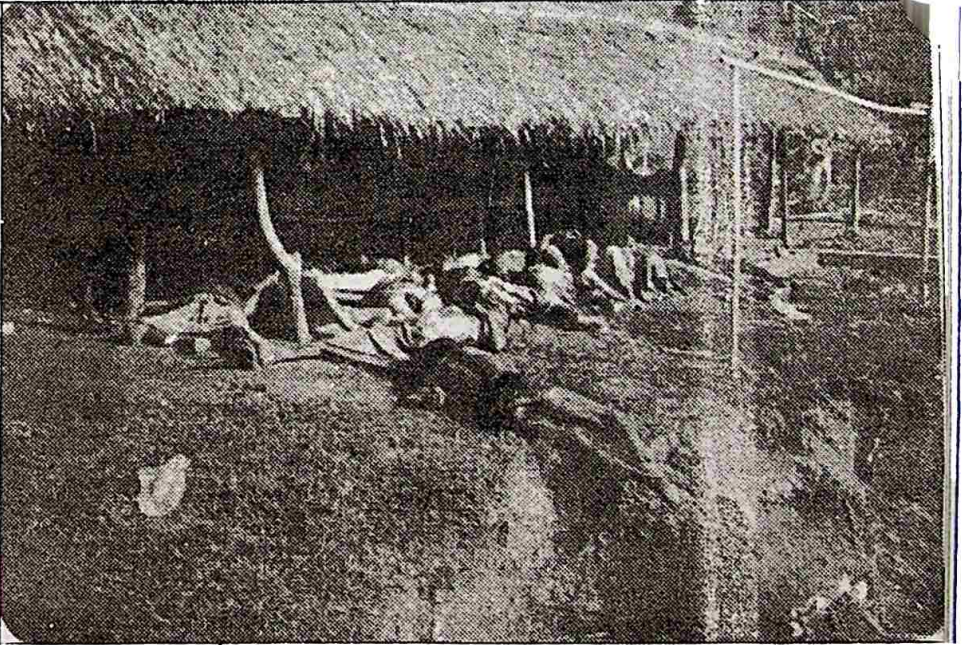
উপজাতীয়দের নৃশংসতায় নিহত বাঙ্গালীদের লাশের স্তূপ

উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী পরিচিতি রহস্য

(তাং- শনিবার ২৫ বৈশাখ ১৪০৬ বাংলা ৮ মে ১৯৯৯ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

বাংলাদেশের ৯৯% মানুষ বাঙ্গালী-জাতি-গোষ্ঠীভূক্ত লোক, আর বাকি ১% হলো অবাঙ্গালী, তথা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীভূক্ত সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘু ভিন্ন-জাতি-গোষ্ঠীভূক্ত এই লোকদের যথার্থ পরিচয় হলো তারা অবাঙ্গালী। সামগ্রিকভাবে এদের স্বতন্ত্র পরিচিতি জ্ঞাপণে অবাঙ্গালী শব্দ বা বিশেষণটাই যুতসই। তবে চাকমা সম্প্রদায় বাংলা ভাষা সংস্কৃতির অনুসারী হওয়ায়, তাদের অবাঙ্গালী দলভুক্ত হওয়া বিতর্কিত বিষয়। অবশ্য তারা নিজেদের বাঙ্গালী মানতে নারাজ। তবে এঁটাও সত্য যে, ভাষা ও লোকাচারের বিচারে তারা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে পৃথক। চাকমা ছাড়া অন্যান্যদের ভাষা হলো তিব্বতী বর্মী শ্রেণীভূক্ত। কেবল চাকমারাই সাবেক ভারতীয় ভাষা ভাষী যা আঞ্চলিক বাংলার অনুসারী প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের উদাহরণ হলো ধূতি ও গামছা জাতীয় পোষাক, এবং খাড়ু, হাচুলী, বাজুবন্ধ ইত্যাদি জাতীয় অলংকার, যা চাকমা সমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। চাকমা লিপিটি ও ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির একটি সংস্করণ বলে ধারণা। এই প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য হলো, একটি বদ্ধমূল উত্তরাধিকার, যা থেকে তাদের ভারতীয় মূলের লোক হওয়া নিশ্চিত হয় এবং ঐ মূলটি বাংলা ভাষী অঞ্চল ঘেষেই কোথাও অবস্থিত ছিলো বলে ধারণা করা যায় যেখানে বাংলা হিন্দি ও ভাওয়াইয়া ভাষার মিশ্র ব্যবহার বিদ্যমান। উদাহরণরূপে উল্লেখ্য যে, হিন্দি হাম ও হামি, চাকমা আমি, হিন্দি তুম তুমহি, চাকমা তুমি শব্দ বহুবচন জ্ঞাপক। ভাওয়াইয়া ভাষাতেও তাই। হিন্দি ভাষায় উত্তম পুরুষ ক্রিয়াপদে 'ং' বর্ণ যোগ হয়। চাকমা ও ভাওয়াইয়াতেও অবিকল তাই। বিশেষ্য বিশেষন, সর্বনাম ও অব্যয় শব্দের প্রকরণে এরূপ অজস্র সাদৃশ্য ও সমতা বিদ্যমান। তাই অস্বীকার করা হলেও, পূর্ব উত্তর ভারতীয় সমাজ থেকে উদ্ভুত বলে চাকমা সমাজকে বাঙ্গালী জাতির জ্ঞাতি লোক ভাবা যায়। তারা কোনক্রমেই তিব্বত ব্রাহ্মী সমাজ ও সংস্কৃতিভূক্ত লোক নন। তবে তাদের সাথে বর্তমান রাজনৈতিক একাত্মতা সাময়িক যোগসূত্র মাত্র। পরিস্থিতি পাল্টালে এ একাত্মতা ভাঙ্গনের সম্মুখীন হবে বলা যায়।

সংখ্যালঘুরা সারাদেশে জনসংখ্যার ১% হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এককভাবে তাদের অর্ধেকের অবস্থান ও স্থানীয়ভাবে তাদের সংখ্যা গুরু হওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। পার্বত্য উপজাতিদের শক্তিমত্তার অতিরিক্ত কারণ হলোঃ এলাকাটির দুর্গমতা ও সীমান্ত বর্তী অবস্থান। প্রশাসনিকভাবেও তারা দীর্ঘদিন যাবৎ সহযোগী ক্ষমতাভোগীর মর্যাদায়

আসীন। বাংলাদেশের পক্ষে এগুলোই বিরূপ পরিস্থিতির কারণ। প্রাদেশিক আইন ১৯০০ সালের রেগুলেশন নং ১ ও তার সৃষ্ট দায় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের আমল দেয়ার কোন বাধ্যবাধকতাই ছিলো না এবং এ ভাবাও জরুরী ছিলো যে, ভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ভূক্ত লোকদের দেশের দুর্গম সীমান্তে অবস্থিত ১/১০ অঞ্চলে সংখ্যা গুরু হয়ে থাকা বিপজ্জনক হতে পারে। বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম রহস্যই ভিন্ন জাতিগত প্রাধান্য সমৃদ্ধ। শিশু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীভূক্ত লোকদের জুম্ম জাতিত্বের দাবী ও আঞ্চলিক ক্ষমতা লাভের উচ্চাভিলাষে, সশস্ত্র বিদ্রোহের সুচনা হয়। এই হঠকারী ব্যবস্থারই বিকল্প হলো বাঙ্গালী জনবন্যায় তাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে দেয়ার চেষ্টা। এখন প্রমাণিত ঃ খোশামোদ তোষামোদ ও সুযোগ সুবিধায় ভাসিয়ে দেয়া, এই সুচিত বিদ্রোহের সমাধান নয়। তাতে একদল খুশি আর অন্য আরেক দল বর্ধিত দাবী নিয়ে গন্ডগোলে সক্রিয় হবে। বিচ্ছিন্নতার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। যেমন চুক্তি সম্পাদন সত্বেও একদল বিদ্রোহী বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে এখন লড়ছে। এই তো নতুন বিদ্রোহের পূর্বাভাস। সুতরাং স্বপক্ষের শক্তি বৃদ্ধিতে শান্তির উপায় খোঁজা আবশ্যক। কথিত শান্তিচুক্তি স্থায়ী শান্তি উপহার দিবে, এঁটা সরল সাধু আশাবাদ। শান্তি চুক্তির ব্যর্থতা কাম্য না হলেও, তার প্রক্রিয়া প্রতিপক্ষের দ্বারা শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং সতর্কতার প্রয়োজন আছে। তলিয়ে দেখতে হবে প্রতিপক্ষীয় দাবী ও দেন দরবারের রহস্য কী।

বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীভূক্ত বিভিন্নভাষী পার্বত্য বিদ্রোহীরা নিজেদের স্বার্থ ও পৃথক জাতীয়তার যুক্তিরূপে যে বক্তব্য পোষণ করে তা হলোঃ ক) বাঙ্গালী ও বাংলাদেশ জুম্মদের সাধারণ প্রতিপক্ষ। তারা এই প্রতিপক্ষের দ্বারা শোষিত, শাসিত ও উৎপীড়িত। এর বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই প্রয়োজন। এই ঐক্যবদ্ধতার সূত্র হলো জুম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ।

খ) পেশাগতভাবেই জুমজীবিরা পাহাড়াশ্রয়ী, এবং লাঙ্গল চাষী বাঙ্গালীরা সমতলবাসী। আদিকাল থেকেই উভয়ের বসবাস ও জীবনাচার পৃথক। প্রশাসনিকভাবেও পাহাড় ও সমতলের বিধি ব্যবস্থা হামেশা ভিন এবং পাহাড়ী জাতি-গোষ্ঠীভূক্ত লোকেরা স্বশাসন ভোগ করেছে। সর্দার হেডম্যান ও কারবারীদের দ্বারাই তারা দেশ ও সরকারের সাথে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের স্বাধীন গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা মানে বাঙ্গালী আধিপত্যের শাসন। তাই ধারণা হলোঃ পাহাড় ও পাহাড়ী সমাজে এই বাঙ্গালী শাসন কার্যকরী হলে, এখানকার ক্ষুদ্র ও ভিন্ন জাতি সত্তাগুলোর স্বাধিকার ও অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। এরই প্রতিকারে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী শক্তিকে আন্দোলনের মাধ্যমে জুম্মদের স্বায়ত্ত শাসন প্রদানে বাধ্য করতে হবে, এবং সাথে সাথে সেনা ও বাঙ্গালী উপস্থিতি রুখতে হবে।

গ) চিরকাল পার্বত্য চট্টগ্রাম পৃথক শাসিত সংখ্যালঘু অঞ্চল। এখানে সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগত প্রাধান্য, একটি দীর্ঘস্থায়ী চিত্র। এটিকে বাঙ্গালী প্রধান অঞ্চলে পরিণত করার সরকারী প্রবণতা, সংখ্যালঘু স্বার্থের পরিপন্থী। এই প্রবণতাকে ব্যর্থ করে দেয়াই স্বায়ত্ত

শাসন বা আত্ম নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা লাভের উপায়।

ঘ) স্বশাসন ব্যবস্থা কায়েমের পথে ধাপে ধাপে এগুতে হবে। প্রথম ধাপেই চূড়ান্ত সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা লাভের পথে বাংলাদেশ সংবিধান হলো প্রথম বাধা। এটিকে এড়াবার উপায় হলো দেশ ভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রীয় আন্দোলন গড়ে তোলা ও সে পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং এই অন্তরবর্তী কালের জন্য স্থানীয় শাসন কাউন্সিল ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা। তবে এই গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি হবে পদ ও ক্ষমতা সংরক্ষণ এবং প্রাধান্য লাভ।

সরকারী পক্ষে এর বিকল্প চিন্তা চেতনা থাকা আবশ্যক। আত্মসমর্পন ও নতজানুনীতি জাতীয় স্বার্থ রক্ষার সহায়ক নয়। কৌশল ও দৃঢ় নীতি গ্রহণ মানে সংখ্যালঘু উৎপীড়ন নয়। প্রচলিত গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি ও সংবিধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশের অখন্ডতা ও জাতীয় একতাকে কোন ভাবেই ক্ষুন্ন করা যাবে না। ঔপনিবেসিক আইন ও রীতি পদ্ধতির অবসান ঘটাতে হবে। উপজাতীয় প্রথা ও শাসনের বিকল্প হিসাবে স্থানীয় শাসন অনুসরণীয়। সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও কোটা পদ্ধতি হবে পরিত্যজ্য। একমাত্র রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ ও সাংবিধানিক আইনই বহাল যোগ্য। তবে পশ্চাদপদ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী রূপে তাদের কেবল নির্দিষ্ট মেয়াদ ভিত্তিক কতিপয় সুবিধা সুযোগ অবশ্য প্রদেয়।

হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের ৫২ ধারার ভুল ব্যাখ্যার দ্বারা পার্বত্য সংখ্যালঘুরা এক সাথে সাম্প্রদায়িক নাম ও সংজ্ঞা নামের দাবীদার। আসলে উক্ত আইনে চাকমা মগ ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী কেবল নিজস্ব সাম্প্রদায়িক নামে চিহ্নিত। উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী সংজ্ঞায় ভিন্ন সংখ্যালঘু লোকদের আখ্যায়িত করা হয়েছে, যাদের কোন সাম্প্রদায়িক নাম পরিচয় উল্লেখিত নেই। যারা প্রকৃতই স্থানীয় বা আরাকানী বা লুসাইবাসী, অথবা পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যবাসী নামহীন সংখ্যালঘু, তারাই নিজ নিজ অঞ্চলের আদিবাসী পাহাড়ী উপজাতি রূপে চিহ্নিত হবে। মূল আইনে এই পার্থক্য পরিস্কাররূপে ব্যক্ত আছে। এই পার্থক্য দুর্বোধ্য নয়। বর্ণিত আইনের ইংলিশ ভাষ্যটি না বোঝার মত জটিল নয়। তজ্জন্য ইংলিশের ঘাগু পন্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। দুর্বোধ্যতার জটিলতায় সংজ্ঞা নামের ব্যবহার, ঘোর প্যাচ খেয়ে, অপাত্রে আরোপিত হয়েছে, তাও স্বীকার্য্য নয়। তবে ঘাপলা যে হচ্ছে, তা স্বীকার্য্য, আর এই ঘাপলা হলোঃ পরিষদ আইনে সংজ্ঞা নামের বাহিরে নিজ নিজ সম্প্রদায়িক নামে উল্লেখিত চাকমা, মগ, ত্রিপুরা ও অন্যান্য লোকেরা, উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ী বলে বিবেচিত হচ্ছে, এঁতে উপজাতি কোটায় মন্ত্রী পরিষদ জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের সংরক্ষিত মন্ত্রী পদ চেয়ারম্যান পদ ও সদস্য পদের জন্য, বর্ণিত তিন সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা যোগ্য বিবেচিত হচ্ছেন। উপরোক্ত ব্যাখ্যায় যদি সন্দেহ থাকে, তা হলে যে কোন সন্দেহবাদী সুধীজনেরই অবাধ অধিকার আছে, নিম্ন বর্ণিত মূল আইনটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যার যথার্থতা পরীক্ষায় মনোনিবেশ করা। আইনটি হলো ঃ রেগুলেশন ১/১৯০০ ভূক্ত পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন, ধারা ৫২। যথাঃ

(ক) নিম্ন বর্ণিত ব্যবস্থাদি ব্যতিরেকে কোন চাকমা, মগ, অথবা এমন পাহাড়ী উপজাতীয়

সদস্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম লুসাই পাহাড়, আরাকান পর্বতাঞ্চল, অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসি বলে গণ্য এমন লোক ব্যতীত অন্য কেউ, পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ অথবা বসবাস করতে পারবে না, যদি না তার অধিকারে জেলা প্রশাসকের বিশেষ ক্ষমতা বলে মঞ্জুরকৃত কোন অনুমতি পত্র থাকে।

বিদেশ গমানাগমন ও বসবাসই অভিবাসন রূপে গণ্য। আভ্যন্তরীন কোন স্থানান্তর ও আবাসনকে অভিবাসন বলে না। এ হিসাবে কোন স্বদেশবাসী এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভূক্ত নয়। এখানে চাকমা, মগ, লুসাই, ত্রিপুরাসহ বর্ণিত অঞ্চল ত্রয়ের পাহাড়ী উপজাতি ভূক্ত আদিবাসীদের, অবাধ প্রবেশ ও বসবাসের অধিকার মঞ্জুর করা হয়েছে, এবং এরা অবাধ অভিবাসীও বটে। এই ঘোষণা অনুযায়ী বর্ণিত লোকেরা অংশতঃ অস্থানীয় এবং তাদের অধিকাংশ নামহীন। তবে এমন কিছু পাহাড়ীউপজাতীয় আদিবাসী লোক আছেন যারা একাংশে স্থানীয় বাকীরা মিজোরাম, ত্রিপুরা ও আরাকানের বাসিন্দা। বহিরাঞ্চল বাসীরা স্থানীয় আদিবাসী নয়।

উপজাতীয় স্বতন্ত্র রাজনীতি ও কিছু বাঙ্গালীর লেজুড় বৃত্তি

আদিবাসী আর আদিবাসিন্দা সমার্থক শব্দ নয়। এ দুটি শব্দ সংজ্ঞা হিসাবেও পৃথক। এই শব্দ ও সংজ্ঞা দুটি নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। পার্বত্য বাঙ্গালীদের মাঝে ক্ষুদ্র একদল তাবেদার সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজাতীয় জন সংহতি সমিতি কয়েকজন স্বার্থান্বেষী বাঙ্গালীকে পটিয়ে গড়ে তুলেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী বাঙ্গালী কল্যাণ পরিষদ। এরা মৌখিক আদিবাসী বাঙ্গালী পরিচিত। এদের বক্তব্য পার্বত্য জনসংহতি সমিতির বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি। অভিযোগ উঠেছে এবং উপজাতি ঘেষা পত্র পত্রিকারও খবর হলো, তথাকথিত আদি বাঙ্গালীদের কতিপয় নেতা রাঙ্গামাটিতে সেনা সদস্যদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছেন। এবং পরে পুলিশ কর্তৃক বিভিন্ন অভিযোগে তাদের তিনব্যক্তি গ্রেফতার এবং বিচারের জন্য সপোর্দ হয়েছেন। ব্যাপারটি অপ্রীতিকর হলেও স্থানীয় বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজে তার কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। তবে মার চেয়ে মাসির দরদ বেশী। উপজাতীয় জন সংহতি সমিতি, তার দোসর ঐ বাঙ্গালীদের নিয়ে অত্যন্ত বেদনাকাতর ও সোচ্চার। স্থানীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এঁটাও তাদের একটি রাজনৈতিক ইস্যু। তারা নিজেদের প্রচার সহযোগীদের এ ঘটনার বিরূপ প্রচারণায় কাজে লাগিয়েছে। লক্ষ্যঃ সেনা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লোকজনকে ক্ষেপিয়ে দেয়া। বিষয়টি অতি ক্ষুদ্র এবং উপজাতীয় সংশ্রব বর্জিত হলেও, সন্তু বাবুদের লক্ষ্যঃ বাঙ্গালীদের মাঝেও সেনা বাহিনীকে বিতর্কিত করা এবং নিজেদের তাবেদার বাঙ্গালী গোষ্ঠীকে দলে ভারি করে, বাঙ্গালী ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানো। ব্যাপারটিতে উল্টো ফল ফলতে শুরু করেছে। আদি বাঙ্গালীদের রাঙ্গামাটি জেলা সংগঠন, তার সভাপতি কর্তৃক বিলুপ্ত ঘোষিত হয়েছে। আর বান্দরবন জেলা সংগঠন স্থানীয় সম অধিকার আন্দোলনের সাথে একিভূত হয়ে গেছে। খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠনটিও বিলুপ্ত ঘোষিত, বা সম অধিকার

সংগঠনের সাথে আত্মিকৃত হওয়ার পথে । আদি বাঙ্গালীদের ব্যাপারে জন সংহতি সমিতির অতি উৎসাহ আর সেনা বাহিনীকে কলুষিত করার অপচেষ্টাসহ বাঙ্গালীদের ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির উপজাতীয় এই কু-মতলব কথিত আদিবাসী বাঙ্গালীদের সচেতন হতে সাহায্য করেছে । এঁটা স্থানীয় বাঙ্গালীদের উপদলীয় কোন্দল এবং উপজাতীয় লেজুড়বৃত্তি পরিহারে সহায়ক হয়েছে ।

রাজনৈতিক ভাবে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় লোক আর বাঙ্গালীরা দুই পৃথক সমাজে বিভক্ত । এখানে বিপক্ষদের সাথে লেজুড়বৃত্তি অবশ্যই অনাকাঙ্খিত । পার্বত্য চুক্তি ও জেলা পরিষদ আইন, বাঙ্গালী ও উপজাতীয়দের মধ্যকার বিভেদ ও পার্থক্যকে প্রকট করে তুলেছে । বাঙ্গালী হলে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদের অযোগ্য । কর্ম সংস্থান, শিক্ষা বৃত্তি আর উচ্চ শিক্ষায়ও বাঙ্গালীরা অবহেলিত । বাঙ্গালীদের ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার জন্যই বন্দোবস্তি আর হস্তান্ত র কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে । এটিতো দুই দেশ আর দুই জাতিমূলক পদক্ষেপ । এই ভিন্নতা এক দেশ ও এক জাতি সত্তা গড়ে উঠার বিরোধী, যা দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান অনুমোদন করেনা ।

কোন্ স্বার্থে বাঙ্গালীরা উপজাতীয় লেজুড় বৃত্তিতে সংশ্লিষ্ট হবে? হ্যাঁ কিছু গম চাল ও নগদ অর্থ, গরীব বাঙ্গালীদের মাঝে ছিটিয়ে, তাদের লেজুড়বৃত্তিতে নিয়োজিত করা হচ্ছে, যে গম চাল ও অর্থ জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান আর উপজাতীয় মন্ত্রীদের হাতে সরকার থেকেই ত্রাণ উপকরণ রূপে প্রদত্ত হয় ।

আদি বাঙ্গালী আখ্যা, বাঙ্গালী ধরার একটি টোপ মাত্র । এই সংজ্ঞাটি, পার্বত্য চুক্তি বা জেলা পরিষদ আইনের কোথাও উল্লেখিত নেই । গরীব অশিক্ষিত কিছু বাঙ্গালীকে এই টোপ আর ত্রাণ সামগ্রীর বিনিময়ে সন্তু বাবুরা নিজেদের লেজুড় রুপে ব্যবহার করছেন এবং গোটা দেশবাসী বাঙ্গালীদের বুঝাচ্ছেন, তারা অসাম্প্রদায়িক, বাঙ্গালী স্বার্থ বিরোধী নন । তাদের সংগঠনের নামটি ও সার্বজনীন । পার্বত্য জন সংহতি সমিতি যেমন সাম্প্রদায়িক নাম ধারণ করেনা, তেমনি পার্বত্য অঞ্চলের আদি ও স্থায়ী বাঙ্গালীদেরও সে সমর্থক । সে কেবল লুটেরা সেটেলার বাঙ্গালীদের সম্মানজনক প্রত্যাবাসন কামনা করে । তারা নিজেদের স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাক । পার্বত্র অঞ্চল সেটেলার মুক্ত হোক । এই অঞ্চলের আদি স্থায়ী বাঙ্গালী আর উপজাতীয়রা ফিরে পাক তাদের স্ব স্ব ভূমি ও স্বাভাবিক অবস্থান ।

এই বিভ্রান্তিকর বক্তব্যে কিছু বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী নিতান্তই আহ্লাদিত । তারা বুঝতে অপারগ যে, সেটেলার বাঙ্গালীদের অবর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় এমন সংখ্যা প্রাধান্য সৃষ্টি হবে, যা হবে এতদাঞ্চলের উপজাতীয় স্বতন্ত্র দেশ গঠনের সহায়ক । পাক ভারত বাংলা উপমহাদেশের রাজনৈতিক জন্ম ইতিহাস হলোঃ ভারত ও পাকিস্তান হিন্দু ও মুসলিম প্রাধান্যের পরিণতি । বাংলাদেশ বাঙ্গালী প্রাধান্যের ফল । পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতীয় সংখ্যা প্রাধান্যের বলে স্বাধীন উপজাতীয় রাষ্ট্রের পরিবেশ লাভ করেছে, এঁটা বিচ্ছিন্নতার সূত্র । এই বিভক্তির পথ অনুসরণ বাংলাদেশের পক্ষে আত্মহত্যাকর । সুতরাং এই অঞ্চলে

বাঙ্গালী সেটেলম্যান্ট, বাংলাদেশের অস্তিত্বকে সুদৃঢ় করণেরই পদক্ষেপ। উপজাতীয়দের দয়ার উপর এদেশের অখন্ডতাকে ছেড়ে দেয়া যায় না। অখন্ডতা রক্ষার পক্ষে উপজাতীয়দের দৃঢ় অঙ্গিকার ও নেই। তাদের অতীত ইতিহাস হলো বিদ্রোহ আর অবাধ্যতার ইতিহাস। এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অবর্জনীয়।

১৭২৪ সালে উপজাতীয় সর্দার জালাল খাঁ, ১৭৭৪ সালে চাক্মা সর্দার শের দৌলত খাঁ বিদ্রোহী হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে চাকমা ও মগেরা বিদ্রোহ করেছে এবং এই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ পরবর্তী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে। এই বিদ্রোহ বিরোধী পদক্ষেপকে উপজাতীয় উৎপীড়ণ বলা সমীচীন নয়। প্রতিরক্ষা উৎপীড়নের সমার্থক ও নয়। উপজাতীয় বিদ্রোহী আর তাদের সমর্থকেরা নির্বিচারে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রপক্ষীয় শক্তিকে হেনস্তা ও দোষারোপ করে থাকেন, যা তাদের সদিচ্ছাকে উদ্ভাসিত করেনা। একদেশ ও এক জাতি গড়ার পদক্ষেপ, কোন মতেই শৈথিল্য ছাড় আর আপোষ রফার বিষয় নয়। উপজাতি লালন আর তাদের প্রতি নমনীয় হওয়ার অর্থ কোন মতেই তাদের প্রতি অবিচার আর দেশকে বিভক্ত করা নয়।

বাংলাদেশ বাঙ্গালীদের স্বদেশ। বাঙ্গালী লোক সমাজ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি, এদেশটিকে বাংলা নামে ভূষিত ও স্বাধীন করেছে। এর আদিবাসীন্দদের ৯৯% বাঙ্গালী। এ দেশে বাঙ্গালী আদিবাস প্রশ্নাতীত। বাঙ্গালীরা বাংলাদেশের আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা, এটা অবিসম্বাদিত বিষয়। বাঙ্গালী হওয়াটাই এ দেশের আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার সনদ। তবে যেহেতু দুনিয়ার তাবৎ বাঙ্গালীরা জন্মগত ভাবে বাংলাদেশ ভূখন্ডের বাসিন্দা নয়, এবং এখানকার জন্মগত ১% অধিবাসী অবাঙ্গালীও বটে, সেহেতু ভূখন্ডগত নাগরিকত্বের প্রশ্নে সন্দেহমুক্ত হতে, এদেশবাসী প্রত্যেকের কার্যতঃ বাংলাদেশী জাতি হওয়া জরুরী। তবে এঁটা আঞ্চলিক বিষয় নয়। রাষ্ট্রই এই সনদ দানের অধিকারী। নাগরিকত্ব দেশ ভিত্তিক বিষয়, অঞ্চল ভিত্তিক নয়। দেশের মুল নাগরিক বাঙ্গালীরা কেবল বিদেশী ও বিজাতীয় হওয়া ছাড়া, দেশের কোথাও অস্থানীয় অস্থায়ী অভিহিত হতে পারেনা। এক মাত্র পার্বত্য অবাঙ্গালী রাজনীতিকদের কিছু লোক এই বাঙ্গালী বিদ্বেষী প্রশ্ন নিয়ে সোচ্চার। এটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন নয়। স্থানীয় অস্থানীয় স্থায়ী অস্থায়ী এই প্রশ্নে প্রশ্রয় দিলে, গোটা দেশ ও জাতি খন্ড বিখন্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

কোথাও কোন অঞ্চল বাসীর একক আধিপত্য স্বীকৃত নেই। সর্বত্র মিশ্র জনগোষ্ঠী বসবাস করে, এঁটাই বাস্তবতা। উপজাতীয় দাবী অনুযায়ী বসবাস ও সুযোগ সুবিধার প্রশ্নে স্থানীয় অস্থানীয়, স্থায়ী অস্থায়ীর বিভাজন স্বীকৃত হলে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশী জাতিসত্তা হবে বিপন্ন। সবাই নিজ নিজ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। বাইরের কোথাও বসবাস চাকুরী ব্যবসা ইত্যাদি হবে বিতর্কিত। সেটাতো একদেশ ও এক জাতি ভিত্তিক কাম্য পরিবেশ হবেনা। আমি বাঙ্গালী। জন্মসূত্রে এ দেশের বাসিন্দা। আমার নাগরিক অধিকার এ দেশের কোথাও চ্যালেঞ্জ যোগ্য নয়। অস্থানীয় অস্থায়ী প্রশ্ন তুলে আমার বসবাস ব্যবসা, চাকুরী, প্রতিনিধিত্ব, পদ লাভ, ভূমি অধিকার ইত্যাদি বাধার সম্মুখীন হতে পারেনা। এদেশে

জন্মগ্রহণকারী অবাঙ্গালীরা ও অনুরুপ অধিকার লাভের অধিকারী। এঁটা প্রদত্ত সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। দেশের একদল লোক অর্থ, ভেতো মদ, আর নারী লুলোপতায় এই দেশ ও জাতিকে বিক্রি করে দিতেও পিছ পা নয়। উপজাতীয়দেরই স্থানীয় ও স্থায়ী নাগরিকত্বের সনদ থাকা জরুরী। তারা ত্রিপুরা, মিজোরাম ও আরাকানের পৈতৃক স্বদেশ ত্যাগী বহিরাগত নয়, এই সার্টিফিকেট ধারী হতে হবে। এই কয়েক বছর আগেও স্বদেশ ত্যাগী কিছু ত্রিপুরা ও পাংখু, সাজেক এলাকায় এসে অধিবাস গ্রহন করেছে। মাত্র বছর কয়েক হয়েছে, বান্দরবনের নাক্ষ্যংছড়িতে নতুন নামের একদল উপজাতীয় আরাকান ছেড়ে এসে বাড়ি ঘর পেতেছে। এইতো উপজাতীয়দের অব্যাহত অভিবাসনের চিত্র। এদের জায়গা করে দিতে, এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাঙ্গালী বিতাড়ন আবশ্যক, এটি অতি উৎসাহী অদ্ভুত দাবী।

চট্টগ্রাম একটি ঐতিহাসিক ভৌগোলিক অঞ্চল, যার অবিচ্ছেদ্য অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম। এই উভয় অঞ্চলের মূল আদি বাসিন্দা হলো চট্টগ্রামী জনগোষ্ঠী। কোন উপজাতীয় লোকই আজ পর্যন্ত দাবী করেনি যে, তারা ঐ চট্টগ্রামী মূলের লোক। তারা নামেই বিদেশী বিজাতি পরিচিত। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের লোক। মিজো, লুসাই, পাংখো, বনযোগীরা মিজোরামের আদি বাসিন্দা। মগ বা মারমা রাখাইন রিয়াং খিয়াং, চাক, ম্রু বা মুরুং ইত্যাদি জন গোষ্ঠী, আরাকান ও চীন পর্বতাঞ্চলের আদি অধিবাসী। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা তাদের নিজেদের কথা কাহিনীতেই বর্মী ও আরাকানী দাবীদার। এখানে তাদের ঐ বিখ্যাত গানটি স্মরণীয় যথাঃ

"আদি রাজা শের মস্ত খাঁ রোয়াং ছিল বাড়ি, তারপর শুকদেব রায় বান্ধে জমিদারী।"

তাদের আরাকানী হওয়ার আরো অকাট্য দলিল হলো, চাকমা রাজা শের জব্বার খানের সীল মোহর, যেটিতে তাদের আরাকান বাসের কথা বিবৃত হয়েছে। এই সীল মোহরটি প্রত্ন নিদর্শন রুপে রক্ষিত আছে।

আমরা বাংলাদেশী বাঙ্গালীরা উপজাতীয়দের প্রতি উদার। বিদেশী বিজাতীয় বংশোদ্ভুত হলেও তাদের বহিস্কার দাবী করিনা। চার চার বার বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও আমরা তাদের প্রতি নমনীয়। কৃতজ্ঞতারূপে এর প্রতিদান প্রদেয় হলেও তারা এর ভিন্নতাই করে। এই অবাধ্যতার কারণেই এদের ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে হবে। দেশে বিদ্রোহী অঞ্চল ও অবাধ্য জনগোষ্ঠী রাখা বিপজ্জনক। যেখানে উদারতা নিস্ফল, সেখানে সংস্কার ও সংশোধন নীতি আরোপ ছাড়া উপায় নেই। উচ্চ পদ ক্ষমতা অগ্রাধিকার প্রদানেও কাজ হয়নি। এবার সমীকরণ দরকার। এঁটা উৎপীড়ণ নয়, মগজ ধোলাই। এক সমতলে আনয়ন ছাড়া বাঙ্গালী পাহাড়ীর পক্ষে একজাতি হওয়া সম্ভব নয়।

সন্তু বাবুদের অনেক আপত্তি স্ববিরোধী

(তাং বৃহঃ ৩০ চৈত্র ১৪০৬ বাংলা ১৩ এপ্রিল ২০০০ খ্রীঃ/ দৈনিক গিরিদর্পন, রাঙ্গামাটি)

প্রায়ই সন্তু বাবুদের কিছু আপত্তির কথা শোনা যায় ও পত্র পত্রিকায় আসে। তবে তার অনেকটাই স্ববিরোধী ও অযৌক্তিক। স্থানীয় রাজনীতি চর্চায় তাদের যে প্রচুর ভুল ত্রুটি হচ্ছে এবং অনেক রাজনৈতিক ফাঁক ও ফাঁকি যে তাদের জড়িয়ে আছে, তা বিবেচনায় আনতে হবে। তৃতীয় আদিবাসী বর্ষ পালন অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় সন্তু বাবু অভিযোগ করেছেনঃ

ক) সরকার পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ী জনগণের সাথে প্রতারণা করেছেন। পার্বত্য চুক্তি আজ কাগুজে চুক্তিতে পরিণত।

খ) পাহাড়ীদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

গ) চুক্তি অনুযায়ী সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছেন না।

ঘ) ক্ষমতাসীন দল পাহাড়ীদের অধিকার পদদলিত করে তাদের বিলুপ্ত করার চেষ্টা করছে।

ঙ) পাহাড়ীদের উপর বিজাতীয় সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

চ) সেনা শাসনে জুম্ম জীবনও সংস্কৃতি বাধাগ্রস্ত।

এই অভিযোগগুলোর সাথে যুক্ত হবে ইতিপূর্বে উচ্চারিত অভিযোগ সমূহ যথাঃ আভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু পূনর্বাসনের নামে সরকার বাঙ্গালী পূনর্বাসনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন ইত্যাদি। সাদামাটা হিসাবে মনে হয় অভিযোগগুলোর একটিও মিথ্যা নয়। তবে সন্তু বাবুরাও যে ধোয়া তুলসি পাতা নন, সরকারের সাথে একই দোষের অংশীদার এবং আরেক নবতর বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রকারী, তা তাদের কার্যকলাপেই বোঝা যায়। ঐ লক্ষ্যেই তো তিনি হুমকি দিয়েছেনঃ

আমাদের ফেলে আসা কর্মসূচীকে কার্যকর করতে হয়তো বা নতুন করে ভাবতে হতে পারে।

ফেলে আসা কর্মসূচী মানে তো সশস্ত্র বিদ্রোহ, এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তবে হুবুর সন্তু বাবুরা, এতো ধৈর্য্যহারা হবেন না। শেষে আম যাবে, ছালাও যাবে।

কেবল সরকারকে দোষ দেন কেন, নিজেদের দোষ ও দেখেন ? প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা আর ফাঁকি দেয়া তো কূটনীতির চিরাচরিত ধর্ম। আপনারা পরাজিত হয়েছেন ও ফাঁকিতে পড়েছেন, এবং চুক্তিটিও কাগুজে এ কথাগুলো বলা আপনাদেরই পক্ষে অপমানজনক। তাতে আপনাদের রাজনৈতিক অদক্ষতা আর অদুরদর্শীতাই প্রমাণিত হয়।

আপনারা জেনে শুনেই একটি শূন্যকে নিয়ে চুক্তি করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বর্তমানে কোন প্রশাসনিক অঞ্চল নয়। এই শূন্যকে অবলম্বন করে, কোন বিভাগ বা জেলা গঠিত নেই। আপনাদের দাবী অনুযায়ী সরকার এই শূন্যকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু করে, উপজাতীয় অগ্রাধিকারমূলক চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন। তাতে সরকারের দোষ কোথায়? এটা আপনাদের নিজেদের সৃষ্ট ফাঁকি। এই ফাঁকির কারণে আঞ্চলিক পরিষদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আওয়ামী সরকার বা ভিন্ন দলীয় কোন সরকার এই ফাঁককে অবলম্বন করে পার্বত্য চুক্তি, তৎ ভিত্তিক আইন, আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য মন্ত্রনালয়কে হেস্তনেস্ত করে দিতে পারে। তজ্জন্য প্রয়োজনঃ কেবল উভয় পাক্ষিক বিরূপতা। সুতরাং সন্তু বাবুরা, ক্ষমতাসিনদের ক্ষেপাবেন না। শান্ত থাকুন ও ছবুর করুন। তাতে গাড়ি, বাড়ি, বেতন ভাতা পদ ও মর্যাদা রক্ষা পাবে। ক্ষমতা শূন্যতার প্রশ্নটি চাপা পড়ে থাকবে। সাথে সাথে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার ও থাকবে অক্ষুন্ন। পাহাড়ের নেংটি বাঙ্গালীরা নির্বিরোধ থাকতেই আগ্রহী। নেহাত বাধ্য না হলে তারা কোন ঝামেলায় যায় না। একটু দরদ দেখালেই সম্বর্ধনা পাবেন। বলবে ঃ "সন্তু লারমা জিন্দাবাদ"

দ্বিতীয় আপত্তিটি এক পাক্ষিক ও অবাস্তব। বাস্তবতা হলোঃ বাংলাদেশ একটি সাহায্য নির্ভর গরীব দেশ। তদুপরি এর হর্তাকর্তারা ব্যাপকভাবে দূর্নীতিগ্রস্ত। এখানে সৎ নেতৃত্ব আর আলাদীনের প্রদীপ নেই। সুতরাং ধুকে ধুকে আর ধীরে ধীরেই এদেশের ভাগ্যের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। আপনি হোন আর যে-ই হোন, দারিদ্র্য সবাইকে ঠেকিয়ে রাখবে। কেবল পার্বত্য অঞ্চল আর পাহাড়ী অবাঙ্গালীদের এক পাক্ষিক সমস্যা এটি নয়। গোটা জাতি আজ রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতায় আবদ্ধ। এ জাতির সর্বাধিক দুর্ভাগ্য হলোঃ প্রতিভাশালী নেতৃত্বের অভাব। এই শূন্যতাকে পুরণ করে আছেন দুই গৃহবধু, যাদের বুঝতে ও বুঝাতে উপদেষ্টা ও দোভাসী লাগে। এ দেশ উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানে পশ্চাদপদ। রাজনীতি নয়, টাকা, তোষামোদই এদেশে নীতি আদর্শের ভিত্তি। তার সাথে সোনায় সোহাগা হলো মাস্তানী আর কাড়াকাড়ি। আপনিও শক্তিমত্তার গুণে আঞ্চলিক নেতা। নীতি আদর্শের গুণে নয়। আপনি জনসমর্থন পুষ্ট জননেতার গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তিতে উর্ত্তীণ হয়ে আসুন। এটাই রাজনীতির চাহিদা। নতুবা আপনার এ কথা গুলো হবে নেহাত চমক লাগানো রাজনৈতিক বুলি।

তৃতীয় প্রশ্নটি সর্বাংশে সঠিক নয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যাবাসন ও অস্ত্র ত্যাগের জন্য সংশ্লিষ্টরা বিপুল অর্থকড়ি পেয়েছেন। আইন ও প্রণীত হয়েছে। তদনুযায়ী গঠিত হয়েছে আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, পার্বত্য মন্ত্রণালয়, ভূমি কমিশন, আভ্যন্তরিক উদ্বাস্তু পূর্ণবাসন সংস্থা টাস্কফোর্স ইত্যাদি। এসব কি কম সাফল্য?

চুক্তি অনুযায়ী আরো অনেক কিছু কার্যকর করা অবশ্যই বাকি আছে। কিন্তু ভাবতে হবে অনেক কিছুর বিপরীতে শক্তিশালী জাতীয় বিরোধিতাও আছে। নাক কান বন্ধ করে একরোখাভাবে রাতারাতি সব কিছু করা যায় না। তবু তার জন্য জেদ ধরা, বাড়াবাড়ির শামিল।

চতুর্থ অভিযোগটি সম্পূর্ণ ফাঁকা বুলি, বরং আওয়ামী সরকার জাতীয়ভাবে এ অভিযোগে অভিযুক্ত যে, তারা পাহাড়ীদের প্রতি নতজানু। শরনার্থী পত্যাবাসনের ছত্রছায়ায়, এতদাঞ্চলে অনেক অস্থানীয় পাহাড়ীর আগমন ঘটেছে। এবং আওয়ামী সরকার উপজাতীয়দের স্বার্থে পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাঙ্গালী হটানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই তো সন্তু বাবুরা দাবী করেনঃ সরকারের সাথে তাদের এ ব্যাপারে অলিখিত চুক্তি হয়েছে।

পঞ্চম অভিযোগটি ধোপে টিকেনা। খোদ সন্তু বাবু মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে আদিবাসি সম্মিলন উদ্বোধন করেছেন যা পাহাড়ী নয় হিন্দু সংস্কৃতি। এভাবে তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হচ্ছেন। যে জন্য অপর কাউকে দোষ দেয়া যায় না।

শেষ অভিযোগটি রাজনৈতিক চমক সৃষ্টির হাতিয়ার। সেনা বাহিনীর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেশ ভিত্তিক সার্বিক। এই পার্বত্য অঞ্চল বিদ্রোহ পর্যুদস্ত। এখানকার প্রতিরক্ষা ও আইন শৃংখলার ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল। আনসার ও পুলিশের দক্ষতা ও শক্তি এই বিদ্রোহ প্রবণ দুর্গম অঞ্চলে আইন শৃংখলা রক্ষার পক্ষে উপযোগী নয়। তদুপরি এতদাঞ্চলে নতুনভাবে দেশী বিদেশী জিম্মি করণ, বিদেশী বিদ্রোহীদের আনাগোনা ও উপদ্রব ক্রিয়াশীল। খোদ সন্তু বাবুর সমর্থক একদল সশস্ত্র কেডার ও তাদের বিপক্ষ আরেক দল স্বায়ত্তশাসন পন্থী সশস্ত্র বিদ্রোহী সর্বত্র সক্রিয় ও পরস্পরের প্রতি মারমুখী তৎপরতায় লিপ্ত, যাদের পরস্পরের সংঘাত সংঘর্ষে প্রায়ই হতাহতের ঘটনা ঘটছে। চাঁদাবাজি, রাহাজানি, ছিনতাই তো নিত্যদিনের ঘটনা। সেনাবাহিনীর অবর্তমানে এই ঘোলাটে অরাজক পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ নিতে পারে। তাতে খোদ সন্তু বাবুদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে। এই বিরূপ পরিস্থিতির আলোকে পার্বত্য অঞ্চলে সেনা উপস্থিতি মোটেও শিথিলযোগ্য নয়।

শুক্রবার ৮ বৈশাখ ১৪০৭ বাংলা ২১ এপ্রিল ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পন, রাঙ্গামাটি)

জনসংহতি সমিতি স্বীয় সংশোধিত দাবীনামা প্রথম দফাতেই স্বীকার করেছেঃ আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন। কারণ দাবীটি হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় আর বাংলাদেশ সাংবিধানিকভাবে এককেন্দ্রিক। এই সাংবিধানিক বৈপরিত্বকে জন সংহতি সমিতি জেনে শুনেই উপেক্ষা করে চুক্তি সম্পাদন করেছে।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ খোড়া হবে, এবং সদিচ্ছা ও সহানভূতি থাকা সত্ত্বেও সাংবিধানিক কারণে সরকারের হাত পা বাঁধা। ইউনেস্কো কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পার্বত্য চুক্তির জন্য শান্তি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্যারিসে সন্তু বাবুর উল্লসিত উপস্থিতি এ চুক্তির প্রতি তার চূড়ান্ত অনুমোদনই ব্যক্ত করে যা বিশ্ববাসীকে আশ্বস্থ করেছে। এখন তার ভিন্নতা করা হলে, তা বিশ্ববাসীর ঐ আস্থা বিনষ্ট করবে।

আওয়ামী সরকার সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ঝুঁকির ভিতর, ধীরগতিতে হলেও আঞ্চলিক ও উপজাতীয় ক্ষমতায়নে অগ্রসরমান ছিলো। বিএনপি দলীয়দের বিচারে এটি একটি ধোকা। এটা সংবিধান সম্মত নয় এবং কার্যতঃ কালোচুক্তি। তাই বিএনপি বা অন্যদের

কার্যকালে এটির হুবহু বহাল থাকা অনিশ্চিত।

সন্তু বাবুরা নতুন আরেক চুক্তির কথা ভাবছেন। কিন্তু সেটি কখন কার সাথে হবে? সে মিত্র শক্তিটা কে?

আবার লড়বেন ও ঘোলাটে পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন? তাই কি স্বীয় সশস্ত্র কেডারদের বিপক্ষীয়দের নির্মূলে লেলিয়ে দিয়েছেন? চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস শুরুর উদ্দেশ্য কি তা-ই? এ কাজে বাঁধাহীন হওয়ার লক্ষ্যেই কি সেনা প্রত্যাহারের দাবী? কিন্তু তা কি সম্ভব?

বিদ্রোহী শান্তি বাহিনী ডেকে এনেছে সেনাবাহিনী ও বাঙ্গালীদের। আবার বিদ্রোহ হলে, আরো কঠোর সেনা শাসন ও বিপুল বাঙ্গালীর উপস্থিতি হবে অনিবার্য। কারণ সকল যুক্তির বাড়া যুক্তি দেশের অখন্ডতা। বার বার ঘুঘুকে ধান খেতে দেয়া যাবে না।

পার্বত্য বিদ্রোহীদের দমনে মাত্র এক মাসের কঠোর ও দ্রুত সেনা অভিযানই যথেষ্ট। দীর্ঘস্থায়ী সেনা উপস্থিতি বা শাসনের প্রয়োজন নেই। উপজাতিদের দূর্বল ও সংখ্যালঘু করণের বাকি কাজটি সাধারণ বাঙ্গালীদের দ্বারাই সম্পাদন সম্ভব। মিত্র আওয়ামী লীগকে শত্রু বানিয়ে ছাড়লে, তারাই এতদাঞ্চলকে বাঙ্গালী উপনিবেশ করে ছাড়বে। আওয়ামী লীগের আগামী নির্বাচন জিততে এরূপ একটি দেশ জয়ী জনপ্রিয় ইস্যু ও ইমেজের প্রয়োজন।

জনসংহতি সমিতির সংশোধিত দাবীনামার ব্যাখ্যাতেই বলা হয়েছেঃ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের এখতিয়ারধীন এলাকা মাত্র ৪৪৬ বর্গমাইল, যা এই লেখকের হিসাবে ৪৪০ বা ৩৪০ বর্গমাইল মাত্র। অবশিষ্ট ৪৬৪৬ বা ৪৬৫২ অথবা ৪৭৫২ বর্গমাইল হলো সরকার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল। সুতরাং দাবী নং ২/৫ক ও ২-৫-খ অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের এখতিয়ারধীন অঞ্চল ৫০৯৩ বর্গমাইল ব্যাপ্ত গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়। শান্তি চুক্তি, ৪৪৬ আ ৪৪০ অথবা ৩৪০ বর্গমাইলের উপর সীলমোহর এঁটে দিয়েছে। এখন উপজাতীয় অধ্যূষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম মানে তিন জেলা পরিষদও আঞ্চলিক পরিষদের এখতিয়ারধীন বর্ণিত ক্ষুদ্র অঞ্চল। সরকার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল এর অন্তর্ভূক্ত নয়। এটি পার্বত্য চুক্তির আরেক গূঢ় রহস্য। দ্রষ্টব্যঃ চুক্তিদফা খ-২৬ ও জেলা পরিষদ আইন ৬৪

চুক্তি হয়েছে চীফ হুইফ ও জ্যোতিরিন্দ্রী রোধিপ্রিয় লারমার মধ্যে, যাদের কেউ সরকারের পক্ষ্যে বা জনগণের পক্ষে কোন নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী নন। আওয়ামী লীগ ও তার প্রধান হাসেনার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় আপাততঃ এর বাধ্যবাধকতা মেনে মেপে চলা হলেও, এই মেনে চলা কায়েমী ও সরকারী সিদ্ধান্তজাত নয়। এই সরকার বা ভবিষ্যতের ভিন্ন সরকার এই বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করতে পারবে। এটি হলো চুক্তির প্রধান দুর্বলতা।

চুক্তিতে পার্বত্য অবাঙ্গালীদের উপজাতি আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটা উভয় পাক্ষিক সিদ্ধান্ত। এখন এর ব্যতিক্রম করে খোদ সন্তু বাবুরাই নিজেদের কখনো আদিবাসী ও কখনো পাহাড়ী আখ্যায়িত করছেন, যে নামে আইনে অগ্রাধিকার লিপিবদ্ধ নেই। তা হলে কি তারা উপজাতি পরিচয়টি প্রত্যাখান করছেন? এক সাথে তিন সংজ্ঞায় পরিচিত হওয়া তো চুক্তিতে অনুমোদিত নয়। এমনিতেও তিন সংজ্ঞায় পরিচিত হওয়া বিভ্রান্তিকর। উদ্দেশ্য

কি গাছেরটাও পাড়া, তলারটাও কুড়ানো? এতো হলো সুবিধাবাদী নীতি।

প্রতিবেশী বৃহৎ সম্প্রদায় কর্তৃক বাঙ্গালীদের ধর্ম সংস্কৃতি নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা কি সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক, না শান্তির সহায়ক? সন্তু বাবু নিজে কি নাস্তিক না বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল ? মহামতি গৌতম বুদ্ধের অমর শিক্ষা কি তার স্মরণে আছে? যথাঃ সব্বে সত্তা সুখীতা ভবেত্তু। অর্থাৎ জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

কমিউনিজমের ভাবাদর্শ হলোঃ "ধর্ম আফিম তুল্য।" কিন্তু সে ভাবাদর্শ আজকাল পরিত্যক্ত ও সেকেলে। সন্তু বাবু কি সে পশ্চাদপদতার অনুসারী ধর্মত্যাগী? তাকে যে মাঝে মধ্যে বৌদ্ধ গুরু বনভান্তের আর্শীর্বাদ প্রার্থী হতেও দেখা যায়। এসব কি ভন্ডামী? যে নিজের ধর্মকে মানেন না, পর ধর্মকেও ঘৃণা করেন, তিনি তো ধর্মদ্রোহী। সন্তু বাবু ভন্ডামী কেন, সগর্বে বলুন আপনি নাস্তিক। এতদাঞ্চলের বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সবাই জানুকঃ আপনি একজন বৌদ্ধ যাজক সন্তান হলেও, এখন ধর্মদ্রোহী বা নাস্তিক। বৌদ্ধ মতবাদ নয়, নাস্তিক্যবাদই আপনার ধর্ম। ধর্মের বিরুদ্ধে আপনার বিষোদগার তখন যক্তিসঙ্গত হবে। খবরদারঃ বিবাহ আর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে কোন পুরোহিতকে ডাকবেন না। উইল করে যাবেন মৃত্যুর পর আপনাকে যেন সমাহিত বা পোড়ানো না হয়। কারণ এগুলো তথাকথিত ধর্মীয় উপাচার ও সংস্কৃতি। পার্বত্য বাঙ্গালী সমাজকে দ্বিখন্ডিত করতে আপনি পুরানবস্তিবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি দরদ দেখাচ্ছেন এবং আদিবাসী বাঙ্গালী নামে তল্পীবাহক সংগঠন গড়তে মদদ দিচ্ছেন। এর ফলে আপনাদের প্রতি বাঙ্গালী অবিশ্বাস ও সন্দেহ বাড়ছে। এই তল্পীবাহকদের সংখ্যা মোট পার্বত্য বাঙ্গালীর ৫% হবে কি না সন্দেহ। অতীতে এরা শান্তিবাহিনীর হাতে কম জবাই হয়নি। এদের ভবিষ্যৎ এখন ঘরে বাইরে সর্বত্র সন্দেহজনক। তারা না ঘরকা, না ঘাটকা। মনে হয়ঃ আবার অশান্তির খেলা জমছে, এসবই তার আলামত।

(তাং - সোমবার ১১ বৈশাখ ১৪০৭ বাংলা ২৪ এপ্রিল ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পন, রাঙ্গামাটি)

ইতোমধ্যে সন্তু বাবু কর্তৃক অনধিকার চর্চার এক উল্লেখযোগ্য কান্ড ঘটে গেছে। ইউ এন ডি পি বা ইউনাটেড নেশন্স ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রাম এর সাথে তিনি পার্বত্য অঞ্চলে প্রয়োজনীয় কাজ করার অনুমোদনমূলক একটি চুক্তি সই করেছেন। যে অধিকার একমাত্র সরকারের প্রাপ্য। কাজটি আপত্তিকর ও বিদ্রোহাত্মক জানা সত্ত্বেও এ নিয়ে সরকার চুপ। একমাত্র স্থানীয় এমপি বাবু দীপংকর তালুকদার (সাবেক) এ কাজটির সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছেন, এবং পত্র পত্রিকায় ও তা মুদ্রিত হয়েছে।

সন্তু বাবুরা, সরকার, আওয়ামী লীগ, ও বাঙ্গালীদের চৌদ্দ পুরুষ প্রায়ই উদ্ধার করেন। এ ব্যাপারে আওয়ামী সরকারের চুপ থাকা, ধৈর্য ধারণ বলে জ্ঞান করা যায়। কিন্তু জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউএনডিপির সাথে চুক্তি সম্পাদনকে মোটেও অবহেলাযোগ্য জ্ঞান করা যায় না। সরকার কি এই বাড়াবাড়িকে অঙ্কুরেই দমাবেন? চুক্তির কোথাও তো

এরূপ অনধিকার চর্চার কথা লিপিবদ্ধ নেই। চুক্তির প্রতিটি দাড়ি কমা পর্যন্ত সন্তু বাবুদের মুখস্থ। এ ব্যাপারে ভূল হওয়ার অবকাশ নেই। এখন পর্যন্ত তারা ভুল স্বীকারও করেন নি। এটা তাদের ইচ্ছাকৃত টেষ্ট কেইস। সরকারের পক্ষ থেকে শক্তিশালী প্রতিবাদ ও রিরোধীতা না আসলে, অনুরূপ ঘটনা আরো ঘটবে, এবং আন্তর্জাতিকভাবে তৎপ্রতি উৎসাহ বাড়বে। দেখি আর কি হয়, এই অপেক্ষা তো মারাত্মক হতে পারে। অনুরূপ ঘটনাবলী উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের পক্ষে হবে উজ্জীবক। এমনিতে আঞ্চলিকভাবে উপজাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা, প্রশাসনিক অংশীদারিত্ব, স্বতন্ত্র স্থানীয় আইনের প্রাধান্য, অঞ্চলটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে রেখেছে। তদুপরি চুক্তিতে উপজাতীয় অঞ্চল হওয়ার স্বীকৃতি এবং আঞ্চলিক বামে পরিষদীয় ক্ষমতাদান ইত্যাদি স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে নিঃসন্দেহে অগ্রগতি। এবার আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বেপরোয়া চুক্তি সম্পাদন, চুড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যকে আরো নিকটবর্তী করারই পদক্ষেপ। এটা সরকারের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ এবং টেষ্ট কেইসই বটে।

আমরা কি করে আশ্বস্ত হবো যে, প্রয়োজনীয় একশনের যুক্তিসঙ্গত ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যই সরকার জনসংহতি ও তার নেতৃবৃন্দকে বাড়তে দিচ্ছেন। কিন্তু ততদিনে যে তাদের বাড় বিস্তার সীমা ছাড়িয়ে যাবে। উপড়াতে গেলে ডাল পালাই ভাংবে, জড় শিকড় থাকবে গভীরে প্রথিত। একশনের জন্য এই চুক্তি ইস্যুটি একটি বড় যুতসই বিষয়। এবার না দমালে, স্বাধীনতার যাত্রা হবে নির্বিঘ্ন।

আগে উপজাতিদের পক্ষে চুক্তির রাজনৈতিক সাফল্য ও সুফলের প্রধান দিকগুলো বর্ণিত হয়েছে। তৎসঙ্গে আনুসঙ্গিক সুফল ও অর্থনৈতিক সাফল্যের বিরাট তালিকাটিও বিবেচ্য। যথাঃ (ক) আত্মসমর্পিত প্রত্যেক শান্তিবাহিনী সদস্যকে অনুদান প্রদান নগদ টাকা ৫০,০০০/- খ) সাত শতাধিক শান্তিবাহিনী সদস্যকে পুলিশে চাকুরী দান। গ) ফৌজদারী মামলা ও হুলিয়া প্রত্যাহার ঘ) আটক ও দন্ড প্রাপ্তদের জেল থেকে মুক্তি। ঙ) ঋণ খেলাপীদের ঋণমুক্তি চ) চাকুরী ও পেনশন পুনরবহাল। ছ) চাকুরীর বয়সসীমা ৪০ এ শিথিল। জ) শরণার্থী প্রত্যাবাসনে ২০ দফা পেকেজ সুবিধা দান। যথাঃ

১. জীবন সম্পদও নিরাপত্তার রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি।

২. গৃহ নির্মাণ ও কৃষি অনুদান, পরিবার প্রতি টাঃ ১৫০০০/-

৩. ১০০ পরিবারের প্রতিটির জন্য নিহত প্রতি শেষ কৃত্যানুষ্ঠান বাবদ অনুদান টাঃ ১০,০০০/- ।

৪. এক বছর পর্যন্ত প্রতি শরণার্থী প্রাপ্ত বয়স্ককে মাসিক ৫ কেজি ও অপ্রাপ্ত বয়স্ককে ২.৫ কেজি হারে চাল ও পরিবার প্রতি ৪ কেজি ডাল, ২ কেজি সয়াবিন তেল ও ২ কেজি লবণ প্রদান।

৫. গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতি পরিবারকে ২ বান্ডিল ঢেউ টিন পান।

৬. চাষযোগ্য জমির মালিক প্রত্যেক পরিবারকে একজোড়া হালের গরু ক্রয়ের টাকাঃ

১০,০০০/-

৭. ভূমিহীন পরিবারকে বিবিধ ক্রয় বাবদ টা ৩,০০০/-

৮. ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ ।

৯. অনুরূপ অন্যান্য ব্যাংক ঋণ মওকুফ ।

১০. পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণ মওকুফ ।

১১. সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা এবং মামলা ও গ্রেফতারী আদেশ প্রত্যাহার ।

১২. জমি বাড়ি বাগান প্রত্যার্পন, ধর্মীয় স্থান পূণরবহাল, এবং বিশেষ ভাবে ৭০টি মন্দির সংস্কার ও পুননির্মাণের জন্য মন্দির প্রতি অনুদান টাঃ ১০,০০০/-

১৩. শরণার্থী চাকুরীজীবিদের চাকুরী ও পেনশন পূনর্বহাল ।

১৪. ছাত্র ছাত্রীদের এসএস সি-ও এইচ এস সি পরীক্ষা দান অনুমোদন ও স্কুল কলেজে ভর্তির সুযোগ দান ।

১৫. গৃহ নির্মাণে কাঠের পারমিটের পরিবর্তে অনুদান টাঃ ৩,০০০/-

১৬. উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার পরিষদ সমূহে বেকার উপজাতীয় শরণার্থীদের অগ্রাধিকার মূলক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ প্রদান ।

১৭. চাকুরীর বয়স সীমা উত্তীর্ণ শরণার্থী প্রার্থীদের বিশেষ বিবেচনায় নিয়োগ প্রদান ।

১৮. অন্তর্ঘাতমূলক ফৌজদারী অভিযোগে সাজা প্রাপ্তদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান ।

১৯. পর্যায়ক্রমে বেসামরিক এলাকা থেকে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার ।

২০. প্রত্যাগত হেডম্যানদের নিজ নিজ মৌজায় পূনর্বহাল ।

বিদ্রোহ ত্যাগের বিনিময়ে এত বিরাট সুযোগ সুবিধা মানে তো সরকারেরই আত্মসমর্পণ । এতো উদারতা কি সন্তু বাবুদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছে? সরকারের পক্ষে অধিক উদারতার আর কি আছে?

অধিকারের খতিয়ান

মানুষের সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তির মাপকাঠি হলো তার দ্বারা উপভোগ্য মৌলিক অধিকার মানবাধিকার ও মৌলিক চাহিদার বিষয়াদি। বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত পুরিপুর্ণ একটি অধ্যায়ই আছে। জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক মানবাধিকার নামীয় তিরিশটি ধারার একটি নীতি ও আদর্শ সুনির্দিষ্ট আছে। মানবিক মৌলিক চাহিদা বলে ও একটি আন্ত র্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালনীয় বলে স্বীকৃত। তবু দেশে দেশে এগুলো লঙ্ঘিত হয়, এবংতার প্রতিবাদ ও হয়ে থাকে। এই আইন ও নীতি আদর্শ লঙ্ঘিত হওয়া খুবই দুঃখজনক। আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকার এই অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। এদেশের আমলা মহলের প্রতিও অনুরুপ দোষারোপ করা যায়। গোটা দেশের দরিদ্র জন সাধারণ, বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, আর বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীদের দুঃখ দুর্দশা আর তাদের প্রতি আচরিত অন্যায় অবিচারের মাত্রা সীমাহীন। এমনটি অনন্ত কাল চলতে পারে না। এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। একাজে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে বুদ্ধিজীবি ও সিভিল সমাজকে। তাদের কেউ কেউ অবশ্য বিচ্ছিন্ন ভাবে এ কাজে সোচ্চার আছেন। তবে তাতে অভিযুক্ত রাষ্ট্র সরকার ও আমলা মহলের টনক নড়ছেনা। অতএব দরকার সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলনের।

মানুষের মৌলিক চাহিদা হলো, খাদ্য, বস্ত্র,বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। তার সাথে যুক্ত কর্মসংস্থান ও ভূমি সংস্থান। এ দেশের অর্ধেকের বেশী মানুষ ভূমিহীন ও কর্মহীন। সুতরাং অভাব অসুবিধা তাদের নিত্যসঙ্গী। এই অসঙ্গতিপুর্ণ জীবনে তাই স্বাভাবিক ভাবে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানক, শিক্ষা ও চিকিৎসার চাহিদা পুরণ হচ্ছে না। এই অভাব সর্বাধিক প্রকট পার্বত্য চট্টগ্রামে। রাষ্ট্রীয় সঙ্গতি অপর্যাপ্ত হলেও, অর্থ সম্পদ অনুদান ও বিনিয়োগ সর্বোত্তম পন্থায় কাজে লাগান হচ্ছে না। এর অধিকাংশ ব্যয়িত হচ্ছে দুর্নীতি, আত্নসাত উপজাতীয় নেতৃ পোষণ ও তোষণে। বঞ্চিত উপজাতীয় জন সাধারণ অবোধগম্য ভাবে এ ব্যাপারে নীরব। তাতে অনুমান করা যায়, তাদের মাঝে বঞ্চনা সহনীয় পর্যায়ে আছে। নেতৃবৃন্দের পদ ও পারিতোষিকে তারা খুশি। এযেন ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার মত, না খেয়ে নাচার পরিতোষ।

উপজাতীয়দের বড় সন্তোষের ব্যাপার হলঃ পার্বত্য চুক্তি আর পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন অনুযায়ী একমাত্র উপজাতীয় পক্ষই পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হবেন। আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদ, পার্বত্য শরণার্থী বিষয়ক পুনর্বাসন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান একমাত্র উপজাতীয় ব্যক্তি হবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদটি ও তাদের অগ্রাধিকারভূক্ত। প্রথাগত ভাবে তিন সার্কেল প্রধান তো বটেই, তিনশত তেহাত্তরজন মৌজা প্রধান ও শতাধিক বাজার চৌধুরীদের প্রায় সবাই উপজাতীয়। আইন করা হয়েছেঃ পরিষদ সমুহের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য হবেন উপজাতীয়। সার্কেল চীফদের

সামস্ত ক্ষমতা এতো বাড়ান হয়েছে যে, স্থানীয় স্থায়ী নাগরিকত্ব আর সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের সার্টিফিকেট দানের উপর তাদেরই একচ্ছত্র অধিকার স্বীকৃত। তাছাড়া চাকুরী প্রার্থী ও নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া যাবেনা। চাকুরী ও শিক্ষাবৃত্তিতে ও উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার। তদুপরি যোগ্যতার মাপকাঠিতে ও তাদের জন্য রেয়াত প্রাপ্য। এসব ক্ষেত্রে হতভাগ্য পার্বত্য বাঙ্গালীরা সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত। বাঙ্গালীদের এই বঞ্চনা, সাধারণ উপজাতীয়দের সন্তোষের কারণ। এই কৃত্রিম সন্তোষ তাদের ভাগ্যোন্নয়নের পথে বাধা, এটা তাদের বোধগম্য নয়।

স্থানীয় আইনের কোথাও বাঙ্গালীরা স্বনামে বর্নীত নয়। তারা অউপজাতি আখ্যায়িত। তবে উপজাতীয়দের বিপরীত সম্প্রদায়, রূপে বাঙ্গালী ছাড়া আরো অনেকে আছে, যেমন- নেপালী, ভুটানী, গারো, আসামী, মনিপুরী, মুরং ইত্যাদি। বাঙ্গালীদের সহ এরা একত্রে সংখ্যাগুরু। এই মানব খিচুড়ীর ভিতর বাঙ্গালীদের তলিয়ে দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র ভাবে বাঙ্গালীদের কোন অধিকার ও স্বীকৃতি নেই। এমন বিস্ময়কর বঞ্চনা ও অবিচার বাঙ্গালীদের পক্ষে সহনীয় নয়। এঁটা বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক আইন অনুচ্ছেদ নং ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৬ ও ৪২ এর পরিপন্থী। অনুচ্ছেদ নং-৭ (২)-এ অনুরূপ আইন প্রনয়ণ থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই সাংবিধানিক নির্দেশ পালিত হয়নি এবং হচ্ছে না।

পার্বত্য বাঙ্গালীদের প্রায় আটাশ হাজার পরিবার গুচ্ছ গ্রামে আবদ্ধ, জায়গা জমি থেকে বঞ্চিত, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থান হারা, এঁটা তাদের প্রতি বিরাট এক অবিচার।

অনুচ্ছেদ নং ১৯-এ সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। অথচ সুযোগ দান তো দুরের কথা, তারা কোথাও স্বনামে উল্লেখিত পর্যন্ত হয়না। মানবাধিকার অধিকাংশ স্থানীয় বাঙ্গালীদের বেলায় অবহেলিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তারা অন্যতম মানবগোষ্ঠী বলে ও স্বীকৃত নয়। স্থানীয় মানবগোষ্ঠীর স্বীকৃতি ছাড়া তারা তো দেনা পাওনার তালিকাভূক্তই হচ্ছে না। নিজেদের রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃক তাদের প্রতি বঞ্চনা অবহেলা, অন্যায় ও অবিচার অনুষ্ঠিত হওয়ারই প্রতিফল হলোঃ তাদের প্রতি উপজাতীয়দের মারমুখী হওয়া, ও আমলাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য পুর্ন আচরণ।

উদাহরণ রূপে এখানে সাংবিধানিক আইন ও মানবাধিকারের কিছু ধারা সন্নিবেশিত হলো, যা পার্বত্য বাঙ্গালীদের স্বার্থকে সমর্থন করে, যথা ঃ

(১) **বাংলাদেশ সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৭ (১)** ঃ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) **অনুচ্ছেদ নং-৭ (২)** ঃ জনগণের অভিপ্রায়ের চরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপুর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।

(৩) **অনুচ্ছেদ নং ১৯** (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(৪) **অনুচ্ছেদ নং ২৬** (১) ঃ রাষ্ট্র এই যাহার মৌলিক অধিকার বিধানবলীর সহিত অসমঞ্জস কোন আইন বাস্তবায়ন করিবেন না, অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।

(৫) **অনুচ্ছেদ নং ২৭** ঃ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

(৬) **অনুচ্ছেদ নং ২৮** (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(৭) **অনুচ্ছেদ নং ২৯** (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(৮) **অনুচ্ছেদ নং ৩৬** ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা এবং যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

(৯) **অনুচ্ছেদ নং ৪২** ঃ প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও বিলি বন্টন ব্যবস্থার অবাধ অধিকার থাকিবে।

সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার ঃ

ধারা-১। বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সম-মর্যাদা ও অধিকারাদি নিয়ে সকল মানুষই জন্মগ্রহণ করে। বুদ্ধি ও বিবেক তাদের অর্পণ করা হয়েছে এবং ভ্রাতৃত্বসূলভ মনোভাব নিয়ে তাদের একে অন্যের প্রতি আচরণ করা উচিত।

ধারা- ২ ।যে কোন প্রকার পার্থক্য যথাঃ জাতি, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকই ঘোষণাপত্রের উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধিকারে স্বত্ববান। অধিকন্তু কোন ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী, তা স্বাধীন, অছিভূক্ত এলাকা, অস্বায়ত্তশাসিত অথবা অন্য যে কোন প্রকার সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, তার রাজনৈতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা চলবে না।

ধারা-৩। প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

ধারা ৫। কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তি ভোগে বাধ্য করা যাবেনা।

ধারা ৬। আইনের সমক্ষে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতিলাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা-৭। (ক) আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণাপত্র লঙ্ঘনকারী কোনরূপ বৈষম্য বা এই ধরণের বৈষম্যের কোন উস্কাণীর বিরুদ্ধে সমভাবে সুরক্ষিত হওয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। খ) প্রত্যেকেরই নিজ দেশসহ যে কোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

ধারা- ১৩। ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। খ) কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল খুশিমত বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা- ২১। ক) প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারের অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। খ) প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারি চাকুরীতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে। গ) জনগণের ইচ্ছাই সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি হবে, এই ইচ্ছা সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নৈমিত্তিকভাবে এবং প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে, গোপন ব্যালট অথবা অনুরূপ অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা ২৩। ক) প্রত্যেকেরই কাজ করার, অবাধে চাকুরী নির্বাচনের, কাজের জন্য নায্য ও অনুকুল অবস্থা লাভের এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে। খ) প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে। গ) প্রত্যেক কর্মীও তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম এমন ন্যায্য ও অনুকুল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাদি লাভের অধিকার রয়েছে। ঘ) প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

পার্বত্য চুক্তি আর পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে খোলাখুলি ভাবে উপরোক্ত সাংবিধানিক আইন, মৌলিক চাহিদা ও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। যথা ঃ

ক) পার্বত্য চুক্তি দফা নং ক/১ ঃ

"উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট সংরক্ষন এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।"

এই বর্ণনাসহ চুক্তি পত্রের সর্বত্র এবং সংশ্লিষ্ট আইনগুলোতে ও বাঙ্গালীদের কোন উল্লেখ ও স্বীকৃতি নেই। অথচ বাস্তবে অউপজাতি আখ্যায়িত বাঙ্গালীরা স্থানীয় জনসংখ্যার বৃহদাংশ রূপে আদম শুমারীতে স্বীকৃত।

খ) পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং--২/কক। ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন নং ২(ক) ঃ

সংজ্ঞা ঃ "অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে, বা যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় বসবাস করেন।"

এই আইনে বাঙ্গালীসহ অন্যান্যদের বলা হয়েছে অউপজাতি। স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গালীরা স্থানীয় অধিবাসী বলে স্বীকৃত নয়। অউপজাতিয়রা কোন্ কোন্ সম্প্রদায় ও মানব গোষ্ঠীর সমষ্টি তা এখানে উহ্য। তাদের স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ার শর্ত হলো বৈধ জায়গা জমির মালিকানা অথবা সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় বসবাস। তাদের বিপরীতে উপজাতীয়দের একটি তালিকা প্রদত্ত হয়েছে এবং তাদের বেলায় বৈধ জায়গা জমির মালিকানা ও সুনির্দিষ্ট বসবাসের ঠিকানা থাকার শর্ত আরোপিত নেই, যা প্রকাশ্য বৈষম্যে নজির।

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং ২ (খ) ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন নং- ২/(গ)ঃ

"উপজাতীয় অর্থ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলায় স্থায়ী বসবাসরত চাকমা, মারমা, তনচৈংগ্যা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখু, খেয়াং, ম্রো (মুরং), বোম, খুমি, উসাই ও চাক, উপজাতীয় সদস্য।

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং-৪/(৬), ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন নং ২/(খ) ঃ

"কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা, এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রাদায়ের সদস্য তাতে সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত পৌর সভার চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সার্কেল চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীপের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।"

এর বিপরীতে উপজাতীয়দের জন্য প্রনীত আইন হলোঃ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং-৪/৫ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন নং ৫/৯ ঃ "কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন উপজাতির সদস্য তাহা সার্কেল চীফ স্থির করিবেন, এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফেকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি উপজাতীয় হিসাবে চেয়ারম্যান বা কোন উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেননা।" এখানে সার্টিফিকেট লাভ উপজাতীয়দের চেয়ে অউপজাতীয়দের পক্ষে অনেক দীর্ঘ ও কঠিন প্রক্রিয়া সাপেক্ষ।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপন যোগ্য যে, সার্কেল চীফেরা সরকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব আসীন কিনা। তারা কার্যত: সামন্ত প্রধান মাত্র। তারা কি স্বাধীন নাগরিকদের পরিচয় দানের সনদ পত্র মঞ্জুরের বৈধ কর্তৃপক্ষ? তারা উপজাতীয়দের দলীয় প্রধান হলেও বাঙ্গালীরা তাদের অধীন প্রজা নন।

(গ) প্রতিনিধত্ব মূলক পদ লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্য যথা ঃ গ) পার্বত্য চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীপদ উপজাতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট যথাঃ চুক্তি খন্ড (ঘ) ১৯।

উদ্বাস্তু পুর্নবাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান পদ উপজাতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট, যথাঃ চুক্তি খন্ড (ঘ)।

চেয়ারম্যান উপজাতীয়গণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন যথা আঞ্চলিক পরিষদ

আইন নং ৫(২) ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং-৪।

জেঃ পঃ আঃ ধারা ৪ (১) (খ) উপজাতীয় সদস্য নির্যাতিত হবেন

(খ) দশ জন অউপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হবেন

(গ) তিন জন মহিলা সদস্য যাহাদের দুইজন উপজাতীয় এবং একজন অউপজাতীয় মহিলা নির্বাচিত হইবেন।

আঃ পঃ আইন ধারা ৫ (১) (খ) ঃ বারজন উপজাতীয় সদস্য

(গ) ছয়জন অউপজাতীয় সদস্য

(ঘ) তিনজন উপজাতীয় একজন অউপজাতীয় মহিলা সদস্য মনোনীত হইবেন।

(গ) কর্মসংস্থান ও ভূমি সংস্থানের ক্ষেত্রে বৈষম্য ঃ

পাঃ জেঃ পরিষদ আইন নং ৩১ ও আঃ পঃ আইন নং ২৮ ঃ

সরকারের উপ-সচিব /যুগ্ম সচিব তুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ/ আঞ্চলিক পরিষদের মুখ্য সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয় কর্মকর্তাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

জেঃপঃ আঃ ধারা নং ৩২ (২) ও আঃ পঃ আইন নং ২৯ ঃ

পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় থাকিবে।

জেঃ পাঃ অঃ ধারা নং ৬২ (আ) জেলা পুলিশ। উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার থাকিবে। জেলাঃ পঃ আইনঃ ৬৪/ যে কোন জায়গা জমি পরিষদের পুর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয় বিক্রয় বা অন্যবিধ ভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না। জেঃ পঃ আইন ২৪ আঃ পঃ আইন ২৬/ (১ ও ২) অনুযায়ী নির্বাহী ক্ষমতাধর উপজাতীয় চেয়ারম্যানদের হাতে বাঙ্গালীদের ভূমি লাভ ও হস্তান্তর আটক হয়ে আছে।

(ঘ) সরকার নিজ নির্বাহী আদেশের দ্বারা, উপজাতীয়দের জন্য উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫% আসন কোটার প্রবর্তন এবং তাদের জন্য প্রচুর শিক্ষা বৃত্তি আর ফ্রি হোষ্টেলের ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। এর ফলে প্রতি বছর হাজারের কাছাকাছি উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রী বিনা প্রতিযোগীতা ও রেয়াতী যোগ্যতায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে পেশা জগতে প্রবেশ করছে। তাদের র্কমসংস্থানেও সরকার অত্যন্ত উদার। বিপরীতে গরীব বাঙ্গালী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য কোন সিট কোটা নেই, কদাচিৎ তারা প্রতিভার বলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পায়। তাদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি ও বিরল। শিক্ষা জীবন শেষে তাদের জন্য কোন সহজ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও নেই। উপজাতীয় অগ্রাধিকারের ঠেলায় তারা সর্বত্র কোণঠাসা। জাতীয় পর্যায়েও তারা কঠিন প্রতিযোগীতায় আবদ্ধ। সংখ্যায় বেশী না হলেও, স্থানীয় শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক যুবতীরা কর্মসংস্থান বর্জিত হতাশ। এই পরিস্থিতি তাদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি করছে। এসবই চরম বৈষম্য অবিচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘঁটনা।

পার্বত্য চুক্তি, তার মুখবন্ধ ও বাংলাদেশ সংবিধান

পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে, যে সময়টি তার খুটিনাটি উদ্ভাবনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু লক্ষণে বুঝা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন ও শীর্ষ আমলা মহল সে ব্যাপারে উদাসিন। তারা এই চুক্তি বাস্তবায়নে নতুন করে প্রয়োজনীয় -- বিধি বিধান রচনায় ব্যস্ত, যথাঃ পার্বত্য মন্ত্রণালয় স্মারক নং পাঁচ বিম (গম-১) ৩০/২০০১-৫২৯ তাং ২৬-৬-২০০১ খৃঃ ঢাকা।

এরশাদ সরকার পার্বত্য সংকট সমাধানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। তখন আওয়ামীলীগ ও বিএনপি তার সমালোচনা করেছে। নব্বই এর দশকে বিএনপি ক্ষমতায় বসে তার কোন রদ বদল বা সংশোধন কিছুই করেনি।তৎপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় সমাসীন হয়ে বিদ্রোহী উপজাতীয় সংগঠন পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সাথে একটি সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হতে সক্ষম হয়, যদ্বারা ভারতে আশ্রিত উপজাতীয়রা স্বদেশে ফিরৎ আসে বিদ্রোহী শান্তিবাহিনী অস্ত্রসহ আত্মসমর্পন করে এবং পার্বত্য অঞ্চলে সংগঠিত অরাজকতা স্তিমিত হয়ে আসে, । কিন্তু আংশিক শান্ত এই পরিস্থিতি রচনায় বিএনপি মোটেও সহযোগিতা করেনি, এবং তাতে তার কোন অবদানও নেই। বরং তার চরম একগোয়ে বক্তব্য ছিলোঃ পার্বত্য চুক্তি একটি কালোচুক্তি, এটি প্রত্যাখান যোগ্য, এর দ্বারা দেশের অখন্ডতা ক্ষুণ্ন হবে। পুনরায় নির্বার্চন কালে, সে প্রচার করা সংবিধানের আলোকে এটি সংশোধন করা হবে। কিন্তু সব ভন্ডুল। আওয়ামী চুক্তি হুবহু পালিত হচ্ছে। একটি দাড়ি কমাও বদলাচ্ছে না। এঁটা কি প্রতিভা ও রাজনীতি সংক্রান্ত দেউলিয়াত্ব নয় ?

এঁকথা শত্রুকেও স্বীকার করতে হবে যে, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বাঙ্গালী বসতি স্থাপনই পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে বাঁচিয়েছে এবং এঁটিই বিএনপির পার্বত্য রাজনীতির একমাত্র পূঁজি। বেগম জিয়ার দুটি শাসন আমল হলো পূর্ববর্তী দুই সরকারের পদাঙ্ক অনুসরন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য নীতিতে তার কোন অবদান নেই। কেবল সমালোচনা ও কঁটুক্তির তো কোন মানে হয় না। এঁটা স্বীকার করতে হবে যে নমনীয় পার্বত্য চুক্তির দ্বারা আওয়ামী লীগ ও তার সরকার পার্বত্য জনসংহতি সমিতিকে এক প্রচন্ড মার দিয়েছে। সে মারটি হলো পার্বত্য চুক্তির মুখবন্ধ। হাল্কা ভাবে না পড়ে এটিকে তলিয়ে দেখলে বুঝা যাবেঃ জনসংহতি সমিতি তার দাবী দাওয়ার সবই হারিয়েছে, কিছুই অর্জন করতে পারেনি। দেশের অখন্ডতা ও সংবিধানের প্রতি সে আনুগত্য

দেখিয়েছে, এবং চুক্তির অনুসরণীয় মূলনীতি হলো তাই। চুক্তির বাদ বাকি অংশ এই মূলনীতির সাথে সঙ্গতিশীল নয়। তাতে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় অখন্ডতা এবং সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে, যা করার অধিকার কারো নেই। এ ব্যাপারে সাংবিধানিক নির্দেশ হলোঃ

বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ নং ৭(১)ঃ প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিক জনগণ, এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের চরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন, এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জসপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।

অনুচ্ছেদ নং ২৬ (১) এই ভাগের (তৃতীয় ভাগ মৌলিক অধিকার) বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন, যতখানি অসামঞ্জসপূর্ন এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে, সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রনয়ন করিবেন না, এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ন, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

এই চূড়ান্ত সংবিধানিক নীতি নির্দেশ অনুসারে পার্বত্য চুক্তি ও তার আওতায় প্রণীত আর প্রণীতব্য আইন ও বিধি বিধান অবশ্যই মূল্যায়ন যোগ্য। তাতে চুক্তির অন্তর্ভূক্ত যে সব দফা বিধি বিধান ও আইনে সংবিধানিক অসামঞ্জস্যতা পওয়া যাবে, তা প্রয়োগ যোগ্য হবে না। এমন কি তা বাতিল পর্যন্ত হবে। এমন চুক্তি সম্পাদন ও আইন বিধি প্রণয়ন ও নিষিদ্ধ। পার্বত্য চুক্তি দলিলটির একমাত্র মুখবন্ধটি এই নিষেধাজ্ঞায় পড়ে না। চুক্তির দফাওয়ারী বাকি অংশের পুরোটাই সংবিধান বিরুদ্ধ। এই সংবিধান বিরোধীতাকে অবজ্ঞা করে বিধি বিধান প্রণয়ন ও তা প্রয়োগ, সাংবিধানিক অপরাধ। ২৬(২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা, পূর্ববর্তী আওয়ামী সরকার তো অবজ্ঞা করেছেনই, বর্তমান জোট সরকারও তার অনুসরণ করছেন। অথচ তলিয়ে দেখার অবকাশ আছে যে, বিদ্রোহ বিধ্বস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে চুক্তিটি যেমন প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে, তেমনি অসাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থা দূরিকরণেও এটি কার্য্যকর। মুখবন্ধই চুক্তির অঙ্গীকার ও মূলনীতি। সে অনুসারে গৃহীত অঙ্গীকার ও মূলনীতি রক্ষায় চুক্তিকারী উভয় পক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য।

ভূমি ও মানুষের সমম্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত। রাষ্ট্রের চৌহদ্দিভূক্ত বৈধ বাসিন্দাদের নিয়েই গঠিত জাতি। এই দৃষ্টিতে রাষ্টীয় অখন্ডতার ভিতর জাতীয় অখন্ডতাও নিহিত। উপজাতীয় জনসংহতি সমিতি রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষায় চুক্তিবদ্ধ। এটি জাতীয় অখন্ডতা রক্ষার চুক্তিও বটে। এমতাবস্থায় চুক্তিভূক্ত দফাগুলোকে অখন্ড জাতীয় স্বার্থ ভিত্তিক হতে হবে। এজন্য মুখবন্ধে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের অধিকার ও উন্নয়নের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছে। এর বিপরীতে চুক্তির দফাওয়ারী বিবরণে কেবল উপজাতীয় কল্যাণ, অগ্রাধিকার ও

পদ সংরক্ষন এবং বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের বঞ্চনার বিধি ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্তি অবাঞ্ছিত, যা চুক্তির মূলনীতি অঙ্গীকার ও সংবিধান অনুমোদন করে না। এই সীমা লঙ্ঘন অবশ্যই প্রয়োগযোগ্য নয়। মুখবন্ধের অঙ্গীকার অনুসারে উভয় পক্ষ এই ক্রটিগুলো সংশোধনে বাধ্য।

এখন প্রশ্ন হতে পারেঃ চুক্তি কালে উভয় পক্ষ এই ক্রটি গুলোর প্রতি সায় দিয়েছেন এবং এখন তা চুক্তির অংশে পরিণত। পরবর্তীদের জন্য এখন এগুলো পালনীয় বাধ্য বাধকতা। এর ব্যতিক্রম করা হবে অসন্তোষজনক ও উত্তেজনাকর। নতুন করে এটি অশান্তি সৃষ্টির কারণ হতে পারে, যা বাঞ্ছনীয় নয়।

এটি এক নিরিহ বক্তব্য। আওয়ামী সরকার, এ ক্রটিগুলো জেনে শুনে করেছেন। তাদের মূল লক্ষ্য ছিলঃ আগে শান্তি অর্জন। তাই কুটকৌশল পূর্ণ অঙ্গীকার ও মূলনীতিটা, মুখবন্ধে স্থাপন করে, প্রতিপক্ষকে সব দেওয়ার ঝুকি নিয়েছেন, যে মুখ বন্ধ একদিন প্রতিপক্ষের সব পাওয়ার ব্যবস্থাগুলো বানচাল করে দেবে। শুধু দরকার হবে একটি রীট মামলার। যে কোন বিক্ষুব্ধ পক্ষ তা উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করলেই, মুখবন্ধের পক্ষে রায়টি হবে, তা নিশ্চিত।

চুক্তির দ্বারা আওয়ামী পক্ষের রাজনৈতিক অর্জন ও সাফল্য হলোঃ

ক) ভারতে আশ্রিত উপজাতীয় শরণার্থীরা ফিরৎ এসেছে।

খ) সশস্ত্র শান্তি বাহিনী অস্ত্র গোলাবারুদ সহ আত্মসমর্পন করেছে।

গ) বিদ্রোহী উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ এখন নিয়ন্ত্রণাধীন ও পূনর্বাসিত।

এখন অবশিষ্ট যা করণীয় তা ক্ষমতাসীন সরকারকেই করতে হবে, এবং তা হলোঃ

ক) চলমান উপজাতীয় সন্ত্রাস দূর করা।

খ) সংবিধান ও মুখবন্ধের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে পার্বত্য চুক্তি সংশোধন ও তার পক্ষে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করা।

গ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার পরিবেশ সৃষ্টি, বৈষম্য বিলোপ ও প্রতিযোগিতা মূলক গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব ও পদায়নের ব্যবস্থা করা।

ঘ) স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ভূমি মালিকানা, গৃহায়ন ও পেশা প্রশিক্ষণের বৈষম্যহীন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

ঙ) জরিপের দ্বারা সর্বাধিক পশ্চাদপদ লোক ও সম্প্রদায় নির্ণয় ও তাদের উন্নয়নে মেয়াদী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

উল্লেখ্য যে চুক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে জনসংহতি সমিতিকে যে ছাড় দেয়া হয়েছে, তা চুক্তির মুখবন্ধই সমর্থন করে না। এবং তা সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৬ ও ৪২ এর সরাসরি লঙ্ঘনও বটে। চুক্তির অন্যতম পক্ষ জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এ ক্রটি সংশোধনে নীতিগত বাধ্য। তাদের কাছে ক্রটি গুলো তুলে ধরা দরকার। নতুন

বিদ্রোহের ভয় ও তোষামোদ যথার্থ কাজ নয়। সরকারকে সাহসী ভূমিকা নিতে হবে।

জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের পূনর্বাসন ব্যবস্থা হলো আঞ্চলিক পরিষদ গঠন। আসলে এই পরিষদের কোন সাংবিধানিক সংস্থান নেই। দেশ সাংবিধানিক ভাবে এককেন্দ্রিক। কতিপয় প্রশাসনিক ইউনিটে মাত্র এটি বিভক্ত। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৫৯ প্রত্যেক প্রশাসনিক ইউনিটে প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা অনুমোদন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১ ও ৫৯ এই উভয় আইনের কোনটিতেই সংস্থান যোগ্য নয়। তবুও এটিকে আইন সঙ্গত করার কোন প্রচেষ্টা নেই। এঁটা সরকারের ত্রুটি। পার্বত্য চট্টগ্রামকে ডিভিশনে উন্নীতি করা গেলেই এ ত্রুটির সংশোধন হয়ে যায়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১ অথবা ৫৯-এ প্রয়োজনীয় সংযোজন বা সংশোধনী এনেও সংস্থান ব্যবস্থা করা সম্ভব, অথবা দেশটাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পূণর্গঠন করা হলেও, এরূপ আঞ্চলিক পরিষদের সংস্থান হতে পারে। এরূপ গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মালিক সরকার হলেও রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা সম্পন্ন লোকই যেন সরকারে নেই। কায়েমী পদাধিকারের রাজনীতির বলেই প্রতিভার কদর অবহেলিত।

পার্বত্য চুক্তির প্রশংসিত মুখবন্ধটি এখানে উল্লেখ্য, যথা ঃ

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে প্রার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, নিম্নেবর্ণিত চারিখন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন।

চুক্তিটি সরকারী কিনা, এ প্রশ্নটি বাদ দিয়েও বলা যায়।, এর মুখবন্ধটি হলো মৌলিক বাধ্যবাধকতা। চুক্তির দফাওয়ারী বক্তব্য এর ব্যতিক্রম হলে, খোদ এ মুখবন্ধ বলেই তা বাতিল যোগ্য। তজ্জন্য পৃথক বাতিল আদেশ জারির প্রয়োজন নেই। প্রতিপক্ষকে তা জানিয়ে দেয়াই হবে যথেষ্ট এবং এ বলে দেয়াও আবশ্যক যে, চুক্তিভূক্ত এই এই দফা, মুখবন্ধ ও সংবিধান বিরোধী। সুতরাং এ বিতর্কিত বিষয় সমূহ বাস্তবায়ন আইন সঙ্গত নয়।

সাংবিধানিক আইন হলোঃ

ক) অনুচ্ছেদ নং ১৯ (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

খ) অনুচ্ছেদ নং ২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

গ) অনুচ্ছেদ নং ২৯ (১)। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল

নাগরিকের জন্য সুযোগের ক্ষমতা থাকিবে।

এই আইন চতুষ্টয় অমান্য করে, পার্বত্য চুক্তিতেও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে, মন্ত্রী পদ ও চেয়ারম্যান পদ উপজাতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। কর্মসংস্থান ভূমি বন্দোবস্তি সহ যাবতীয় অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রাপ্য। এই বৈষম্য সমূহ একাধারে অগণতান্ত্রিক, অমানবিক আর অসাংবিধানিক। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ২৮ (৪) নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের কল্যাণে প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়নের বাধাহীন অনুমোদন দিলেও তা কেবল উন্নয়ন ভিত্তিক। মৌলিক অধিকার মূলক আইন তদ্বারা লঙঘনীয় নয়। এই সাংবিধানিক ত্রুটিগুলো সংশোধিত না হলে যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির রীট মামলার দ্বারা, অথবা খোদ সুপ্রিম কোর্টের সুয়োমটো ক্ষমতা বলে, বর্ণিত আপত্তিকর চুক্তি ও আইন গুলোর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে, এই সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। দলীয় রাজনীতির স্বার্থে ও প্রভাবে অনির্দিষ্ট কাল অনুরূপ রীট ও সুয়োমটো মামলা ঠেকিয়ে রাখা কঠিন হবে। তার আগে অনগ্রসরদের আইন সঙ্গত উন্নয়ন ব্যবস্থার বিনিময়ে সাংবিধানিক আপত্তিগুলোর মীমাংসা হয়ে যাওয়া উচিত। চুক্তির মুখবন্ধই তার পথ প্রদর্শক। তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ঐকমত্য তাতে আছে।

স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দার সনদ দান, কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। এটি সামন্ত প্রধান, তিন উপজাতীয় রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন করা মানে গণপ্রজাতন্ত্রীকতা ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। অনুচ্ছেদ নং ১ এমন কার্যক্রমের পরিপন্থী। অনুচ্ছেদ নং ১২২ নাগরিকদের ভোটাধিকার সুনির্দিষ্ট করেছে। কিন্তু চুক্তি ও জেলা পরিষদ আইনে তা শর্তাধীন করা হয়েছে, যা সংবিধানের গর্হীত সীমা লঙ্ঘন। চুক্তি ও আইনের কতিপয় ধারায়, সংবিধানের সর্বোচ্চ মর্যাদাকে ক্ষুণ করে বলা হয়েছেঃ "অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন" এই বক্তব্য সংবিধানের পক্ষে চূড়ান্ত অবমাননাকর। এঁটা অনুচ্ছেদ নং ৭ (২) এর সরাসরি লঙ্ঘন। অবাধ চলাচল পেশা ব্যবসা, বাণিজ্য ও ভূমি মালিকানা সংবিধানের ৩৬ ও ৪২ ধারায় নিশ্চিত করা হয়েছে। যা চুক্তিতে মান্য হয়নি এটা ও সংবিধান লঙ্ঘন।

পার্বত্য সমস্যার সমাধান কী ?

বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যা সমূহের মাঝে অন্যতম বড় সমস্যা হলো, পার্বত্য অঞ্চলের অশান্তির বিষয়টি। এর পক্ষে এ পর্যন্ত দুবার দুটি বড় ধরনের সরকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তাতে উপজাতীয় অসন্তোষের পুরাপুরি সুরাহা এখনো হয়নি। এখন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে জাতিগত ভিন্ন অবস্থানের সমস্যাটি, যা বিগত আওয়ামী সরকারের সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তি ও এরশাদ সরকারের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের দ্বারা সৃষ্ট। এই চুক্তি ও আইনের বলে উপজাতিরা হয়েছে সংরক্ষিত পদের অধিকারী ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সুবিধাভাজন, আর বাঙ্গালীরা তাদের প্রতিপক্ষ অবহেলিত সমাজ। এই বৈষম্য আর অগণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা এশাধারে সংবিধান বিরুদ্ধ তো বটেই, সাম্প্রদায়িক শান্তি রচনার পক্ষে ও তা সহায়ক নয়।

বিএনপি সরকার গত ১৯৯১-৯৬ সালে স্বীয় কার্য কালে শান্তি স্থাপনে, বিদ্রোহী উপজাতীয় সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে সমঝোতার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সংলাপ চালিয়ে ও কোন মীমাংসায় পৌছাতে পারেনি। পরিপূর্ণ মীমাংসার আশায়, ইতিপূর্বে এরশাদ সরকার প্রদত্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মঞ্জুরকৃত উপজাতীয় সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ও কোনরূপ যোগ বিয়োগ করা থেকে সে বিরত থাকে। বিএনপি কোনরূপ শূণ্যতা সৃষ্টি করতে চায় নি, এবং কোন উগ্রতাকে ও প্রশ্রয় দেয়নি। এ কারণেই তার নির্বাচনী ইশতেহারে আলাপ আলোচনা ও সমঝোতার উপর জোর দেয়া হয়। যদি ও তার পূর্ব ঘোষিত নীতি ছিলোঃ আওয়ামী শান্তি সংলাপের সাথে শরিক না হওয়া, পার্বত্য শান্তি চুক্তি প্রত্যাখান ও বাতিল করা। এই উদ্দেশ্যেই সে চুক্তিটিকে কালো চুক্তি নামে আখ্যায়িত করেছিল। দায়িত্বশীল বিবেচনায় সে নিজ পার্বত্যনীতিকে নতুন পরিস্থিতির আলোকে পুনরায় ঢেলে সাজিয়েছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে ২০০১ সালের প্রচারিত নির্বাচনী ইশতেহারে। এই সাথে সে উপজাতীয় সমাজে স্বীয় আসন পাকা পোক্ত করার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি আসনে একজন প্রাক্তন শান্তিবাহিনী কর্মকর্তা মনি স্বপন দেওয়ানকে এবং বান্দরবান আসনে মারমা নেত্রী মামা চিং কে মনোনয়ন দিয়ে প্রমাণ করেছে, সে উপজাতিদের স্বার্থ বিরোধী নয়। তিন আসনের অপরটি খাগড়াছড়িতে আবদুল ওয়াদুদ ভূইয়াকে মনোনয়ন দানের দ্বারা পার্বত্য বাঙ্গালীদের স্বার্থে ভারসাম্য রচনাই তার লক্ষ্য হওয়া ব্যক্ত হয়েছে। তার পার্বত্য নীতিতে কোন একতরফা ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। উভয় পাক্ষিক রাজনৈতিক আশ্বাসই ব্যক্ত

হয়েছে তার নির্বাচনী নীতি আদর্শ সম্বলিত ইশতেহারে। সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি এখানে বিবেচ্যঃ

"শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে আওয়ামী লীগ সরকার গোপনে ও জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে, সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্য পূর্ণ যে চুক্তি করেছে, তা এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এই বাস্তবতার আলোকে সমস্যাটির সংবিধান সম্মত এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে।"

এই নীতি আদর্শের ভিত্তিতে বিএনপি দুই বিজয়ী এমপি মনি স্বপন দেওয়ান ও আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়ার প্রধান দায়িত্ব হলোঃ মীমাংসার ফর্মূলা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, যে ফর্মূলা হবে পাহাড়ী বাঙ্গালীর বৈরীতা নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে জোরদার করা, ও সম্প্রীতি রচনা। জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী পাহাড়ীর সংখ্যা সাম্যকে বজায় রাখা। ক্ষমতা থেকে সংরক্ষণবাদকে বিদায় করে গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতির প্রতিষ্ঠা। সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে একের অগ্রাধিকার আর অপরের বঞ্চনা নয়, বরং দেশ ভিত্তিক ও জাতীয় পর্যায়ে বর্ধিত মঞ্জুরী অর্জন। ক্ষমতা ভোগের ক্ষেত্রে মিয়াদ ভিত্তিক বারি প্রথা আরোপ তথা বিরতি মানা এবং স্থানীয় জন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের বিকল্প পদের সংস্থান করা, যাতে বারি ভিত্তিক বিরতি কালে, ক্ষমতার ভাগ বিপক্ষেরও নাগালে থাকে।

এই পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা একা পাহাড়ীরা নয়, সমান সংখ্যক বাঙ্গালীরা ও তাদের প্রতিবেশী। যদি বাঙ্গালীদের অস্থানীয় সেটেলার অখ্যায়িত করে, তাদের প্রত্যাহারের দাবীতে পাহাড়ীরা সোচ্চার ও আন্দোলন মুখর থাকে, তা হলে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় স্থানীয় বাঙ্গালীরাও এ বলে মুখর হবে যে স্থানীয় পাহাড়ীরা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নয়,তারা অবাংলাদেশী অভিবাসীদের বংশধর। তাদের বাঙ্গালী প্রত্যাহারের দাবী অযৌক্তিক। পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো চট্টগ্রাম নামীয় ভৌগোলিক অঞ্চলেরই অংশ, এবং এই গোটা অঞ্চলের আদি বাসিন্দা হলো চট্টগ্রাম মূলের লোক। পাহাড়ীদের বাংলাদেশী নৃতাত্ত্বিক মৌলিকত্ব নেই। এই যুক্তির ভিত্তিতে তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার দাবী, ও চট্টগ্রামী সহ বহিরাগত অপর বাঙ্গালীদের স্থানীয় নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হলো ইচ্ছাকৃত বৈরীতা। পাহাড়ীদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার পক্ষে এরূপ অসহনশীলতা মোটেও উপযোগী নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার বাসিন্দা উপজাতিদের সম্পর্কে বিএনপির উদার মনোভাব তার নির্বাচনী ইশতেহারে অত্যন্ত যৌক্তিক ও নমনীয় ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে পূর্ববর্তী কঠোরতার লেশ মাত্র নেই। এই মনোভাবকে স্বাগত জানিয়ে উপজাতীয় পক্ষকে ও নমনীয় হতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই মানতে হবে, পার্বত্য চুক্তিতে ইতিহাস ও সংবিধান লঙ্ঘনের মত গুরুতর ত্রুটির অবতারনা হয়েছে, যা সংশোধন করা ছাড়া উপায় নেই। জাতি ও রাষ্ট্রের অখন্ডতা আর সার্বভৌমত্বকে ও চুক্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে, যে ব্যাপারে ছাড় দেয়ার কোন সুযোগ নেই।

চুক্তির মুখবন্ধে সুন্দর করে বলা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পুর্ণ ও অবিচল অনুগত্য বজায় রেখে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত, এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা, এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এই চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

এই মুখবন্ধই চুক্তির মূলনীতি, এবং তৎসঙ্গে চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষই অঙ্গীকারাবদ্ধ। এখানে পালনীয় মূলনীতি আর অঙ্গিকার হলোঃ

(ক) চুক্তিটি হবে সংবিধান সম্মত ঃ

(খ) তাতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আর অখন্ডতা লঙঘন করা হবে না।

(গ) পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস ও অবস্থানকারী প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ও উন্নয়ন সমুন্নত ও ত্বরান্বিত করা হবে।

চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় উপরোক্ত তিন অঙ্গিকার ও মূলনীতি পালন করতে বাধ্য। যদি চুক্তির বিষয়বস্তু, ও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এর ব্যতিক্রম হয়, তা হলে তা সংশোধন যোগ্যক্রুটিরূপে গণ্য হবে। অঙ্গিকার ও মূলনীতির খেলাপ ক্রুটি সমূহ অবশ্যই সংশোধন যোগ্য।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, চুক্তির বহু দফাতেই সংবিধানের নীতি নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা আর অখন্ডতা অক্ষুণ্ন থাকে নি, এই সমালোচনা ও অভিযোগের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হলোঃ

ক) সংবিধান লঙঘন ঃ

১) সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১-এ বলা হয়েছে ঃ (উপ অনুচ্ছেদ) (১)

"বাংলাদেশ এশটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।"

এই আইন ও আদেশ বলে বাংলাদেশ হলো একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এতে ফেডারেল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আরোপ যোগ্য নয়। গোটা দেশ একটি একক রাজনৈতিক কাঠামোতে আবদ্ধ। তাতে কেবল প্রশাসনিক ভাগ বিভাগই আঞ্চলিক পরিচিতির ভিত্তি। রাজনৈতিক অঞ্চল ও শাসন প্রশাসনের পরিবর্তে এই একক কাঠামোতে প্রশাসনিক অঞ্চল ভিত্তিক জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক স্থানীয় শাসন বা সরকার পদ্ধতি সাংবিধানিক ভাবে অনুমোদিত, যথাঃ

অনুচ্ছেদ নং ঃ ৫৯ (১) ঃ

"আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।"

এই সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিপরীতে প্রশাসনিক এলাকা ডিঙ্গিয়ে কোন স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান গড়ার কোন সংস্থান নেই। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে, যা কোন প্রশাসনিক অঞ্চল নয়। সুতরাং এটি সংবিধান বহির্ভূত ব্যবস্থা।

(২) অনুচ্ছেদ নং ২৭ (মৌলিক অধিকার) ঃ

"সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"

(৩) অনুচ্ছেদ নং ২৮ (১) মৌলিক অধিকার) ঃ

"কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী বর্ণ, নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।"

(২) রাষ্ট্র বা জন জীবনের সর্বস্তরে নারী, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকুলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবেন না।"

(৪) অনুচ্ছেদ নং ২৯ (১) (মৌলিক অধিকার)ঃ

"প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।"

এই বিধান গুলো মৌলিক অধিকারযুক্ত তো বটেই, এর বিপরীতে আইন প্রণয়নের সাংবাবিধানিক নিষেদ্বাজ্ঞা ও আছে যথা ঃ

" অনুচ্ছেদ নং ২৬ (১) (মৌলিক অধিকার) এই (তৃতীয়) ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ, এই সংবিধান প্রতর্বন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"

"(২) রাষ্ট্র এই ভাগের বিধানের সহিত অসামঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না, এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"

"অনুচ্ছেদ নং ৭ (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।"

"(২) জনগণের অভিপ্রায়ের চরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবধিান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"

অনুচ্ছেদ নং ১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মুল্যের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ নিশ্চিত হইবে, এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

উপরোক্ত সাংবিধানিক নীতি নির্দেশের দ্বারা প্রথমেই প্রচলিত আইন হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল ধুলিস্বাৎ হয়ে যায়। স্থানীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চীফশীপ তো থাকেই না, শাসন প্রশাসনে ও আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যের অবসান ঘটে।

প্রচলিত আইনের দ্বারা সংবিধান লঙ্ঘনকে এ পর্যন্ত পরোয়াই করা হয়নি। তদুপরি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অসাংবিধানিক চুক্তি ও আইন, যা স্ববিরোধী ও বটে। এই অসাংবিধানিক চুক্তি ও আইনের পক্ষে সংবিধান থেকে গৃহীত পুঁজি হলোঃ অনুচ্ছেদ নং ২৮ এর উপ অনুচ্ছেদ (৪) যাতে বলা হয়েছে ঃ

"নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রনয়ণ হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

এখানে বিবেচ্য যে উপজাতি বা উপজাতিভুক্ত অনগ্রসর নাগরিকদের সবাই এই উপ অনুচ্ছেদ বলে উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিষয়ে বিশেষ বিধান লাভের অধিকারী। এই বিশেষ বিধান লাভের বেলায়, উপজাতি অউপজাতি বৈষম্য আরোপের কোন সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে জাতি, ধর্ম বর্ণ, গোষ্ঠী ইত্যাদির তারতম্য করা, পদ সংরক্ষণ ও সুযোগ সুবিধায় অগ্রাধিকার দান, কোনক্রমেই অনুমতি যোগ্য নয়। কিন্তু চুক্তি ও পার্বত্য আইনে উপজাতি আর অ উপজাতি সত্তার ক্ষেত্রে তারতম্য করা হয়েছে। সংবিধানভূক্ত তৃতীয় ভাগের আইন গুলো মৌলিক অধিকার সম্পন্ন। এগুলো লঙ্ঘন ও এগুলোর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিধি বিধান প্রণয়ন নিষিদ্ধ তো বটেই, অনুরূপ আইন ও বিধি বিধান রচিত হলেও তা অকার্যকর ও বাতিল গণ্য হবে। অনুচ্ছেদ নং ২৮ (৪) খোদ ঐ মোলিক অধিকার ভূক্ত অলঙ্ঘনীয় আইন হলেও তদ্বারা অন্যান্য মোলিক অধিকার লঙ্ঘন অনুমোদিত নয়, এবং ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নারী ও পুরুষে বৈষম্য আরোপের সুযোগও নেই। এই অনুচ্ছেদ সবার জন্য রক্ষা কবচ।

খ) চুক্তি ও পার্বত্য আইনের বিধান হলো ঃ

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্জল। কিন্তু তথ্য উপাত্ত বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর মিশ্র অধ্যুষিত অঞ্জল। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১ এই দেশটিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে আখ্যায়িত করেছে। এটি একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, যা রাজনৈতিক সাম্প্রাদয়িক ও অঞ্জল ভিত্তিতে বিভক্ত নয়। অনুচ্ছেদ নং ৬ (২) নাগরিকদের অখন্ড বাংলাদেশী জাতি রূপে আখ্যায়িত করেছে। সুতরাং আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রাদয়িকতা নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে পার্বত্য চুক্তিতে বাংলাদেশী জাতিভূক্ত লোকজন উপজাতি আর অউপজাতিতে বিভক্ত, আর দেশের এতদাঞ্চল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইউনিট না হওয়া সত্ত্বেও, এক বিশেষ অঞ্চল রূপে চিহ্নিত। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পৃথক পরিচয় অনুচ্ছেদ নং ২৩ এর পরিপন্থী না হলেও জাতীয় সংস্কৃতি ও সামাজিকতাই চর্চনীয়। নতুবা জাতীয় আর রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষা হবে কঠিন। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামকে একক ভাবে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বলা জাতি ও দেশের অখন্ডতার পরিপন্থী অসাংবিধানিক ব্যবস্থা।

২। চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ অনুমোদিত। অথচ, প্রশাসনিক ইউনিট ভিত্তিতে জেলা পরিষদই সংস্থান যোগ্য, যথা অনুচ্ছেদ নং ৫৯। আঞ্চলিক পরিষদ ভূক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক ইউনিট নয়, দেশের সব জেলার জন্য অভিন্ন জেলা পরিষদ আইন এখনো রচিত ও কার্যকর হয়নি। বিশেষ অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও অগ্রাধিকার মঞ্জুর বৈষম্যের সৃষ্টি করবে, যা অনুচ্ছেদ নং ২৭ ও ২৮এ নিষিদ্ধ। আগামীতে সাধারণ জেলা পরিষদ আইন এই তিন পার্বত্য জেলায় প্রচলিত না হলে, স্থানীয় বর্ধিত সুযোগ সুবিধা আর অগ্রাধিকারের ব্যাপারটি দেশ জুড়ে, অশান্তি উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। সাম্প্রদায়িক পদ সংরক্ষণ ও আসন কোটা ভিত্তিক নির্বাচনের স্থানীয় বিধি বিধানটিও আইন সম্মত নয়। অবাধ অসাম্প্রদায়িক নির্বাচনই হলো আইন। জনগণের গণতান্ত্রিক অভিপ্রায় ও প্রতিনিধিত্বই অনুচ্ছেদ নং ১১ তে প্রাধান্য পেয়েছে। তাতে সাম্প্রদায়িকতা ও সংরক্ষণ বাদের কোন স্থান নেই। এই আইনী বিবেচনায় কেবল জেলা পরিষদ টিকে থাকতে পারলে ও, তার নির্বাচন পদ্ধতি অনুমোদনীয় নয়। মন্ত্রী পদ, চেয়ারম্যান পদ, সদস্যপদ আইনতঃ অবাধ আর অসংরক্ষিত। এর কোন ব্যতিক্রম মান্য নয়। কোনরূপ অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন মূল নির্বাচনী আইন অনুমোদন করে না। অথচ আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন ব্যবস্থায় তাই গৃহীত হয়েছে। স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া ব্যতীত অন্যদের ভোটাধিকার বাতিলের ব্যবস্থা অনুচ্ছেদ নং ১২১ ও ১২২ অনুসারে গ্রহন যোগ্য নয়। প্রত্যেক বৈধ বাংলাদেশী নাগরিক সে নিজ বসবাস ও কর্মক্ষেত্রে ভোট প্রার্থী ভোটার তালিকা ভূক্ত হওয়ার ও নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী। অনুচ্ছেদ নং ১১ অনুযায়ী এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার। পার্বত্য চুক্তি ও পরিষদ আইনে প্রণীত ভিন্ন বিধি বিধান তাই অসাংবিধানিক।

৩। তিন উপজাতীয় রাজা বা সার্কেল চীফের নিযুক্তি হলো ঔপনিবেসিক সামন্তবাদী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা স্বাধীনতার পরিপন্থী। অনুচ্ছেদ নং ১ ও ১১ এই ব্যবস্থাকে অনুমোদন করে না। আইনতঃ জনগণের উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব নেই। অথচ পার্বত্য চুক্তিতে তারা পদাধিকার বলে স্থায়ী বাসিন্দা সদনপত্র প্রদান, পরিষদে আসন গ্রহন ও বক্তব্য দানের অধিকারী। ভুমি কমিশনে ও তারা পদাধিকার বলে অন্তর্ভূক্ত সদস্য।

জমি বন্দোবস্ত, মালিকানা, ব্যবসা বাণিজ্য, আর কর্ম সংস্থানে উপজাতীয় অগ্রাধিকার, বাঙ্গালীদেরকে অবিচার ও বঞ্চনার অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছে। তাদের বাঙ্গালী পরিচয়টা ও অস্বীকৃত। উপজাতিদের একটি সাম্প্রদায়িক তালিকা আছে, কিন্তু অউপজাতিদের কোন তালিকা নেই। সুতরাং অউপজাতীয় স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের পরিচয়টা ও বিতর্কিত। দয়া করে রাজা বাবুরা প্রজা বলে স্বীকার করলেই মাত্র রক্ষা। এরূপ ভাগ্যবান বাঙ্গালীদের তালিকায় সেটেলার বাঙ্গালীরা নেই।

রেড ক্লিফ রোয়েদাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানভূক্ত হয়েছে, মুসলিম সংখ্যাধিক্যের বলে নয়। বাঙ্গালী আধিপত্যের বলে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে

বাঙ্গালী সংখ্যাধিক্য ছিলো না। সুতরাং এতদাঞ্চলের বাংলাদেশ হয়ে টিকে থাকার উপায় মাত্র দুটি। একঃ উপজাতিদের স্বেচ্ছায় বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার করে থাকা। দুইঃ স্বপক্ষীয় জনশক্তি বাঙ্গালীদের পৃষ্ঠপোষন ও শক্তিবৃদ্ধি।

ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, প্রথম উপায়টি নির্ভরযোগ্য নয়। শিশু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উপজাতিরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করে, দীর্ঘ আড়াই দশক কাল উৎপাত করেছে। পার্বত্য চুক্তির অধীনে তাদের আত্মসমর্পণ, স্থায়ী শান্তি গ্রহণ কিনা তা অনিশ্চিত। এতদাঞ্চলের বিদ্রোহ সাময়িক বিরতি গ্রহণ করেছে মাত্র। রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার পক্ষে এই সুযোগে স্বপক্ষীয় জনশক্তি পোষণই সমাধান। স্থানীয় বাঙ্গালী জন শক্তির পৃষ্ঠ পোষন ছাড়া তা কখনো সম্ভব নয়। বাঙ্গালী আবাসন না গড়ে ও এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

পর্বত প্রান্তিক দলীয় রাজনীতি-

(তাং শুক্রবার ২৫ আষাঢ় ১৪০৬ বাংলা ৯ জুলাই ১৯৯৯খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পন, রাঙ্গামাটি)

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে কোন জাতীয় রাজনৈতিক দলেরই রাজনীতি স্বচ্ছ বলে মনে হচ্ছে না। সবারই লক্ষ্য মনে হয় সাময়িক ফায়দা লোটা। তা না হলে পার্বত্য সংকটে সঠিক ঐতিহাসিক মূল তালাস করা হতো, এবং তারই ভিত্তিতে জাতীয় সংকট মুক্তির পথ ও নীতি নির্ধারণ অগ্রাধিকার পেতো। বলা যায় একমাত্র পার্বত্য জনসংহতি সমিতি ছাড়া কোন জাতীয় রাজনৈতিক দলেরই, সাংগঠনিকভাবে পার্বত্য ইস্যুসহ জাতীয় সমস্যা সংকটে দলীয় সুরাহার পক্ষে কোন নীতি ও সিদ্ধান্ত নেই। তাই ক্ষমতাসীন হলে, দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত তার ভিতর কেবল অন্ধভাবে সমাধান হাতড়ানই সার হয়, অথবা আন্দাজের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। তাই তো সঠিক ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে না এবং সংকট মুক্তিও ঘটছে না। তবু সঠিক আর বেঠিক হোক, নিজ নিজ কর্মক্রিয়ার পক্ষে বাহবা পেতে সবাই উদগ্রীব।

পার্বত্য রাজনীতির প্রথম ও প্রধান কথা হলোঃ স্থানীয় উপজাতীয় আধিবাসীদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ। এখানে বাঙ্গালী আর অবাঙ্গালী এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের বাস। এদের কে আদি বাসিন্দা আর কে বহিরদেশীয় অভিবাসী, অধিকার ও সযোগ সুবিধা নির্ধারণ ও বন্টনের ক্ষেত্রে, এই মূল তথ্যটাই উদঘাটন করা আগে দরকার। এখানে মূলনীতি হবেঃ সর্বক্ষেত্রে স্থানীয় আদি বাসিন্দাদের স্বার্থ ও অধিকার সর্বাগ্র গণ্য করা। অভিবাসী জনগোষ্ঠী, সংখ্যায় গরিষ্ঠ হলেও সংখ্যানুপাতিক প্রাধান্যের বলে সুযোগ সুবিধায় আদি বাসিন্দাদের ডিঙ্গাবেনা। যথার্থ মূল্যায়ন ও মূলনীতি ভিত্তিক এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্তকে গুরুত্ব দেয়া দরকার, এবং তারই ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে হবে, স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা কার প্রাপ্য। গাল গল্পকে তথ্যজ্ঞান করা ঠিক নয়, এবং সংখ্যাধিক্যের আজগৌবী দাবীতে প্রকৃত তথ্যকে খাটো করা যাবে না।

অবাঙ্গালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার দাবী নেহাতই আজগৌবী। সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও দূর্গম পার্বত্য সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ার অনুকূল কারণে তাদের রাজনৈতিক শক্তি ও অবস্থান সুবিধাজনক। তবু তাতেও প্রকৃত ইতিহাস বদলে যাবার নয়। তাদের বহিরদেশীয় আদিবাসী বংশধর হওয়ার পক্ষে বহুতর অকাট্য দলিল প্রমাণ বিদ্যমান, এবং অধিকাংশের অভিবাসন বৃটিশ আমলের ঘটনা।

পূর্বেকার প্রাচীন অবাঙ্গালীদের সংখ্যা অনির্ধারিত ও নগণ্য। বৃটিশ দখল যাদের কাছে প্রথম বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলো, সেই কুকি, লুসাই ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীকেই মাত্র, আদি অবাঙ্গালী স্থানীয় জনগোষ্ঠীরূপে মান্য করা যায়। চাকমা আর মগ অভিবাসন ও বিদ্রোহ, পরবর্তী আধিপত্য বিস্তারের ফল। তারা মুলত ঃ আরাকান ও চীন পর্বতাঞ্চল ত্যাগী শরণার্থী। তাদের স্বদেশ ভূমি মূলতঃ মিজোরাম ও আরাকান। এই তথ্য ও ইতিহাস সঠিক কি না, তার যাচাই বাছাই হতে পারে। তৎপূর্বে স্বতঃ সিদ্ধ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক নয় যে, অবাঙ্গালীরা নির্বিচারে স্থানীয় আদি বাসিন্দা ও স্থানীয়ভাবে সাধারণ সংখ্যাগুরু। এ কারণে তাদের অগ্রাধিকার প্রাপ্য।

এটা স্বীকার্য যে, স্থানীয় আদি বাঙ্গালী বাসিন্দা সংখ্যায় নগণ্য। তাদের বাদে অধিকাংশ বাঙ্গালী নবাগত আবাসিত। তবু এতদাঞ্চল কোন বাঙ্গালীর পক্ষেই বিদেশ নয়। তাই তারা এখানে অভিবাসীও নয়। বড় জোর তাদেরকে আবাদী জনগোষ্ঠী বলা যায়। তবু বিদেশাগত অভিবাসী বংশধরদের তুলনায়, তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা বেশি। সংখ্যাস্বল্পতা ও নব্য বসবাস, তাদের বিপক্ষে প্রদর্শন যোগ্য কোন যুক্তি নয়। দেশের মূল আইন সংবিধান, তাদের স্থানান্তর গ্রহণ, বসবাস, পেশা, ব্যবসা, চাকুরী ইত্যাদির ক্ষেত্রে, দেশাভ্যন্তরীন স্বাধীনতা প্রদান করেছে। তারা সাংবিধানিক সমতা ও ন্যায় বিচারের হকদার। তবে তারা সংখ্যালঘু অবাঙ্গালীদের উপর অগ্রাধিকার দাবীতে সোচ্চার নয়। যদিও মুল দেশবাসী হওয়ার গুণে, অভিবাসী বংশধরদের তুলনায়, তাদের অগ্রাধিকার প্রাপ্য। রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশ ও এই উদারতার অনুসারী। যদিও এই উদারতা সার্বজনীন সাম্য ও ন্যায় বিচার পর্যন্ত মান্য। এই তথ্য ও মূলনীতির বিচারে, সরকার ও দল সমূহের অনুসৃত পার্বত্য নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকৃতই বেপথু। আওয়ামী সরকার শান্তি চুক্তি ও পার্বত্য আইনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেঃ ইতিহাস ও তথ্যের ব্যাপারে তারা অজ্ঞ। আজগৌবী দাবীর কাছে তারা আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের সমালোচক দলগুলোর প্রথাগত বিরোধীতা দেখেও মনে হয়, তারাও তথ্য বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত। সিদ্ধান্তহীনভাবে, রাজনৈতিক গড্ডালিকা প্রবাহে, তাদেরও কেবল বাক চাতুর্য চলছে। সরকারও বিরোধী দল সবাই এক পথের পথিক।

আওয়ামী শান্তি চুক্তি ও পার্বত্য আইনকে বিরোধী পক্ষ থেকে কালো চুক্তি ও কালো আইন বলা হয়। আরো বলা হয় যে, বিরোধী পক্ষ তা নীতিগতভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং তা বাতিল করা হবে। কিন্তু তলিয়ে দেখা গেলে তথ্য পাওয়া যায়, পার্বত্য পরিষদ সমূহের আইনগুলোর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এরশাদ সরকারের হাতে, পরে প্রথম খালেদা সরকার তা লালন করেছেন, এবং সংলাপের মাধ্যমে তারাই, বর্তমান মীমাংসার রূপরেখা স্থির করে গেছেন। এখন তাদের বিপ্লবী কথাবার্তা, প্রথাগত বিরোধীতাই মাত্র। আর তা যদি না হবে, তা হলে দলীয় সাংগঠনিক পর্যায়ে আলোচনা ও নীতি নির্ধারণে অবহেলা কেন? ইতিহাসই কেন অচর্চিত? তাদের জোট সরকার আওয়ামী গড্ডালিকা প্রবাহে চালিত।

পার্বত্য জনসংহতি সমিতি জাতীয় রাজনীতির অনৈক্যও দূর্বলতার সুযোগে এখনই স্বাধীন জুম্ম ল্যান্ডের দাবী করছে না, এটা তাদের কৌশলগত সিদ্ধান্ত। মনে হয়, তারা

স্বাধীনতা না চাইলেও সরকার ও দলসমূহ তাদের সে পথে এগিয়ে দিচ্ছে।

জনসংহতি সমিতি লিখিত দাবীনামার মাধ্যমে দাবী করেছিলোঃ সংবিধান সম্মত গণতান্ত্রিক পরিষদ। কিন্তু সরকার ও দল সমূহ তাদের উপহার দিয়েছে অসাংবিধানিক সাম্প্রদায়িক পরিষদ।

মূলতঃ দাবী দাওয়াতে অনেক বাহুল্য থাকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষীয় দায়িত্ব হলোঃ সংলাপের দরকষাকষিতে তাকে সংযত সংহত ও যৌক্তিক পর্যায়ে আনয়ন করা। তবে সরকারী পর্যায়ে এই কৌশল অবহেলিত হয়েছে। সরকার পক্ষীয় মূখ্য সংলাপকারী ব্যক্তিদের কারো যোগ্যতার ভিত্তি ছিলো, সেনা ও আমলাতান্ত্রিক সাবেক পদ ও পদবির ভূষণ, আর কারো যোগ্যতার মাপকাঠি সরকার প্রধানের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাই তত্ত্ব, তথ্য ইতিহাস ও আইন উপেক্ষিত হয়েছে। প্রতিপক্ষ এই দূর্বলতাকে ভালভাবেই কাজে লাগিয়ে দাবীর বাহিরে অতিরিক্ত কিছু আদায় করে ছেড়েছেন। নইলে এটি শুধু উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হয় কেমন করে? এখন পার্বত্য অঞ্চলের পক্ষে বাংলাদেশ হয়ে থাকার জোর ও যুক্তি আছে কী? বৃটিশরা দেশ বিভাগ কালে এতদাঞ্চল পাকিস্তান তথা বাংলাদেশকে দিয়ে গেছে, এটা ভঙ্গুর ও খোড়া যুক্তি। স্বপক্ষীয় জনশক্তি ছাড়া কোন অঞ্চলই দেশের অখন্ড অঞ্চল হয়ে চিরদিন টিকে থাকতে পারে না। এখানে এই যুক্তির তো কোন প্রতিফলন নেই।

চুক্তিতে আঞ্চলিক পরিষদের মর্যাদা যুক্তিযুক্ত হয়নি। এ কী যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ, না স্থানীয় শাসনভূক্ত সংগঠন? দেশ সাংবিধানিকভাবে ইউনিটারী ষ্টেট। সুতরাং আঞ্চলিক পরিষদ অঙ্গরাজ্য ধরনের প্রতিষ্ঠান নয়। আবার পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক অঞ্চলও নয়। অতএব এটির স্থানীয় শাসন ভিত্তিক কোন ইউনিট ভিত্তিও নেই। তবে এটি কী? এই শূন্যতার কী কোন জবাব আছে?

উপজাতীয় চীফদের সর্দার পদবি সম্মানসূচক, শাসনতান্ত্রিক নয়। সরকারী ভাবে তারা কোন নির্বাহী কর্তৃপক্ষ নন। আর সরকারী নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হওয়া ছাড়া দেশ ও জনগণের উপর কারো কোন কর্তৃত্ব থাকা বৈধ হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই চীফদের পক্ষে স্থানীয় স্থায়ী আদিবাসিন্দা হওয়ার সনদ দানের ক্ষমতা কী বৈধ?

সংবিধানে মানুষে মানুষে আর অঞ্চলে অঞ্চলে বৈষম্য আরোপ নিষিদ্ধ। তাতে জাতীয়তা নাগরিকত্ব ও ভোটার হওয়ার পক্ষে একটি মাপকাঠিও আছে। কিন্তু পার্বত্য আইন এই সীমারেখা লঙঘন করেছে।

পার্বত্য অঞ্চল ও অবাঙ্গালীরা এখন পশ্চাদপদ কিনা নির্ণয় সাপেক্ষ। বরং শিক্ষা কর্মসংস্থান, যোগাযোগ ও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে এতদাঞ্চল সর্বাধিক অগ্রসর। এই অগ্রগতির অস্বীকৃতি কী যথার্থ? এর পক্ষে তথ্য, উপাত্ত কি দুস্প্রাপ্য? বলা যায়ঃ এসবই হলো আত্মঘাতী অন্ধ রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি অনুসৃত দুরবস্থা।

(তাং মঙ্গলবার ২৯ আষাঢ় ১৪০৬ বাংলা ১৩ জুলাই ১৯৯৯ খ্রীঃ/ দৈনিক গিরিদর্পন, রাঙ্গামাটি)

স্থানীয় রাজনীতিতে পার্বত্য জনসংহতি সমিতি আপাততঃ বিজয়ী শক্তিরূপে আবির্ভূত। সরকার স্বীয় স্থানীয় মন্ত্রী ও এমপিদের সহ তাদের হাতে কোণঠাসা। চুক্তি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে। কোন ভিন্নতা করা যায় নি। এ পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির অনুকুলেই সব কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। মাত্র দুটি দাবী নিয়ে সংশয় আছে, আর সে হলোঃ আভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু বাঙ্গালী পূনর্বাসন আর বাঙ্গালী প্রত্যাহার মূলক অলিখিত চুক্তির বিষয়।

জনসংহতি সমিতির বিপরীতে সরকার ও তার স্থানীয় দোসররা যেন অসহায় ও বিপন্ন। তারা যেন এই সংগঠনের মন যোগিয়ে চলমান। মাননীয় আওয়ামী প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায়ই ঘোষণা দিয়েছিলেন, অশান্তি উপদ্রবের দরুণ বাস্তুচ্যুত পার্বত্য বাঙ্গালীদের পুনর্বাসন করা হবে। তবে বাঙ্গালী প্রত্যাহারের অলিখিত চুক্তির কথা কেবল জনসংহতি সমিতিরই এক তরফা বক্তব্য। দেখা যাচ্ছেঃ প্রতিপক্ষের বিরোধীতার মুখে আভ্যন্তরীন বাঙ্গালী উদ্ভাস্ত পূনর্বাসিন প্রশ্নে সরকার চুপসে গেছেন, এবং অলিখিত চুক্তি অস্বীকারের বক্তব্যটিও জোরদার নয়। আওয়ামী পার্বত্য মন্ত্রীর মিন মিন অস্বীকারের কোন সমর্থন বা পূনরোক্তি নেই। এর অর্থ কী এটাই যে, পার্বত্য রিষয়াদির সবই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় ওরফে সন্তু লারমার হাতে আটক? সরকার কি তাকে ও তার দলকে ক্ষেপাতে নারাজ? নীরবে নির্ঝঞ্ঝাটে ভালোয় ভালোয় সব কিছু চলুক এই যেন ইচ্ছা। তবে গোপন আশা আছেঃ এই করে করে একদিন ওরা আওয়ামীলীগে আত্মলীন হয়ে যাবে, জয় হবে আওয়ামী লীগের। অস্ত্র আর বিদ্রোহের স্রোতহারা, ক্ষমতার স্বাদ প্রাপ্ত আত্মসমর্পিত বিদ্রোহীদের শেষ নিশ্চিত ঠিকানা হবে ক্ষমতার মধুভান্ড। অনিশ্চিত বিপজ্জনক বিদ্রোহের বিভীষিকার প্রতি তারা হবে স্থায়ীভাবে বীতশ্রদ্ধ।

এই অতি আশাবাদ, বাস্তবতার হাতে মার খাবে না, তা বলা যায় না। প্রথমতঃ শান্তি চুক্তিভূক্ত ব্যবস্থাটির প্রতি উপজাতীয় বিরোধী আরেক পক্ষ ক্ষেপা। নীরবে নিভৃতে জাতীয়ভাবে ও এটি মেনে নেয়ার সম্ভাবনা কম। অধিক সংখ্যক পার্বত্য বাঙ্গালীরা তো এর বিপক্ষে আছেই। প্রধান আওয়ামী বিরোধী দলগুলোর তাতে সায় নেই। দেশ জুড়ে এর পক্ষে বিপক্ষে জনমত বিভক্ত। আগামী জাতীয় নির্বাচনে এটি হবে অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু। এটি বাঙ্গালী ও বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী বলে বুঝান যত সহজ, এর উপকারিতার সাফাই গাওয়া তত কঠিন। গত নির্বাচনে তসবিতে পার পাওয়া সহজ হলেও, আগামীতে পানি আর শান্তি চুক্তি আওয়ামী বিজয়ের সুত্র হবে, তা আশা করা কঠিন। ঝাড়ু মিছিল আর ধাওয়ার চোটে, বিজয় দিকভ্রষ্ট হতেও পারে। বিরূপ পরিস্থিতি লন্ডভন্ড করে দিতে পারে আশাবাদী পরিকল্পনা। বাঙ্গালীর মন যোগাতে আওয়ামী মিজাজ মর্জি তখন কী ঠিক থাকবে? জন সংহতি সমিতিও কী স্বীয় একগুয়ে অবস্থান ও মনোভাব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে? মুরব্বীর অবস্থা বেহাল হলে, তাকে রক্ষায় কেউ যে থাকবে না। তাই নির্বাচনেই

দেখা যাবে কার অবস্থান টিকে বা ঠিক থাকে।

যদি শান্তিচুক্তির বিপক্ষে বিরোধী পক্ষীয় বিরূপ মনোভাব ঠিক থাকে, এবং আওয়ামী লীগের বিপক্ষে এই ইস্যু চাঙ্গা হয়ে, নির্বাচনী অস্ত্রে পরিণত হয়, তাহলে আওয়ামী ও জনসংহতি শিবিরে নাভিশ্বাস বইবে, তা অনুমান করা যায়। তখন হয়তো দুই মিত্রে আবার নতুন করে সমঝোতায় পৌছা এবং বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী স্বার্থে নমনীয়তা ও ছাড় দানের উদ্যোগ গৃহীত হতে পারে। কিন্তু কেবল ওয়াদা ও ঘোষণায় আস্থা লাভ হবে অনিশ্চিত। নমনীয় সমঝোতা, ও স্থানীয় আইন সংশোধন ছাড়া, জাতীয় আস্থা অর্জন হবে অসম্ভব। তাই সময় হাতে থাকতে এই দুই মিত্রকে বিকল্পের কথা ভাবতে হবে। একচেটিয়া উপজাতীয় সুবিধা ও অগ্রাধিকার নিজেদের পক্ষে কাল হতে পারে, এই সম্ভাবনা একেবারে ফেলনা নয়।

নির্বাচন ও জয় লাভ অতি জটিল বিষয়। জাতীয় মন জয়ের বিষয়টি এর সাথে জড়িত। পার্বত্য সমস্যাটি জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়ে আছে। এটি নির্বাচনকালে উত্থাপিত হবেই। নির্বাচনে যে দলেরই জয় হোক, উত্থাপিত পার্বত্য মেনিফেষ্টোর পক্ষে তা গণভোট রূপেই মান্য হবে। তাতে স্থানীয় জয় পরাজয় হবে গৌণ। কারণ স্থানীয় জনসংখ্যার হার মাত্র ১%। জাতীয় জনমতই প্রধান বিবেচ্য।

গত নব্বই দশকের দুই জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পার্বত্য সংসদীয় আসনগুলো একাই জয় করেছে। তজ্জন্য উপজাতি অনুকূল নির্বাচনী কৌশল যতটুকু দায়ী, তার চেয়ে অধিক দায়ী বিরোধী পক্ষীয় প্রার্থী বাহুল্য, আর অপরিপক্ক কৌশল। আগামীতে প্রার্থীতার সারিতে জনসংহতি সমিতিও যুক্ত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় নির্বাচনী কৌশলকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন অবশ্যই আছে। বাঙ্গালী ভোটাররা দল প্রীতির কারণে বিভিন্ন প্রার্থীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে অধিকাংশ মুসলিম বাঙ্গালী বিএনপি অনুরক্ত। টিকে থাকার স্বার্থে তারা বিএনপিকেই নিজেদের মুরব্বী সংগঠন মনে করে। এই মনোভবের অনুকূলে তাদের কামনা হলোঃ স্বজাতীয় যোগ্য প্রার্থী। তা না হলে তারা হতাশ হয় এবং বিভ্রান্ত হয়ে অন্য প্রার্থীতে ঝুঁকে পড়ে, এবং দলে ভাঙ্গণ ধরায়। বিএনপির মনোনীত কোন বিজাতীয় প্রার্থী বাঙ্গালী মুসলমান ভোটারদের পক্ষে পছন্দনীয় নয়। উপজাতিদেরও বাঙ্গালিতে অরুচি। বাঙ্গালীরা বিজাতীয় প্রার্থীদের নিজেদের বিপক্ষ মনে করে এবং উপজাতিরা দলত্যাগী প্রার্থীকে মনে করে একজন বিভ্রান্ত দালাল। বাঙ্গালী ভোটারদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে বিএনপি জামাত ও জাতীয় পার্টিতে একটি সমঝোতা হওয়া দরকার। সমর্থক প্রাধান্যের কারণে এতদাঞ্চলে বিএনপি ছাড় পাওয়ার যোগ্য। তবে স্থানীয়ভাবে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব বিএনপির পক্ষে দুশ্চিন্তার বিষয়। তিন পার্বত্য জেলায়ই সংগঠনটি কিছু কায়েমী ধামাধরাদের হাতে জিম্মি। জ্ঞানী, গুণী, প্রতিভাশালী লোকদের হাতে, পদ হারানোর ভয়ে, কায়েমী নেতারা প্রতিভা বিমুখ। উপযুক্ত পদ সম্মান ও সমর্থকের অভাবে, যোগ্য লোকের স্থান হচ্ছে না। যদিও যোগ্য অবহেলিত বিএনপি পক্ষভূক্তদের সংখ্যা যথেষ্টই হবে। স্বপক্ষীয় উপজাতীয় আর বাঙ্গালী স্বপক্ষীয় বুদ্ধিজীবিদের উপযুক্ত সম্মান ও

পদ দিয়ে দলভূক্ত করা গেলে, দলটির স্থানীয় নেতৃত্ব দৈন্যের অবসান হতে পারে। দলটির উপজাতি বর্জিত থাকাটা দুঃখজনক। কেবল সাধারণ সদস্য হওয়ার যোগ্য লোকদের দ্বারাই মূখ্যতঃ তিন জেলা বিএনপি সংগঠন ভারাক্রান্ত। তাই মেধাগতভাবে স্থানীয় বিএনপি দুর্বল। আর এ কারণেই তার নেতৃমান ও অনুন্নত। এর রাজনৈতিক তৎপরতা ও কেবল কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর পূনরাবৃত্তিতে সীমাবদ্ধ। অথচ এখানে স্বতন্ত্র কর্মসূচীতে দূর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলার যোগ্য উর্বর রাজনৈতিক বিষয়াদি বিদ্যমান।

এতোদিন এতদাঞ্চলে আওয়ামী রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন ছিলো কেবল বিএনপি, জামাতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি। এখন পার্বত্য জনসংহতি সমিতি ও তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। সংখ্যালঘু জনতাই আওয়ামী লীগ ও জন সংহতি সমিতির ভোট ব্যাংক, যারা অপর প্রধান তিনদল থেকে প্রায় বিমুখ। বাঙ্গালীদের ক্ষুদ্র একাংশ মাত্র আওয়ামী লীগের ভক্ত। জনসংহতি সমিতিও ভোটের প্রয়োজনে একদল চট্টগ্রামীকে আদিবাসী বাঙ্গালী নামে, উপজাতি মিত্র রূপে, নিজেদের রাজনৈতিক দোসর সাজাতে ব্যস্ত। উপজাতি সমর্থিত আওয়ামী ভোট ব্যাংকে বিভক্তি ঘটা মানে জনসংহতি সমিতি ও আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোটার ঘাটতি হওয়া জয় নির্ণায়ক বাঙ্গালী ভোট পেতে যে রাজনীতি খেলার প্রয়োজন, তা কি বিএনপি ও মিত্ররা খেলতে পারবে? উপজাতীয় ভোট লাভ নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগকে জনপ্রিয় উপজাতীয় প্রার্থীতে দৃঢ় থাকতে হবে। এরপর বাঙ্গালী ভোটারদের মন জয়ে তাকে বাঙ্গালী স্বার্থ বিরোধী চুক্তি আইন ও আচরণে সংশোধন আনতে হবে। নতুবা উপজাতীয় ভোট হারানোর পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে যৌথ নির্বাচনের আঁতাত রূপে এখানে তুমি, ওখানে আমি, এরূপ আপোষ ভাগাভাগির সন্ধি সমঝোতায় পৌছতে হবে। এরূপ আপোষ রফা সম্ভব না হলে সম্মিলিত বিএনপি মিত্র প্রার্থীদের হারানো হবে কঠিন।তবু দলীয় শক্তি উভয় দিকে প্রায় সমান সমান।

একদল বিদ্রোহী শান্তি বাহিনী সদস্য

আতিকুর রহমান

প্রকাশিত বই :

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম (গবেষণা কর্ম)

২. প্রেক্ষিত পার্বত্য সংকট

৩. শান্তি সম্ভব

৪. প্রতিবেদন গুচ্ছ

৫. পার্বত্য তথ্য কোষ ১০ খণ্ড

৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি

যোগাযোগ : ৪৮ সাধার পাড়া উপশহর সিলেট। মোবাইল : ০১১৯৬১২৭২৪৮